THE BLACK OBELISK

by Erich Maria Remarque

Translated into Bengali

by Atin Ghosh

☐ প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৫৮

☐ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রাকর : শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

☐ প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত। ৪, পীতাম্বর সরকার লেন, কলকাতা-২৩

যাঁর ইচ্ছাকে রূপ দিতে পেরে
আমি কৃতজ্ঞ—
শ্রীঅসিত সরকার
করকমলেষু

কবরখানার স্মৃতিস্তম্ভ বিক্রেতা হাইনরিখ ক্রল অ্যাণ্ড সন্সের অফিস ঘর সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। মাসটা এপ্রিল ১৯২৩ সালের। ব্যবসাপত্র ভালই চলছে। প্রথম দিকে খুব ভাল বিক্রি করেছি আমরা, কিন্তু অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু হারিয়েওছি, অবশ্য তাতে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। মৃত্যুকে এড়ানো যায় না এবং মানুষের দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গীটিও বিচিত্র, কেউ বেলেপাথর, কেউ মার্বেলপাথরের স্মৃতিস্তম্ভ দেয়, আবার যেখানে অপরাধবোধটা বেশি বা উত্তরাধিকারের পরিমানটা বিশাল সেখানে আরও দামী পালিশ করা কাল সুইডিশ গ্রানাইট পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হয় কবরে। শোকের উপকরণ বিক্রেতাদের মরশুম পড়ে শরৎকাল আর বসন্তকালে—গ্রীষ্ম বা শীতের তুলনায় এই সময় মানুষ মরে বেশি। শরৎকালে প্রকৃতি থেকে প্রাণরস নিঃশেষিত হয়ে যায় আর বসন্তকালে সেই প্রাণরস অতিরিক্ততার তাগিদে দুর্বল শরীরকে শুষে নেয়, যেমন শুষে নেয় সরু মোমবাতিকে মাত্রাতিরিক্ত মোটা পলতের আগুন। যুক্তিটা কতোদূর সত্যি তা জানি না, আমাদের সবচেয়ে সেরা এজেন্ট সরকারী কবরখানার কবর-খনক লাইবেরমানের এটাই বিশ্বাস। এবং সে একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, কারণ সে তার আশী বছর বয়সে প্রায় দশ হাজার মানুষকে কবর দিয়েছে। চাকরী থেকে আর কবরের স্মৃতিফলক বিক্রির পাওয়া কমিশনের টাকা দিয়ে নদীর ধারে বাড়ী তৈরী করেছে লাইবেরমান, আর ট্রাউট মাছের হ্যাচারী। এবং ব্রাণ্ডি রসিক হিসেবে নামও কিনেছে। লাইবেরমান এমনিতে বেশ সুখী, শুধু একটা জিনিসকে ও পছন্দ করে না, সেটা হল শহরের মৃতদেহ পোড়াবার দাহন-চুল্লী। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুভ নয়। আমরাও লাইবের মানের মনের সঙ্গে এক মত, কারণ ভস্মাধার বিক্রিতে লাভ থাকে না।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। বারোটা বাজতে সামান্য দেরী, যেহেতু আজ শনিবার, অতএব দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। টাইপ-রাইটারে

ঢাকা পড়ালাম অন্যান্য জিনিসপত্র পর্দার আড়ালে চলে গেল। আমিই এই অফিসের বিজ্ঞাপন-ম্যানেজের, নক্‌শাবাবু আর হিসাব-রক্ষক। সত্যি কথা বলতে কি গত একবছর ধরে আমিই এই অফিসের একমাত্র কর্মচারী, অথচ এর কোনোটাই আমার পেশা নয়।

বেশ মৌতাত করার জন্যে ড্রয়ার থেকে সিগার বের করলাম। একটা ধাতু কারখানার সেলসম্যান ভবিষ্যতে ব্রোঞ্জের কিছু 'মাল' গাছাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সিগারটা আমাকে উপহার দিয়ে গেছে। বেশ ভাল সিগার। হাতের কাছে দেশলাই পেলাম না। এক কোণে একটা ছোট চুল্লী জ্বলছিল। দশ-মার্কের একটা নোট পাকিয়ে তাই দিয়ে চুল্লী থেকে আগুন নিয়ে সিগারটা ধরালাম। এপ্রিলের শেষের দিকে ঘরে চুল্লী জ্বালানোর কোনো মানে হয় না। কিন্তু দোকান মালিক জর্জ ক্রলের বিশ্বাস সদ্য নিকট আত্মীয় মারা যাওয়া কোন মানুষকে যখন ট্যাঁক থেকে টাকা-পয়সা বের করতে হয় তখন ঘরটা যদি একটু ভালমত গরম থাকে তাহলে সহজেই তা বেরিয়ে আসে। দুঃখ অন্তরাত্মাকে হিমায়িত করে তোলে। সেই সঙ্গে ঘরের মেঝেও যদি তাহা সঞ্চারিত করতে না পারে তাহলে ভাল দাম আদায় করা সম্ভব হবে না। উত্তাপ সব কিছুকেই গলায়। টাকার থলিকেও। ফলে আমাদের অফিস সব সময়ে গরম রাখার হুকুম আছে।

দশমার্কের নোটের আধ-পোড়া অংশটা চুল্লীর মধ্যে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম উল্টোদিকের বাড়ীর জানলাটা কে যেন খুললো শব্দ করে। মুখ না তুলে আমি বুঝতে পারছি ওটা কার কাণ্ড। যেন টাইপরাইটারটা নিয়ে নড়াচাড়া করছি এমন ভাব দেখিয়ে সাবধানে আড় চোখে তাকালাম হাত-আয়নাটার দিকে, ওটা এমন ভাবে টেবিলে রেখেছি যে উল্টোদিকের বাড়ীটার পুরো ছায়া দেখা যায়।··· যা ভেবেছি তাই। ঘোড়ার কসাই ওয়াট জেকের বৌ লিসা জানলার সামনে সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে দাঁড়িয়ে। হাই তুলে, আড়মোড়া ভাঙছে। মাঝের গলিটা সরু, ফলে আমরা লিসাদের সব কিছু দেখতে পাই, লিসারাও আমাদের সব কিছু দেখে। হঠাৎ লিসার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো, ও ইশারায় আমার আয়নাটা দেখালো। লিসার শ্যেনচক্ষুতে কিছুই বাদ

যায় না। ধরা পড়ে গিয়ে আমার রাগ হল। অন্য দিকে সরে গেলাম ঘরের। একটু পরে আবার এলাম, লিসা তখনও দাঁড়িয়ে, দাঁত বের করে হাসছে। আমি না দেখার ভান করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। একটা চুমোও ভাসিয়ে দিলাম। লিসা টোপ গিললো। ও ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখতে শুরু করলো। কিন্তু কেউ নেই। এবার আমার দাঁত বের করে হাসার পালা। লিসা রেগে গিয়ে আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখিয়ে দুপদাপ করে চলে গেল।

এ ধরণের রসিকতা যে কেন করি তা আমি নিজেই জানি না। লিসার দেহের বাঁধুনী ভয়ংকর রকমের উগ্র। প্রতিদিন সকালে এই ধরণের দৃশ্য দেখবার জন্য বেশ কিছু লোক কয়েক লাখ মার্ক খরচ করতে দ্বিধা করবে না। আমারও যে ভাল লাগে না তা নয়। তবে ঐ অলস ধাড়ী ব্যাঙটা দুপুর পর্যন্ত বিছানায় কাটায়, আর এই ভাবে নগ্ন শরীর দেখিয়ে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয় এটা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায় আমার। লিসা কিন্তু ভীষণ চালাক। ঐ দেহটুকুই দেখায়, তারপর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, দর্শকের মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হলো তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। খাবার তৈরী করে নিয়ে গব গব করে খেতে শুরু করে, ওদিকে ওর স্বামী ঘোড়ার কসাই ওয়াট জেক ক্লান্ত, বুড়ো গাড়ীটানা ঘোড়াগুলোকে একের পর এক জবাই করে চলে কসাইখানায়।

লিসাকে কিছুক্ষণ পরে আবার জানলায় দেখা গেল। এবার ও একটা নকল গোঁফ লাগিয়েছে। তার মানে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী অবসর প্রাপ্ত সার্জেন্ট মেজর বৃদ্ধ নোপফের ওপর ওর নজর পড়েছে। কিন্তু তাঁর ঘরের জানলা তো এদিকে নয়, তবে কেন?

হঠাৎ বাঁধভাঙ্গা জলের স্রোতের মতো সেন্ট মেরী গির্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। গির্জাটা আমাদের গলির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছিল প্রতিধ্বনিটা যেন স্বর্গ থেকে সোজা আমাদের ঘরে এসে ঢুকছে। হঠাৎ আমার নজর পড়লো অফিস ঘরের অন্য জানলাটার ওপর যেটা উঠোনের দিকে মুখ করে আছে। জানলার ফাঁক দিয়ে আমার মালিকের টাক মাথাটা চট করে সরে যেতে দেখলাম। লিসা রাগ দেখিয়ে জানলাটা

শব্দ করে বন্ধ করে দিলো। সেন্ট অ্যান্টনীর লোভাতুর হাতছানি সে আরেকবার এড়াতে পারলো।

জর্জ ক্রলের বয়স প্রায় চল্লিশ, অথচ মাথা জোড়া চকচকে টাক। গত পাঁচ বছর থেকে একই রকম দেখে আসছি আমি। টাকটা এত ঝকঝকে যে আমরা দুজনে যখন এক সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চে থাকতাম, তখন জর্জকে সব সময়ে লোহার টুপি পরে থাকতেই হতো, এমন কি অন্য সময়ও ওর ওপর অর্ডার ছিল টুপি পরে থাকার, কারণ সবচেয়ে নিরীহ শত্রুও হয়তো গুলী করার লোভ সামলাতে পারবে না।

সামলে নিয়ে আমি খবর পাঠালাম: "কোম্পানী সদর দপ্তর, ক্রল অ্যাণ্ড সন্স! কর্মচারী শত্রুর ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত। ওয়াট জেক এলাকায় সন্দেহজনক সেনাদলের আনাগোনা হচ্ছে।"

জর্জ উত্তর দিল, "আহ্...লিসা সকালের ব্যায়াম করছে। নিজের চরকায় তেল দাও হে ল্যান্স কর্পোরাল বোদমার। ঘোড়াদের মতো সকাল থেকেই চোখে ঠুলি লাগাও না কেন? তাহলে তো তোমার সতীত্ব অটুট থাকে। জীবনের তিনটি সেরা জিনিসের সন্ধান রাখ কি তুমি?"

"জীবনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখনও, ফলে ওসব কি করে জানবো বলো?"

"সততা, সরলতা আর যৌবন," ঘোষণা করল ক্রল, "এগুলো একবার হারালে আর ফিরে আসে না। এবং অভিজ্ঞতা, বয়স আর নিস্ফলা জ্ঞানের মতো মূল্যহীন অপদার্থ বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি?"

সহজভাবে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলাম আমি, "আছে, দারিদ্র, অসুস্থতা আর নিঃসঙ্গতা।"

"আরে এগুলো অভিজ্ঞতা, বয়স আর নিস্ফলা জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র।

জর্জ আমার মুখ থেকে সিগারটা টেনে নিয়ে খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে দেখল, "হুম্...ধাতু কারখানা থেকে পাওয়া ঘুষের মাল।" তারপর পকেট থেকে ভারী সুন্দর একটা সিগার হোল্ডার বের করে সিগারটা তাতে লাগিয়ে টান দিতে লাগল। "সিগারটা জবর দখল করার জন্যে কিন্তু আমি কিছু মনে করি নি। এ শুধু বেহায়ার মতো গায়ের জোর ফলানো। নন-কমিশণ্ড

অফিসারা এই শিক্ষাই তো পেয়ে এসেছে যুদ্ধ থেকে। কিন্তু সিগার হোল্ডার কেন? আমার তো সিফিলিস নেই।

"আমিও সমকামী নই," ক্রল সংক্ষেপে উত্তর দিল। "জর্জ, যুদ্ধের সময় মটর সুটির স্যুপ খাবার সময় তুমি আমার চামচেটা ব্যবহার করতে না? আমি প্রায়ই স্যুপ চুরি করে আনতাম, আর চামচটা লুকোনো থাকতো আমার নোংরা বুট জুতোর মধ্যে···মনে পড়ে?"

সিগারের ধপধপে সাদা ছাইটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জর্জ উত্তর দিল, "যুদ্ধ শেষ হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে। তখনকার সেই চরম দুঃখের দিনে আমরা সকলেই মানুষ ছিলাম। আজ মুনাফা লোটার জন্যে নির্লজ্জের মতো আমরা সবাই আবার চোর-ডাকাত হয়ে উঠেছি। শুধু এই সত্যটা গোপন করার জন্যে ওপর-পালিশ লাগিয়ে চলেছি সব ব্যাপারে।··· আচ্ছা, আর সিগার আছে না কি? ধাতু কারখানার লোকেরা একটা মাত্র সিগার ঘুষ দেয় না।"

ড্রয়ার থেকে দ্বিতীয় সিগারটা বের করে জর্জের হাতে তুলে দিলাম, "সবই তুমি জানো দেখছি। জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা আর বয়স অনেক সময় মানুষের অনেক উপকারও করে দেখছি?"

দেঁতো হাসি হেসে আধপ্যাকেট সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল জর্জ, "আর কিছু হলো নাকি?"

"না। একটাও খদ্দের আসে নি। তবে আমার মাইনে কিছুটা বাড়তেই হবে।"

"কি, আবার? এই তো গতকালই পেয়েছে।"

"গতকাল না। আজই সকাল নটার সময়। মাত্র দশ হাজার মার্ক। আজ কাল ৯টা পর্যন্ত অবশ্য তার কিছুটা দাম ছিল। কিন্তু একটু আগে ডলারের নতুন দাম টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, তাতে ঐ দশ হাজারে নেকটাই কেনা যাবে না। বড় জোর সস্তা মদ এক বোতল জুটবে। অথচ আমার একটা টাই দরকার।"

"ডলারের দাম কত যাচ্ছে এখন?" জর্জ জানতে চাইল। "আজ দুপুর বারোটার সময় ৩৬ হাজার মার্ক। আজ সকালে ছিল তেত্রিশ হাজার।"

জর্জ তার সিগারটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠলো, "ছত্রিশ হাজার! এই ইঁদুর দৌড় কবে যে শেষ হবে?"

"সবটাই একদিন ভেঙ্গে পড়বে। তার আগে কোনো রকমে আমাদের বেঁচে থাকা। তা টাকা কড়ি কিছু পেয়েছ কি?"

"আজ আর কালকের জন্যে মাত্র এক স্যুটকেশ ভর্তি। হাজার, দশ হাজার, এমন কি একশোর নোটেরও তাড়া আছে ওতে। সব মিলিয়ে পাঁচ পাউণ্ডের মতো আর কি! মুদ্রাস্ফীতি এতো জোর কদমে বাড়ছে যে রাইখ্স ব্যাংক নোট ছাপিয়ে উঠতে পারছে না। দু সপ্তাহ আগে ওরা এক লাখের নোট ছেপেছিল এবার বোধ হয় দশ লাখের ছাপতে হবে।"

"এই ভাবে যদি আর কয়েক মাস চলে, তবেই হয়েছে।"

"হে ভগবান," জর্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "১৯২২ সালটা কী সুখেই না কেটেছে। ডলারের দাম ২৫০ থেকে বেড়ে মাত্র দশহাজার মার্কে উঠেছিল। আর ১৯২১-এর কথা বলে আর লাভ নেই মাত্র সাড়ে সাতশো হয়েছিল।"

আমি কথা না বলে জানলার দিকে তাকলাম। টিয়াপাখির ছাপ দেওয়া একটা ফ্রক পরে লিসা এখন চুল আঁচড়াচ্ছে আয়নাটা জানলায় রেখে। ঠোঁট বেঁকিয়ে আমি বললাম, "একবার গ্যাখো দিকি। ও বীজও বোনে না, ফসলও ঘরে তোলে না। অথচ কি করে চালায় কে জানে। গতকালও ওই ফ্রকটা ওর ছিল না। বেশ কয়েকগজ দামী সিল্ক। অথচ আমি একটা টাই পর্যন্ত কিনতে পারছি না।"

জর্জ আবার হাসলো, "আহা, তুমি যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছ না, তাই এত কষ্ট পাচ্ছ। অথচ লিসাকে দেখ কালোবাজারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ও কেমন মজায় আছে। কবরখানার পাথর বেচে কোনো-দিনও তুমি বড়লোক হতে পারবে না। তার চেয়ে তোমার বন্ধু উইলির মতো হেরিং মাছ বা শেয়ার বাজারে দালালির কাজ নিচ্ছ না কেন?"

"নিচ্ছি না, তার কারণ আমি একজন দার্শনিক, একজন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। আমি আমার ব্যবসা নিয়েই থাকতে চাই। থাক্‌গে ও সব কথা, তুমি আমার মাইনে বাড়াবার কি করছ? দার্শনিককেও তো জামাকাপড়ের জন্যে কিছু না কিছু খরচ করতে হয়?"

"টাই কাল কিনলে চলে না ?"

"কাল রবিবার, টাইটা আমার কালকেই দরকার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা মোটা ব্যাগ বের করে দুটো নোটের তাড়া আমার দিকে ছুঁড়ে দিল জর্জ, "এতে হবে তো ?"

দেখলাম সব একশো মার্কের নোট : হবে না। আরও একটা বাণ্ডিল দাও। এ টাকা তো আজকাল লোকে গির্জার গেটের ভিখিরীকে দেয়।"

টাকটা একটু চুলকে নিয়ে বিরসবদনে জর্জ আর একটা বাণ্ডিল দিল।

"ভগবানের অশেষ করুণা যে কাল রবিবার। এই একটা দিন অন্ততঃ টাকা পয়সার দাম কমে না। রবিবার সৃষ্টি করার সময় এটা তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা করেন নি।"

আমাদের ব্যবসা ঠিক কেমন চলছে বলো তো ?" আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না, "আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি, না বেশ ভালই আছি ?"

সিগারে লম্বা টান দিয়ে জর্জ বললো, "জার্মানীতে নিজের সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। টাকা-পয়সা যারা জমিয়ে রেখেছিল তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কারখানার শ্রমিক বা অফিসের কেরানীরা বুঝতেও পারছে না তাদের অবস্থাটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তো একমাত্র সুখে আছে যারা বিদেশীমুদ্রা, শেয়ার বা সম্পত্তি কেনা-বেচা করাচ্ছে। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে।

"সম্পত্তি ?" আমি জানলা দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকালাম। বাগানটাই আমাদের গুদাম ঘর। ওখানে দামী মার্বেলপাথরের বেশি কিছু মাল আর নেই। যা আছে বেলেপাথর আর ঢালাই সিমেণ্টের জিনিস। "আমাদের তো কিছুই নেই বলতে গেলে। যা আছে তোমার ভাইতো সব লোকসানে বেচে দিচ্ছে। আমার মতে এখন আর বিক্রি না করাই ভাল।"

আমার কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না জর্জের। তাছাড়া ঠিক সেই সময় বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বাজল। বেশ মেজাজের মাথায় পুরনো সিঁড়িতে ভারী ভারী পা ফেলে উঠে আসছে একজন। একে নিয়েই বাড়ীতে যত ঝামেলা—হাইনরিখ ক্রল, জুনিয়ার। এই ব্যবসার অন্যতম মালিক।

মানুষটা বেশ মোটাসোটা, গোঁফগুলো খোঁচা খোঁচা। ধুলো ভরা প্যাণ্টের

তলাটা ক্লিপ দিয়ে গোটানো। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমাদের দু জনের দিকেও তাকালো। হাইনরিখের মতে আমরা খালি আড্ডা দিয়ে বেড়াই। আর ও অক্লান্তভাবে কাক-ডাকা সকাল থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে, গঞ্জে যেখানে যেখানে আমাদের এজেন্ট আছে, কারখানা আছে, খদ্দেররা আছে সেখানে চলে যায় সাইকেলে করে। ওর মোটাসোটা চেহারাটা ওকে প্রচুর আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে, তাই সকাল-সন্ধ্যে নিয়ম করে বিয়ার খায়। তাছাড়াও জানে গ্রামের চাষা-ভুষোরা বেঁটে-মোটা লোকদের বেশি পছন্দ করে, রোগা ধূর্ত চেহারার লোকেদের তুলনায়। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী স্টেইন মেয়ারদের মতো কালো ফ্রক কোট পরে না হাইনরিখ বা হেলিমান। ক্লোংজ কোম্পানীর এজেন্টদের মতো নীল স্যুটও পরে সে। ডোরা-কাটা প্যান্টের সঙ্গে গাঢ় রঙের কোটে ওকে বেশ ঘরোয়া লোক মনে হয়। বিশেষ করে প্যান্টে ক্লিপ গোঁজে বলে গ্রামের লোকেরা হাইনরিখকে খুব আপনজন মনে করে। মন খুলে ব্যবসার কথা বলে।

টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছলো হাইনরিখ। যদিও বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, এবং ওর কপালে ঘামও নেই। ও দেখাতে চায় দারুণ খেটে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরছে। "স্মারক ক্রুশটা বিক্রি করে এলাম," খুব বিনীতভাবে কথাটা বললেও প্রায় সিংহ গর্জনের মতো শোনাল ওর গলার আওয়াজ।

"কোনটা? মার্বেলপাথরের ছোট্টটা?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না, বড়টা," খুব শান্তভাবে উত্তর দিল হাইনরিখ।

"কি বললে? জোড়া থাম আর ব্রোঞ্জের মালা জড়ানো সুইডিশ গ্রানাইট পাথরেরটা?"

"হ্যাঁ ঐটাই। তুমি কি অন্য কিছু ভেবেছিলে?"

আমার বোকামীতে বেশ আনন্দ পেয়েছে যেন হাইনরিখ। "না। আর তো অন্য কিছু আমাদের নেই। মুস্কিলটা তো সেখানেই। ওটাই ছিল আমাদের অবলম্বন না।"

"তা কতোয় বিক্রি করলে?" এবার প্রশ্ন করল জর্জ ক্রল।

হাইনরিখ বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো, "সাড়ে সাত লাখে, খোদাই করা বা প্যাক করে পাঠানোর খরচ বাদে।"

"হায় ভগবান"—আমি আর জর্জ দুজনেই একসাথে চাপা আর্তনাদ করে উঠলাম।

গোঁয়ারের মতো হাইনরিখ তাকালো আমাদের দিকে, "অনেক লড়াই করতে হয়েছে ওর জন্যে।"

"হেরে গেলেই বোধ হয় ভাল করতে," আমি বললাম।

"কি বললে?"

"হারলে ভালই হতো।"

"কি?" হাইনরিখ ভীষণ বিরক্ত হয়েছে যেন।

"ও বলতে চাইছে ওটা বিক্রি না করলেই ভাল করতে," জর্জ বলল।

"কি বলতে চাইছ তোমরা বুঝতে পারছি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চাকরের মতো খেটে দারুণ ব্যবসা করে আসার পর তোমাদের কাছ থেকে প্রশংসার বদলে পাচ্ছি সমালোচনা। এবার থেকে তোমরা নিজেরা যেও গ্রামে···চেষ্টা করে দেখো···।"

"হাইনরিখ," খুব ধীরে জর্জ ওকে বাধা দিল, "আমরা জানি যে তুমি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করো। কিন্তু এখন আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে একটা কিছু বিক্রি করা মানে আমাদের লোকসান হওয়া। জানো তো যুদ্ধের পর থেকে টাকা-পয়সার দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছে। এ বছরে তো লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে। তাই টাকার অংকটা এখন আর···।"

"তা কি আর আমি জানি না। আমি কি বুদ্ধু?"

একথার কোনো উত্তর হয় না। বোকারাই শুধু এমন কথা বলে। প্রতিবাদ করাও বোকামী। এ জ্ঞানটা আমার হয়েছে প্রতি রবিবারে পাগলাদের আশ্রমে গিয়ে। হাইনরিখ একটা নোট বই বের করল, "এটা আমরা কিনেছিলাম পঞ্চাশ হাজারে। সাড়ে সাত লাখে বিক্রি করে সামান্যই লাভ করেছি, তাই না?"

ও যে আমাকেই ঠাট্টা করছে বুঝতে পারলাম। যুদ্ধ থেকে ফিরে মাস নয়েকের জন্য একটা স্কুলে চাকরী করেছিলাম আমি। শেষে পালিয়ে আসতে বাধ্য হই। "আরও বেশি লাভ হতো যদি ক্রুশটার বদলে ঐ হতচ্ছাড়া অবিলিস্কটা* বিক্রি করতে পারতে। তোমার বাবা ওটা ষাট বছর আগে

* অবিলিস্ক—ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে ওঠা লম্বা চতুষ্কোণ স্তম্ভ।

কিনেছিলাম মাত্র পঞ্চাশ মার্কে।"

"অবিলিস্ক? এর সঙ্গে অবিলিস্কের কী সম্পর্ক? ওটা যে বিক্রির নয়, এটা তো একটা শিশুও জানে।"

"ঠিক সেই জন্যেই তো বলছি ওটা বিক্রি হয়ে গেলে কেউ চোখের জল ফেলবে না। কিন্তু তাই বলে ক্রুশটা বিক্রি করে এলে? আর একটা কিনতে তো আমাদের প্রচুর খরচ হবে।···সন্দেহ হচ্ছে? অতো দাম পড়বে কি না? দেখাই যাবে, কাল রাইজেনফেল্ড আসছে। নতুন অর্ডার দিতে হবে।"

"একথা আগে বলো নি কেন?" হাইনরিখ বললো "ঠিক আছে, রাই-জেনফেল্ডের সঙ্গে আমি কথা বলবো। দেখবো দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

আমার আর জর্জের মধ্যে চোখাচোখি হয়ে গেল। এ কাজটা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। তার জন্যে হাইনরিখকে সকাল থেকে মদ নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে বা সকালের বীয়ারে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে দিতে হবে। হাইনরিখ এখনও ব্যবসা ক্ষেত্রে সত্যযুগের সততার মধ্যে বাস করে, অথচ রাইজেনফেল্ড নিজের সততার মানে পাল্টায়।

"আরে দাম তো রোজ বদলাচ্ছে, অতএব কথা বলার কি দরকার।" জর্জ ব্যাপারটা ঢাকা দিতে চাইল।

"তাই নাকি? তাহলে মনে হচ্ছে দামটা ভাল পাই নি।"

সেটা পরে বোঝা যাবে। তা টাকাটা সঙ্গে এনেছ কি?"

হাইনরিখ জর্জের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল: "সঙ্গে এনেছি কিনা?··· কি বোকা-হাঁদার মতো কথা বলছ তোমরা। জিনিস পাবার আগেই টাকা? অসম্ভব, তা হয় না।"

"আদৌ অসম্ভব না," আমি বললাম, "আজকাল এটাই নিয়ম—এটাকে বলা হয় অগ্রিম মূল্য দেওয়া।"

"অগ্রিম মূল্য দেওয়া, "হাইনরিখ নাক তুলে কথা বললো, "তোমার মতো স্কুলমাস্টার 'এ' ব্যবসার কি বুঝবে বল। আমাদের ব্যবসাতে অগ্রিম চাওয়া যায় কি? কবরের মাটি যখন শুকতে পর্যন্ত শুরু করে নি, তখন কি করে দাম চাইবে। তাছাড়া জিনিস না দিয়ে দাম চাওয়া যায় না।"

"নিশ্চয়ই যায়। ওরা যখন খুব দুর্বল থাকে তখন টাকা বের করে নেওয়া সহজ।"

"ওরা তখন দুর্বল থাকে?···আর হাসিও না আমাকে। ঐ সময়েই ওরা ইস্পাতের মতো কঠোর হয়ে যায়। কফিন, পুরোহিত, কবর, ফুল, সারা-রাতের উপাসনা ইত্যাদির খরচা মেটাবার পর ওদের হাতে আর কিছু থাকে না। আর আগে ওদের সামলে নিতে দিতে হবে। পরে কবরে গিয়ে জিনিসটা দেখবে তবে তো দর-দামের প্রশ্ন।"

হাইনরিখের বাস্তব বুদ্ধির যে কতো অভাব এটা তার আর একটা প্রমাণ। আমি কান দিলাম না ওর কথায়। এটা ঠিক এই অফিসে আমার কাজ হল কবরের ডিজাইন তৈরী করা। আমি অবশ্য একটু বাড়তি কাজ করে দিই ডিজাইনটাকে রঙ করে, তার পাশে ফুলের কেয়ারী, একটা দুটো গাছ এঁকে দিই। কখনো কখনো সোনালী অক্ষরে পাথরের ফলকে লিখেও দিয়ে থাকি। এটা খদ্দেরদের খুব মনে ধরতো। আমার মালিকও খুশি হয়েছিল। আর আমাদের প্রতিযোগীদের তো চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

"হের ক্রল," আমি বলতে শুরু করলাম, "বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আলোচনা করার অনুমতি দাও। যে নীতি নিয়ে তুমি চলতে চাও সেটা মহৎ, তবে ওভাবে এগোলে দু দিনেই লালবাতি জ্বালতে হবে ব্যবসায়। এখন টাকা রোজগার সবাই করছে। কিন্তু কেনার ক্ষমতা সবার ক্ষেত্রেই বেশ বিপর্যস্ত। এখন বেচার যুগ নয়, কেনার যুগ, আর নগদে দাম পেতে হবে। টাকার দাম কমতে কমতে শূন্যতে গিয়ে দাঁড়াবেই। মানুষ তো শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কল্পনায় আর পঁচিশ ভাগ বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে জগতে বাস করে। ওটা তার দুর্বলতা আবার শক্তিও বটে। তবে এ যুগে জেতা মুস্কিল। এই যে তুমি যে জিনিষটা সাড়ে সাত লাখে বিক্রি করে এসেছি তার দাম পেতে যদি দু মাস দেরী হয় তবে তখন যা পাব তার দাম ঐ পঞ্চাশ হাজারেই নেমে আসবে। অতএব হাইনরিখের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। "দ্যাখো আমি বুদ্ধু নই। তাছাড়া অত বক্তৃতা দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। এতোদিন ব্যবসা যেভাবে চলে এসেছে, এখনও ওই ভাবেই চলবে। নিজের চরকায় তেল না দিয়ে এখানে কেন এসেছ।"

ছোঁ মেরে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল হাইনরিখ। ভীষণ ক্ষেপেছে। এখান থেকে ও সোজা চলে যাবে ওর প্রিয় ব্লুমস রেষ্টুরেন্টে।

আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল, "চিন্তা করে দেখো, এই ধরণের লোকের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে আমাদের।" জর্জ হেসে উঠলো, "ছাড়ো ওসব চিন্তা, টাকাটা নাও। টাই কিনবে বলছিলে না? বেরিয়ে পড়।"

"রাইজেনফেল্ড কি সত্যিই আসছে?

"হ্যাঁ। টেলিগ্রাম করেছে।

"কি চায় ও? টাকা-পয়সা?"

"এলেই বুঝবে," দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে জর্জ উত্তর দিলো।

॥ ২ ॥

দরজা বন্ধ করে আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাগানে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। আকাশে সোনালী সূর্যের দীপ্তি। দমকা হাওয়া আমাদের স্পর্শ করে যাচ্ছে বারে বারে।

আমাদের এই বাগানটা আমাদের শো-রুমও বটে, এখানে সব স্মৃতিস্তম্ভ গুলো সাজান থাকে। সবগুলোই অবশ্য আছে অবিলিস্ক অটোর পেছনে সার বাঁধা সৈনিকের মতো। অটো যেন সেনাপতি। এই পাথরের স্তম্ভটাই আমাদের সবচেয়ে পুরানো মাল, হাইনরিখকে এটাই বিক্রি করে দেবার কথা বলেছিলাম। অটোর ঠিক পেছনেই আছে বেলেপাথরের টুকরো, যেগুলো কবরের মাথার কাছে রাখা হয়। তারপর আছে ঢালাই সিমেন্টের তৈরী জিনিস, অপেক্ষাকৃত গরীবরা এগুলো ব্যবহার করে। তারপর দেখতে পাওয়া যাবে দুধাপ ওলা বেদী, যারা জীবনে উঁচুতে উঠতে পারে নি। এগুলো তাদের জন্যে। খুব একটা দাম নয় এ গুলোর। এর পরে সাজানো আছে বেলেপাথরের স্মৃতিস্তম্ভগুলো, তাতে মার্বেল, কালো গ্রানাইট পাথরের কাজ করা। এগুলো কেনা হয় ছোটো ব্যবসাদার, ফোরম্যান, কারিগর, যারা হাতের কাজ করে ব্যবসা চালায় তাদের জন্যে। এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরা সত্যিকার যা তার চেয়ে বড় দেখবার ভান করতো।

এরপর দেখা যাবে মার্বেলপাথরের তৈরী দামী স্তম্ভগুলোকে। পালিশ করা, ডবল বেদীর ওপর বসানো। এগুলো কেনে মধ্যবিত্তরা। বড় ব্যবসাদার, বড় দোকানদার, চাকরীকরা মানুষেরা।

এটাই শেষ না। অভিজাতদের জন্যে আছে সুইডিশ কালো পাথরের স্তম্ভ, চারদিকেই পালিশ করা। চূড়োতে ঐ পাথরেরই তৈরী ক্রুশ চিহ্ন পর্যন্ত দেওয়া থাকে। এখনকার বাজারে এ গুলোর খদ্দের হল ধনী কৃষক, সম্পত্তিওলা লোক, মুনাফাখোর, হুণ্ডীতে কারবার করা ধূর্ত ব্যবসায়ী।

আমাদের দুজনেরই এক সঙ্গে চোখ পড়ল সেই জিনিষটার ওপর যেটা কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমাদের ছিল। কী সুন্দর, ঝকঝকে। গোড়ার কাছে লতিয়ে আছে লাইলাক ফুল। বাতাসে সুগন্ধ। হাইনরিখ এটাকেই বিক্রি করে এসেছে। আর এ আমাদের কাছে থাকবে না। চলে যাবে, হারাবে তার সৌন্দর্য, ওর গায়ে খোদাই করা হবে একজনের নাম। আমি মনে মনে বললাম, "বিদায় কালো ডায়না। বিদায়। এখন থেকে তুমি আর আমাদের নয়। নির্লজ্জের মতো তুমি ঐ জোচ্চোর ফ্রেডার সেনের নাম জাহির করে চলবে অনন্তকাল ধরে। যে লোকটা খাবারে ভেজাল মিশিয়ে দুহাতে টাকা লুঠেছে। অথচ কিছু করার নেই আমার। বিদায়।"

"ক্ষিদে পাচ্ছে," জর্জ বলল, "ওয়ালহাল্লায় যাবে? না, আগে টাই কিনবে?"

"পরে কিনবো। দোকান বন্ধ হতে অনেক দেরী। সোমবার সকাল পর্যন্ত ডলারের দামে হের-ফের হয় না, কেন বলোতো?

"শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে বলে। আজে বাজে প্রশ্ন ছাড়ো। ওয়ালহাল্লাতে গোমাংসের ভাল সুরুয়া করেছে, সঙ্গে আলুসেদ্ধ, আচার, ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার সময় মেনুটা দেখেছি।"

"ঠিক আছে চলো। এডুয়ার্ড নবলককে একটু চটিয়ে আসি।"

ওয়ালহাল্লা হোটেলের বড় ডাইনিং হলে ঢুকতেই মালিক এডুয়ার্ড নবলককে দেখতে পেলাম। দৈত্যেদের মতো মোটা, মাথায় বাদামী টোপী, ঝলমলে ডিনার কোট। আমাদের দেখেই ও চমকে উঠল।

"সুপ্রভাত, হের নবলক," জর্জ বলল, "চমৎকার আবহাওয়া। দারুণ

ক্ষিদে বাড়িয়ে দিচ্ছে।"

"বেশি খাওয়া ভাল নয়। ডাক্তাররা বলে, বেশি খেলে লিভার খারাপ হয়ে যায়।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল খাবারও বেশি খেতে নেই।...তাছাড়া..."

কাঁধে চড় কষাতেই চমকে উঠল এডুয়ার্ড, "আমাদের কথা চিন্তা করে লাভ নেই। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো। আমরা তো তোমার বাড়ী ঘরদোর খেয়ে নিচ্ছি না।...কবিতা কেমন চলছে?"

"কিছু হচ্ছে না। সময় পাই না...কি যে হল দিনকাল...।"

আমি হাসলাম না এ উত্তরে। কারণ এডুয়ার্ড শুধু হোটেল-মালিক না, কবিও বটে।

"কোন্ টেবিলে বসবো?" আমি জানতে চাইলাম।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এডুয়ার্ডের, "একটাও টেবিল খালি নেই দেখছি।"

"তাতে কি হয়েছে। অপেক্ষা করবো।"

এডুয়ার্ড আবার চারপাশে, তাকিয়ে বলল, "খুব শিগ্‌গীর কোনো খদ্দের উঠবে বলে মনে হয় না। এই তো সবে স্যুপ দিয়ে শুরু করেছে। তার চেয়ে রেল রোড হোটেলে চলে যাও, ওখানে মোটামুটি খাওয়া চলে।"

মোটামুটি! বলে কি লোকটা, এ আবার কী ধরনের রসিকতা। আমরা এসেছি গোমাংসের নামকরা সুরুয়া খেতে, আর বলে কিনা অন্য হোটেল যেতে। ওয়ালহাল্লার এটাই সেরা রান্না।

এডুয়ার্ড কবি তো বটেই, কিন্তু সে যে আবার মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে কে জানতো, ও বলল, "অপেক্ষা করে লাভ নেই। গোমাংসের সুরুয়া ততক্ষণে ফুরিয়ে যাবে। অন্য কিছু খাওনা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে।"

"দরকার নেই, টেবিল একটা খালি হয়েছে।...ঐ যে সুন্দর মতন এক মহিলার সঙ্গে কেতা দুরস্ত এক ভদ্রলোক বসে আছেন, ওখান থেকে একজন ডাকছে আমাদের। ও আমার বন্ধু উইলি। এডুয়ার্ড ওখানে একটা বেয়ারা পাঠিয়ে দাও।"

আমরা এগোতে এগোতে এডুয়ার্ডের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

আমাদের এইভাবে ভাগাতে চাওয়ার পেছনে এডুয়ার্ডের সঙ্গত কারণ

আছে। কিছুকাল আগে দোকানের বিক্রি বাড়াবার জন্যে এডুয়ার্ড কুপন বিক্রি করা ধরেছিল। একসঙ্গে অনেকগুলো কিনলে একটু সস্তা পড়ে। একটা কুপনে একবেলার খাওয়া। হিসেব ঠিকই করেছিল সে। কিন্তু কে জানতো টাকার দাম এভাবে নেমে যাবে রাতারাতি। ওর অনেক ক্ষতি হতে শুরু করল। আমরা প্রায় দু সপ্তাহ আগে অনেক কুপন কিনে রেখেছিলাম। আমাদের দেখাদেখি কফিন মিস্ত্রী উইলকি, কবরের পাহারাদার লাইবেরমান। আমাদের ভাস্কর কুর্ট বাক্, উইলি এমনকি লিসাও কুপন কিনেছিল। প্রত্যেকটা বইতে দশটা করে কুপন। এডুয়ার্ডের ধারণা হয়েছিল দশদিনের মধ্যে ওগুলো লোকে ব্যবহার করে ফেলবে। আমরা প্রত্যেকে প্রায় ত্রিশটা করে বই কিনে ফেলেছিলাম। এখনকার দামে কুপনগুলো আধা দামের হয়ে গেছে। ক্রমশঃ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে ঐ কুপনে মাত্র দশটা সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে এডুয়ার্ড একবার কুপন নেওয়া বন্ধ করতে চাইল। আমরা এক উকীল বন্ধুকে এনে খাওয়া দাওয়া করলাম ওয়ালহাল্লাতে। দাম চুকোবার সময় উকীল বন্ধুটি চুক্তির শর্ত নিয়ে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। ফলে কুপন নিতে বাধ্য হল সে। রাগের চোটে স্থানীয় কাগজে আমাদের ব্যঙ্গ করে একটা কবিতা ছাপালো এডুয়ার্ড। আবার উকীল বন্ধুকে আনলাম, কাউকে ব্যঙ্গ করলে আইনে কি কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে উকীল সেটা এডুয়ার্ডকে বুঝিয়ে দিল। এর পর এডুয়ার্ড শান্ত হল বটে, তবে রোজ জিজ্ঞেস করতো, আর কত কুপন আছে। আমরা উত্তরটা এড়িয়ে যেতাম। বলতাম না যে তখনও আরও সাত মাস চলার মতো কুপন আমাদের আছে।

উইলি উঠেছে। গায়ে দামী সবুজ রঙের স্যুট। টাইতে মুক্তো, আঙুলে সীল-খোদাই করা মোটা আংটি। অথচ পাঁচ বছর আগে উইলি ছিল আমাদের কোম্পানীর রাঁধুনীর সহকারী। আমার বয়সী ও—পঁচিশ বছরের ছোকরা।

"আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কি?" উইলি বলল, "জর্জ ক্রল, লুডউইগ বোদমার—আর ইনি হলেন প্যারিসের মুলারুজের মাদমোয়াজেল রেণী দ্য লা ত্যুর।"

রেণী দ্য লা তুর বেশ ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন মাথা ঝুঁকিয়ে। আমরা উইলির দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালাম, ওর চোখে মুখে গর্বের ভাব। "বসে পড়ো হে। মনে হচ্ছে এডুয়ার্ড তোমাদের এড়াতে চাইছিল। সুরুয়াটা ভালই, তবে একটু পেঁয়াজ কম। বসে পড়ো।"

এডুয়ার্ডের সঙ্গে কুপন নিয়ে মন কষাকষির ব্যাপারটা উইলি জানে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "বেয়ারা।" চার কদম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারাটা শুনেও শুনলো না। আমি আবার চেঁচালাম, "এই বেয়ারা!"

"তুমি একটা জংলী," জর্জ আমাকে থামাল, "তুমি লোকটাকে অপমান করছ কেন? ১৯১৮ সালের বিপ্লবে যোগ দাওনি তুমি? এই যে হের ওবের।"

আমি হাসলাম। জার্মানীতে ১৯১৮ সালের বিপ্লবে সবচেয়ে কম রক্তপাত হয়েছিল। কারণ বিপ্লবীরা ভীষণ ভয় পেয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সবাই সরকারের কাছ থেকে টাকা পয়সা আর খেতাব পায়। এবং তখনই ঠিক করা হয়েছিল হোটেলে বেয়ারাদের আর বেয়ারা বলা চলবে না, বলতে হবে হের ওবের, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত হেড বেয়ারা।

"হের ওবের," জর্জ আবার ডাকল। কিন্তু এবারও কোনো সাড়া নেই। এডুয়ার্ডের নির্দেশেই বোধহয় আমাদের পাত্তা দেয় না।

হঠাৎ সারা হল ঘর কাঁপিয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠল, "ওবের, হ্যাঁ···হ্যাঁ তুমি, উনি ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?" সঙ্গে সঙ্গে কোমরে খোঁচা খাওয়া যুদ্ধের ঘোড়ার মতো ছুটে এল বেয়ারাটা আমাদের কাছে, "বলুন, কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?" "নুডুল সুরুয়া, গোমাংসের, দুজনের জন্যে দুটো চপ," জর্জ অর্ডার দিল, "আর চট্ করে আনবে।"

চিৎকারটা এডুয়ার্ডের কানেও পৌঁছেছে, ও আমাদের কাছে এল, "একথা কিন্তু আমি জোর গলায় জানিয়ে রাখছি, আমার দোকানে ওসব চেঁচামেচি চলবে না।"

ওর কথার উত্তর কেউ দিল না, ফ্যালফেলে—দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলো এডুয়ার্ডের দিকে। রেণী দ্য লা তুর নাকে পাউডার ঘষতে ব্যস্ত। এডুয়ার্ড ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে হঠাৎ সেই বাজখাই গলা, "হোটেল মালিক, ওখান থেকে সরো।"

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল এডুয়ার্ড। আমাদের সেইরকম বোকা বোকা চাউনি। এডুয়ার্ড রেণী দ্য ত্যুর-কে লক্ষ্য করে বলল, "আপনিই কি এইমাত্র…… ?"

পাউডারের কৌটোটা টিপে বন্ধ করে রেণী একটু হেসে উত্তর দিল, "কি হয়েছে ?…কি চান আপনি ?"

এডুয়ার্ড হাঁ হয়ে গেল। "বেশি খাটুনির জন্যে কি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে হের নরলক ? দিনের বেলাতেই ভূত দেখছেন ?"

"কিন্তু এইমাত্র এখানে……"

"তোমার মাথার ঠিক নেই মনে হচ্ছে," আমি বলতে শুরু করলাম, "শরীরও খারাপ দেখাচ্ছে। বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ঘুরে এসো। তোমার আত্মীয়কে সস্তাদরের কবরের পাথর বিক্রি করতে আমরা চাই না এত তাড়াতাড়ি।"

পেঁচার মত চোখ পিট্‌পিট করতে লাগল এডুয়ার্ড। "আপনাকে বেশ অদ্ভুত লোক বলে মনে হচ্ছে," রেণী দ্য লা ত্যুর বাঁশির মত মিষ্টি সুরে বললেন, "আপনার বেয়ারারা কালা, অথচ তার জন্যে খদ্দেরদের ঘাড়ে দোষ চাপান আপনি।" তারপর ঝরনার মতো মিষ্টি সুরে হেসে উঠলো রেণী।

এডুয়ার্ডের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এই মেয়ে কখনও বাজখাই গলায় চেঁচাতে পারে না।

"তুমি এখন যাবে ? না, আমাদের সঙ্গে একটু আলোচনায় বসবে ?" জর্জ প্রশ্ন করল।

"তবে বেশি খেও না। খাবার যত ভালই হোক না কেন, বেশি খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। লিভার খারাপ হয়ে যায়," আমি রসিয়ে রসিয়ে ওর কথাগুলোই ওকে ফেরত দিলাম।

এডুয়ার্ড প্রায় ছুটে পালাল। তাকিয়ে দেখি উইলির সারা শরীরটা হাসি চাপবার চেষ্টার ফলে ফুলে ফুলে উঠছে। রেণী দ্য লা ত্যুরের মুখে মৃদু হাসি, চোখে আনন্দের দীপ্তি।

'উইলি, আমি একটা ফালতু লোক, তবে বহুদিন পরে শৈশবের জগতে

ফিরে যেতে পেরে বেশ আনন্দ পেলাম। কিন্তু বলো তো কি করলে…।"

উইলি কোনো কথা না বলে রেণীকে দেখাল। আমি ফরাসী ভাষায় বলতে চেষ্টা করলাম, "মাফ করবেন মাদমোয়াজেল, মানে আমি…।"

আমার ফরাসী শুনে আরও জোরে হেসে উঠলো উইলি, "ওকে লোটি বলে ডাকবে।"

"কি বললে?" মুখে মিষ্টি হাসি, অথচ গলাটা পুরুষের মতো ভারী করে রেণী বলে উঠল।

"রেণী একজন শিল্পী," উইলি বলল, "দ্বৈত-সংগীত গায়। বুঝতে পারছো কিছু?"

"না।"

"ও দ্বৈত-সঙ্গীত গায়, তবে একলা। একটা চড়া গলা, পুরুষদের মতো, অন্যটা ভীষণ মিষ্টি।"

এবার রহস্যটা আমরা বুঝতে পারলাম। সত্যিই লোটি এক অসাধারণ নারী। জর্জ ক্লল উইলি আর লোটিকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে বলল, তার মানে এডুয়ার্ড আজ চারজনের জন্যে কুপন পাবে, যার দামে কয়েক টুকরো হাড়ও পাওয়া যায় না।

সবে সন্ধ্যে হয়েছে। অফিসের ওপর আমার ঘরের জানলার ধারে বসে আছি আমি। আমাদের বাড়ীটা একটু নীচু, তেরছা আর পুরনো। আগে এটা গির্জার সম্পত্তি ছিল। গত ষাট বছর ধরে ক্লল অ্যাণ্ড সন্সের অধিকারে আছে। সম্পত্তিটার দু'পাশে দু'টো নীচু বাড়ী, খিলান দেওয়া দেওয়া গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। অন্যটায় থাকেন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মেজর নোপফ, তাঁর স্ত্রী আর তিন মেয়ে। তারপরে আমাদের সুন্দর বাগানটা। বাঁ দিকে দোতলা কাঠের বাড়ী, যার এক তলায় থাকে আমাদের ভাস্কর কুর্ট বাক্। শোকাহত সিংহ বা উড়ন্ত ঈগল তৈরী করে যোদ্ধাদের কবরে বসাবার জন্যে। আর অবসর সময়ে স্বপ্ন দেখে সোনার মেডেল পাচ্ছে তার শিল্পকর্মের জন্যে। এ ছাড়া গিটার বাজিয়ে দিন কাটায়। কুর্টবাকের বয়স এখন মাত্র বত্রিশ।

কফিন-মিস্ত্রী উইলকি রোগা মতন লোক, কেউ জানে না ওর ঘর-সংসার আছে কি না। কেউ মরলে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির দালালদের হাতফস্‌কে যদি তাঁর আত্মীয় আমাদের কাছে আসে কবরের জন্যে কিছু কিনতে, তখন কফিনের দরকার থাকলে আমরা উইলকিকে দিতে বলি অর্ডারটা। তবে হোলমান অ্যাণ্ড ক্রোৎজের দালালটিকে এড়ানো মুশকিল হয়, কেউ মারা গেছে খবর পেলে চোখে পেঁয়াজের রস মেখে চোখ লাল করে পৌঁছে যায় সেখানে। মৃতের আত্মীয়রা দেখে লোকটা তাদের জন্যে শোকে কাঁদছে। ফলে ওর মারফতেই কবরের সব-কিছু কেনাকাটা করে। ফলে ঐ দালালটির নামই হয়ে গেছে কাঁদুনে অস্কার।

ধীরে ধীরে রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। লিসার ঘরেও আলো। জানলার পর্দা টানা, তার মানে ঘোড়ার কসাইটা এখন বাড়ীতেই আছে। লিসাদের বাড়ীর পাশে মদের ব্যবসায়ী হোলস্‌ম্যানের বাগান। সেখান থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

আমাদের বাড়ীর গেট খুলেই বেরোলেন সার্জেণ্ট মেজর নোফক। মাথায় টুপি, হাতে লাঠি। কুচ্‌কাওয়াজ করার বই ছাড়া অন্য কিছু জীবনে পড়েছেন বলে মনে হয় না, অথচ চেহারায় দার্শনিক পণ্ডিত নীট্‌শের আদল আসে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় উনি যান, ফেরেন মাঝরাতে। খানিকটা মাতাল হয়ে, তবে বিশেষ ধরনের জিন ছাড়া আর কিছু উনি খান না। আমাদের কাছে ঐ জিন সব দোকানেই একরকম লাগে, অথচ নোপফ সত্যিকারের সমঝদারের মতো কোন্‌ জিনটা *কোন্‌ সরাইখানার, তা এক চুমুকেই বলে দিতে পারেন। ঐ নিয়ে অনেকবার বাজিও জিতেছেন।

আমার ঘরটা ছোট। একটি খাট, বইয়ের র‍্যাক, টেবিল, গোটা-কয়েক চেয়ার আর একটা পুরনো পিয়ানো। পাঁচ বছর আগে আমি ছিলাম একজন সৈনিক। সেই তুলনায় আজ বেশ সুখেই আছি, এ জীবন তো আমি কল্পনাই করি নি। তখন আমরা ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে। জোর লড়াই হচ্ছে। আমাদের দলের সিকিভাগ মাত্র বেঁচে। একদিন

পেটে গুলি লেগে জর্জে ব্রুল হাসপাতালে ফিরে গেল। তার তিন সপ্তাহ পরে হাঁটুতে গুলি খেয়ে আমিও চলে এলাম হাসপাতালে। ফলে আমি ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। অসুস্থ মায়ের শেষ অনুরোধকে মর্যাদা দিতে গিয়ে স্কুলে ঢুকলাম শিক্ষক হয়ে। যুদ্ধ শেষ হবার কয়েক মাস আগে মা চলে গেলেন। আর যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে জীবন্ত সমাধি হল আমার। বাচ্চাদের সঙ্গে থেকে আর বাচ্চাদের খাবার খেয়ে জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে যাচ্ছিল আমার।

……বই পড়ার চেষ্টা করলাম। মন বসলো না। বসন্ত মানুষকে উতলা করে তোলে। সন্ধ্যায় আধো অন্ধকার যেন চারদিক থেকে আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই ঐ বিষাদের ভাবটা কেটে গেল। টেবিলের ওপর হলুদ রঙের ব্যাগে কয়েকটা টাইপ-করা কাগজ। আমার লেখা কবিতা। খবরের কাগজে পাঠাই, কখনো ছাপা হয়, কখনো ফেরত আসে। জর্জের বন্ধু বলে সম্পাদক আমার কবিতা ছেপেছেন। তবে অন্য একটি লাভ হয়েছে ওয়ারদেন-ব্রুক কবি ক্লাবের সদস্য করে নেওয়া হয়েছে আমাকে। এডুয়ার্ডের ওল্ড জার্নাল-রুমে প্রতি সপ্তাহে আমাদের সভা বসে।

কবিতাগুলোকে হঠাৎ আমার খুব ছেলেমানুষী রচনা বলে মনে হল। আমি প্রথম লেখা শুরু করি যুদ্ধের সময়। তখন ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতাম। এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত আমার সুর। তবে এখন যুগ পাল্টে গেছে। এখন বুঝতে পারি, এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই পাশাপাশি থাকে, সাধারণতঃ যেগুলোর থাকার কথা নয়। এসবের জন্যে আর কবিতা লেখার দরকার নেই। আমার বইয়ের র‍্যাকে কবিতার বইগুলোতে সে-সব কথা খুব সুন্দর করে বলা হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। অবশ্য এটাও ঠিক, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে আমাদেরই বা চলবে কি করে? তাই লিখি…কিন্তু লেখার মধ্যে এক অস্পষ্টতা, এক অদ্ভুত বিবর্ণতা ফুটে ওঠে, যার সঙ্গে এই উজ্জ্বল প্রকৃতির কোনো মিল থাকে না।

নীচে নামলাম, অন্ধকার অফিসঘরটি পার হয়ে বাগানে এলাম। নোপফের

বাড়ীর দরজা খোলা, তিনটে মেয়ে সেলাইকল নিয়ে ব্যস্ত দেখলাম। পাশের ঘরের জানলাগুলো বন্ধ, তার মানে জর্জ বাড়ী নেই। হাইনরিখও বোধ হয় তার প্রিয় রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে আছে। বাগানের দিকে পা বাড়াতেই বুঝতে পারলাম কেউ সেখানে জল দিয়ে গেছে। মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ। উইলকির কফিনের দোকান ফাঁকা, একটি শোকাহত সিংহের মূর্তি মেঝেতে, পুরো তৈরি হয় নি, দেখলে মনে হয় সিংহটির দাঁত ব্যথা করছে। পাশে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিয়ারের দুটো খালি বোতল।

হঠাৎ একটা পাখি গান গেয়ে উঠল। হাইনরিখ যে ক্রুশটা বিক্রি করে এসেছে, তারই মাথায় বসে আছে একটা থ্রাশ পাখি। ওর গানের সুরে আমার মনে আনন্দ আর বিষাদের ঢেউ এসে লাগল। আমি যেন ক্রমশঃ নিজের মধ্যে আর থাকতে পারছি না, এই ভরা সন্ধ্যার আকাশ, পাখির গান যেন আমাকে শতছিন্ন করে আর এক অদৃশ্যলোকে নিয়ে যেতে চাইছে। অতিকষ্টে মনটিকে সংযত করে ফিরলাম।

পিয়ানো খুলে বসলাম। পাখির গানের সুরটা তোলবার চেষ্টা করলাম পিয়ানোতে। একটু পরে কে যেন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে শুনছ, বাজাতে শিখছো না কেন?

ছুটে গেলাম জানলায় কাছে, একটা কালো দীর্ঘ ছায়া অনেকটি দূর এগিয়ে গেছে গলিটা দিয়ে। ওখান থেকে ইঁট ছুঁড়ে মারলেও নাগাল পাব না। নাহ্...লোকটাই ঠিক বলেছে এ জীবনে আমি কিছুই ঠিকমত শিখতে পারলাম না। আমি সব ব্যাপারেই বড় চঞ্চল, বড্ড অসহিষ্ণু। ফলে কিছু হল না জীবনে। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই কি জীবনটাকে ব্যাখ্যা করা যায়, লাগাম-পরানো ঘোড়ার মতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়? না কি হঠাৎ দমকা হওয়া লাগায় পালতোলা নৌকো যেমন ছুটতে থাকে, মাঝে মাঝে জীবন সেই ভাবেই এগোয়? জীবন কী করে পূর্ণতার স্বাদ পায়? আকুতি? হতাশা? সুখ? কীসের সুখ? অবসাদ? অপ্রশ্ন আত্ম-সমর্পণ? মৃত্যু? কেন আমি বেঁচে আছি? কীসের জন্যে বেঁচে থাকব?

॥ ৩ ॥

রবিবারের সকাল। গির্জার চূড়োতে ঘণ্টা বাজছে। গতরাতের সব স্বপ্ন-কল্পনা এখন মুছে গেছে। ডলারের দাম আজও ছত্রিশ হাজারেই দাঁড়িয়ে। সময়ের গতি যেন হঠাৎ স্তব্ধ। নির্মল আকাশ। পবিত্রতার স্পর্শ চারদিকে। এই মুহূর্তে খুনীকেও ক্ষমা করা যায়, পাপ-পুণ্য শব্দ-গুলোকে নিরর্থক মনে হয়।

ধীরে ধীরে পোশাক পরতে লাগলাম। জানলা দিয়ে ভোরের সূর্যের আলোয় স্নান করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরের মধ্যে। দূর থেকে সার্জেণ্ট মেজর নোপফের নাক-ডাকার শব্দ, কে যেন করাত চালাচ্ছে। জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালাম। সকালের নিস্তব্ধতা খান্‌খান করে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। হাইনরিখ ক্রল। পাঁচ বছর আগে যুদ্ধে বোমার আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে গিয়ে ছিল, আজও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে তার।

কফি তৈরি করলাম। মার্জারিন মাখিয়ে রুটি খেলাম। জামাকাপড়ের অবস্থা আমার ভাল নয়। যুদ্ধের দুটো উর্দি ছিল, সেটা কাটিয়ে ভদ্র-গোছের পোশাক করে নিয়েছি, একটিকে নীল, অন্যটাকে কালো রঙও করিয়ে নিয়েছি। এ ছাড়া যুদ্ধে যাবার আগে একটা স্যুট করিয়ে ছিলাম। ভাল ফিট না করলেও কাজ চলে যায়। কাল যে টাইটি কিনেছি, সেটি এর সঙ্গে খুব ভাল মানাবে। এটি পরেই আমি যাব ইসাবেলের সঙ্গে দেখা করতে।

বেশ প্রসন্ন মন নিয়ে পথ হাঁটছিলাম। ওয়ারডেনব্রুক শহরটি প্রাচীন, হাজার ষাটেক লোক। আগেকার দিনের কাঠের বাড়ী, মাঝে মাঝে হঠাৎ সম্পূর্ণ বেমানান ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হালফ্যাশানের বাড়ী। একটু দূরে ছোট্ট একটি পাহাড়, তারপরে বড় একটি পার্ক, ওই পার্কেই আছে পাগলাদের আশ্রম। এখানেও পবিত্র রবিবারের ছোঁয়া লেগেছে। বাতাসে পাখির গান, সবুজের গন্ধ। এই আশ্রমটির

লাগোয়া একটি গির্জা আছে, সেখানে প্রতি রবিবার ভজন-উৎসবে আমি অর্গান বাজাই। স্কুল-মাস্টারি করার সময় এটা বাজাতে শিখেছিলাম। গত বছর থেকে এটি ভাঙ্গিয়ে কিছু উপার্জন করছি। মুচি কার্ল ব্রিলের বদমাশ ছেলেদের সপ্তাহে একদিন শেখাই, বদলে মুচি আমায় জুতো সারিয়ে দেয় আর সামান্য টাকাও দেয়। বইয়ের দোকানের মালিক বাউয়ারের হাঁদা ছেলেটিকে বাজনা শেখাই, বদলে সব নতুন বই বিনা পয়সায় পড়তে পাই, কিনলে পরে কমিশনও দেয়। আমাদের কবিদের ক্লাবের সকলেই আমার মারফত এই সুযোগটা নেয়, এমন কি বই কেনার থাকলে এডুয়ার্ড নবলকও হঠাৎ আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে।

ভজন শুরু হয় সকাল ন'টায়। আমি অর্গানের সামনে চুপ করে বসে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে না এসে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ে।

বেদীর ওপর মোমবাতি জ্বালা হয়েছে। বড় বড় জানলার রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলোও আসছে। দামী জোব্বা-পরা পুরোহিত দাঁড়িয়ে।

আমি বাজাতে শুরু করলেই সকলেই একসঙ্গে তাকায় আমার দিকে। ফ্যাকাশে মুখ আর গাঢ় চোখের তারায় মুহূর্তের জন্যেও কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। বাজনা শেষ হলে পুরোহিত বক্তৃতা শুরু করেন।

সামনের দিকে কয়েক সারি ভক্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনে। পেছনের দিকে যারা থাকে, তারা যেন কোনো এক অপার্থিব জগতে বিচরণ করছে।

সামনের সারিতে নজর দিতেই দেখলাম ডানদিকে ইসাবেল বসে আছে। মাথাটি একটু হেলানো। ও যে ঠিক প্রার্থনা করছে তা নয়, তবে এমন এক জগতে ও চলে গেছে যেখানে ওর নাগাল পাওয়া যাবে না। আমি ধীরে ধীরে অর্গান-বাজাতে শুরু করলাম। খুব নরম সুরে…ঈশ্বরীয় রূপান্তর ঘটে চলেছে রুটি আর মদ ক্রমশঃ ঈশ্বরের মাংস আর রক্ত হয়ে উঠছে।

ভজন-উপসনার পর আশ্রমের নার্সরা আমাকে প্রাতরাশ দিল—ডিম, কাটা ফল, রুটি, মধু। এটা আমার পারিশ্রমিকের একটা অংশ। আজকে

দুপুরের খাবার আর খেতে হয় না আমায়, তাছাড়া এডুয়ার্ড রবিবারে কুপন ব্যবহার করতে দেয় না। এই খাবার ছাড়াও পাই দু'হাজার মার্ক। ঠিক যাতায়াতের ভাড়াটুকু। অবশ্য এখানে আমি মাইনে বাড়াবার কথা কখনো বলিনি, বলি না।

খাওয়ার পর আশ্রমের লাগোয়া পার্কে বেড়াতে গেলাম। এটা আমি প্রত্যেকবারই করি। ভারী সুন্দর, শান্ত পরিবেশ। ফুল, গাছ, বেঞ্চ-পাতা, কেউ বসছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বা গল্প করছে, কেমন যেন একটা ঘরোয়া পরিবেশ।

পার্কটিকে আমার খুব ভাল লাগে, কারণ এখানে যুদ্ধ, রাজনীতি বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কেউ তর্ক জুড়ে দেয় না।

আশ্রমের যেসব রোগীদের বেড়াবার অনুমতি আছে, তারা এখানে আসে। কেউ বেঞ্চে মাথা নীচু করে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রথম প্রথম পাগল দেখতে আমায় গা শিরশির করত। কৌতূহলের সঙ্গে ভয় মিশে থাকত। মনে পড়ে যেতো প্রথম যেদিন মৃতদেহ দেখি, সেদিনের অনুভূতির কথা। তখন আমার বয়স মাত্র বারো। একদিন শুনলাম জর্জ হেলমান মারা গেছে, অথচ এক সপ্তাহ আগে তার সঙ্গে খেলেছি আমি। তখন সে ফুলের মালায় ঢাকা অন্য এক জগতের মানুষ হয়ে গেছে। মুখে কেমন যেন হলদেটে ভাব। পরে যুদ্ধে আমি অসংখ্য লোককে মরতে দেখেছি চোখের সামনে, কিন্তু হেলমনের মুখটা আমি আজও ভুলতে পারি নি। মানুষ প্রথম অভিজ্ঞতা প্রায়ই ভুলতে পারে না। সেই মৃত্যুর ছায়া আমি এখানকার পাগলদের চোখে মাঝে মাঝে দেখি—ব্যতিক্রম শুধু ইসাবেল।

মেয়েদের চত্বরের দিক থেকে ইসাবেলকে আসতে দেখলাম। হলুদ রঙের ঝলমলে পোশাক ওর দেহটাকে ঘিরে যেন উড়ছে, হাতে চওড়া ঘাসের টুপি।

আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। ইসাবেলের মুখটা লম্বাটে, চোখ আর মুখ ছাড়া কিছু নজরে পড়ে না। চোখের তারা ধুসর-সবুজ এবং স্বচ্ছ। ঠোঁট জোড়া টি. বি. রুগীর মতো লাল, কিংবা খুব করে যেন রঙ

মাখিয়েছে মনে হয়। মাঝে মাঝে ওর চোখজোড়া হঠাৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায়, তখন ওকে খুব বুড়ী-বুড়ী লাগে। এই অবস্থায় ও জেনী হয়ে ওঠে, তখন ওর ওপর ভরসা করা যায় না, কোন আকর্ষণ থাকে না, কে যেন সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট; অথচ অন্য সময়ে সে ইসাবেল। ওর এই ছুটো রূপই কিন্তু অলীক। আসলে ও হল জেনেভিয়েভ তারহোভেন, ভুগছে এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিতে—তার চেতনা দ্বিধাবিভক্ত, ওর মধ্যে ছুটো সত্তা পরস্পর ক্রিয়াশীল, তাই কখনো ও নিজেকে জেনী মনে করে, কখনো ইসাবেল। এই পাগল-আশ্রমে সবচেয়ে কমবয়সী রোগিণী কে। ওর মা নাকি বেশ বড়লোক, থাকেন আলসাসেতে। মেয়ের তেমন খোঁজ খবর নেন না, অন্তত এই ছু'সপ্তাহ থেকে আমি জেনিভেয়েভকে চিনি, অথচ এর মধ্যে ওর মাকে একবারও আসতে দেখিনি।

আজকে ও ইসাবেল। এই মুহূর্তগুলোতে ও এক স্বপ্নের জগতে ঘোরে, মনে হয় ওর যেন কোনো অবয়ব নেই, ভার নেই। হলুদ প্রজাপতি যদি উড়ে এসে ওর কাঁধে বসে, তাতেও আমি আশ্চর্য হব না।

"আরে আবার এসেছ দেখছি," ইসাবেল বলল, মৃছ হেসে, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

ও যখন ইসাবেল হয়ে থাকে, তখন আমাকে 'তুমি' বলে, শুধু আমাকে কেন, সবাইকে 'তুমি' বলে ডাকে। "কোথায় ছিলে?" ইসাবেল আবার প্রশ্ন করল।

"আমি গেটের দিকটা দেখিয়ে বললাম, "ঐ দিকে ··বাইরে···।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ইসাবেল, "বাইরে? কেন? কিছু খুঁজছিলে?"

"মনে হয়······তবে যদি জানতাম ঠিক কি খুঁজছি?"

ও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, "ওসব খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দাও রল্‌ফ! কেউ খুঁজে কখনো কিছু পায় না।"

রলফ্‌ নামটা শোনামাত্র আমি একটু গুটিয়ে গেলাম। ইসাবেলের যেমন দ্বৈতসত্তা আছে, তেমনি ও মাঝে মাঝে আমাকে রলফ্‌ বলে, মাঝে মাঝে রুডলফ বলে ডাকে। আবার কখনো জনৈক রাওয়েল হয়ে উঠি আমি। রলফ্‌ একটা ঘ্যান্‌ঘ্যানে স্বভাবের মানুষ। ওকে আমার

পছন্দ হয় না। রাওয়েল এক অবিশ্বাসী প্রেমিক—ইসাবেলের মুখে তাই রুডলফ নামটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে—বেশ প্রেমিক-প্রেমিক লাগে। আমার আসল নাম লুডউইগ বোদমার—ও সবসময়ে এড়িয়ে চলে। আমি অনেকবার প্রতিবাদ করেছি, ও কান দেয় না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমি বেশ গোলমাল করে ফেলতাম। এখন সয়ে গেছে। তখন মনে হত পাগলরা সব মারাত্মক খুনে ধরনের হয়। কিংবা আপন মনে বক্‌বক্‌ করে। অথচ জেনিভিয়েভ এর ব্যতিক্রম, প্রথমে তো আমার মনে হয়েছিল ওর কোনো অসুস্থতাই নেই। বেশ হাসিখুশী একটা মেয়ে। তবে কিছুদিন যাবার পর বুঝতে পারলাম, ওর ওই কুড়ি বছরের স্পর্শকাতর, রোগা রোগা শরীরের মধ্যে একটা দারুণ গরমিল আছে। বিষাদ-প্রতিমার মধ্যে কিসের এক আকর্ষণও আছে।

আমার হাত ধরে ও বলল, "এসো, রলফ্‌।"

"আমি রলফ্‌ নই, আমি রুডল্‌ফ।"

"তুমি রুডল্‌ফ নও।"

"না, আমি রুডল্‌ফ···।"

ও হেসে বলল, অবাধ্য ছেলেকে বোঝাবার মতো করে ও বলল, "তুমি রুডল্‌ফ নও, তুমি রলফ্‌ও নও। ছুটোই না হলে তুমি কি? এবার এলো রলফ্‌।"

আমার মনে হল ইসাবেল পাগল নয়, ইচ্ছে করে পাগলের ভান করে। "বড় বিরক্ত কর তুমি···সবসময়ে তুমি একই লোক হয়ে থাকতে চাও কেন?"

"সত্যিই তো, কেন চাই?" আমি চমকে উঠলাম, "ঠিক বলেছ, তুমি, একজনের মধ্যে এতো মূল্যবান কি থাকতে পারে? নিজেকে এতো গুরুত্ব দেয় কেন মানুষ?"

ইসাবেল মাথা নাড়ল, "তুমি আর ডাক্তার! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতাসে সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। কেন যে তোমরা দুজনে আমার কথা মেনে নাও না।"

"ডাক্তারও মানে না? আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ, ও নিজেকে তাই মনে করে। যে আমার মনের কথা বের করার চেষ্টা করে। অথচ ও কিচ্ছু জানে না। এমন কি রাতে যখন কেউ লক্ষ্য করে না, তখন ঘাসেরা কেমন দেখায় তাও জানে না।"

"কেমন আবার? ধূসর রঙের নিশ্চয়ই। কালোও দেখাতে পারে।" তবে চাঁদের আলো পড়লে বোধ হয় রূপোলী?

ইসাবেল মাড়া নাড়ল, যা ভেবেছি তাই। ঠিক ঐ ডাক্তারের মতো কথা।"

"তাহলে কেমন দেখায়?"

ও দাঁড়ালো। দমকা হাওয়ায় ওর হলুদ রঙের ঝলমলে ফ্রকটা পালের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

"রাতে ওরা থাকেই না," ও বলে উঠল।

"না থাকলে, কি থাকে ওখানে?"

"কিছুই থাকে না। তুমি যতক্ষণ লক্ষ্য করবে ততক্ষণ থাকবে। কখনো যদি হঠাৎ মুখ ঘোরাও তাহলে হয়তো ধরতে পারবে।"

"কি ধরতে পারব? যে ঘাস ওখানে থাকে না?"

"না, তা নয়, কিভাবে ওরা ফিরে আসছে সেটা ধরতে পারবে। সব ব্যাপারেই তাই। চোখ ফেরালেই সবকিছু হারিয়ে যায়।

"কি হারিয়ে যায় ইসাবেল?" খুব সাবধানে জানতে চাইলাম।

"যা কিছু তোমার পেছনে থাকে। তোমার পেছন ফেরা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করে থাকে, তারপরই অদৃশ্য হয়ে যায়।"

তার মানে মানুষের পেছনে সব সময়ে থাকে এক অনন্ত শূন্যতা। মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিয়ে আমি বললাম, "তুমি যখন পেছন ফের, তখন কি আমিও থাকি না?"

"তুমিও থাক না। কিছুই থাকে না।"

"তাই নাকি?" আমি একটু ব্যঙ্গ করে বললাম, কিন্তু আমি যত তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াই না কেন, সব সময়েই থাকি।" "তার কারণ তুমি ভুল দিকে ঘোরো," ইসাবেল হারতে রাজী না।

"ঘোরাও দিক আছে নাকি?"

"তোমার জন্যে আছে রলফ্।"

আবার "রলফ্"···আমি গুটিয়ে গেলাম, "আর তোমার ক্ষেত্রে?"

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, "আমি? "আমি তো এখানে নেই-ই।"

"তাই নাকি? তবে আমার কাছে তুমি সত্যিসত্যিই আছ।"

ইসাবেলের মুখের ভাব পাল্টে গেল; ও যেন আবার আমায় সহজ ভাবে চিনতে পারছে, তুমি সত্যি কথা বলছো তো? তবে ও কথাটা তুমি আমাকে বারবার বলো না কেন?"

"কিন্তু আমি তো সবসময়েই বলি।"

"আমি আরও শুনতে চাই, যতোই বল না কেন, যথেষ্ট মনে হয় না," ইসাবেল আমার গায়ের সঙ্গে মিশে এল। ওর নরম শরীরের ছোঁয়া পেলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলে উঠল, "কিছুতেই যথেষ্ট মনে হয় না। এ কথাটা তোমরা কেন যে বুঝতে পার না? তোমরা সবাই যেন পাথরের মূর্তি।

পাথরের মূর্তিই বটে আমরা। এ ছাড়া আর কোনো ভূমিকা আমাদের আছে বলে মনে হয় না। ইসাবেল সুন্দরী, মনকে নাড়াও দেয় ভীষণ ভাবে। যতোবার ওর সান্নিধ্যে আসি, মনে হয় আমার প্রতিটি স্নায়ুতে হাজার হাজার ডাক আসছে টেলিফোনে, তারপর হঠাৎ এক সময়ে রং-নম্বর হয়ে গিয়ে টেলিফোনটি কেটে যাচ্ছে। বড় অসহায় হয়ে যাই তারপরেই। পাগলকে কেউ চায় না। কেউ চাইলেও চাইতে পারে, অন্ততঃ আমি না। অথচ ওকে অস্বীকার করার ক্ষমতাও আমার নেই।

হাঁটতে হাঁটতে খোলা জায়গায় চলে এসেছি, এখানে রোদ বেশ কড়া। "টুপিটা পরে নাও ইসাবেল। ডাক্তার বলেছেন না!"

টুপিটা ফুলবাগানে ছুঁড়ে দিল, "ডাক্তার? ডাক্তার তো অনেক কিছুই বলে। আমাকে বিয়ে করবে বলে। একেবারে বাজে লোক ও।"

কথা বলতে বলতে ইসাবেল ফুলবাগানের মধ্যে বসে পড়ল। টিউলিপ ফুলগুলোকে দেখিয়ে ও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠল; যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

"কী হলো ?" আমিও চমকে উঠেছি।

ফুলের কেয়ারিটা দেখিয়ে ও বলল, "সাপ।"

"না, না, ওখানে সাপ নেই।"

"আছে। ঐ তো, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। বুঝতে পারছ না ওরা কী চায় আমার কাছ থেকে ?"

"ওরা তো শুধু ফুল, কি চাইতে পারে ?"

কাঁপতে কাঁপতে ইসাবেল বলল, "ওরা আমায় ছুঁতে চায়।" আমি ওকে জড়িয়ে ধরে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলাম। ইসাবেল যে ভীষণ উত্তেজিত, সেটা ওর বুকের ধক্‌ধক্ শব্দতে বুঝতে পারছিলাম। "এটা হতে দিয়ো না রুডল্‌ফ"—ওর মুখে রুডল্‌ফ ডাকটা শুনেই বুঝতে পারলাম ও স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

"না না, কিছুই হতে দেবো না···", আমার কথা শেষ হবার আগেই আশ্রমের একজন নার্স এগিয়ে এলেন, চলুন, "আপনার খাবার সময় হয়েছে।"

"খাওয়া! সবসময় কি খেতে হয় রুডল্‌ফ!"

"অন্তত বাঁচবার জন্যে তো বটেই।"

"আবার মিথ্যে কথা! পাথররা কি খায় ?"

"না। কিন্তু পাথরের কি প্রাণ আছে ?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

"নিশ্চয়ই আছে। তারা তো অমর।"

কোনো কথা না বলে নার্সটি এসে ইসাবেলের হাত ধরল।

"আমার টুপি ? নার্সটি ফুলের বাগানের দিকে তাকিয়ে ওই দিকে পা বাড়াল।

"রুডল্‌ফ আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। "ফিস্‌ফিস করে বলল ইসাবেল, "যাবো না।"

"এরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তুমি যেয়ো না।"

"তোমায় ছেড়ে আমি যাবো না ইসাবেল।"

ইসাবেলের চোখে শেষ বিদায়ের আভাস ফুটে উঠেছে। প্রতিবারই এমনি হয় অবশ্য। জানি না, এর পরের বার যখন দেখা হবে, তখন কেমন

থাকে।

ইসাবেল চলে গেল, একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকাল না।

জেনেভিয়েভের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। ও নিজের থেকে আমার কাছে এগিয়ে এসে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেছিল যেন আমি ওর বহুদিনের পরিচিত কেউ। অবশ্য এখানে এই পাগলদের আশ্রমে এটাই খুব স্বাভাবিক। এখানে কেউ কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় না ঘটা করে। তুচ্ছ কথা নিয়ে শুরু হয়ে যায় আলাপচারি। কেউ যে কারুর কথা মন দিয়ে শোনে, তা নয়। সবাই কথা বলে যায়। যেমন পোপ সপ্তম গ্রেগরী, মানুষটা ছোট্টখাট্ট, পা দুটো ব্যাঁকা। কারুর সঙ্গে তর্ক করে না, জোর করে বোঝাতে চায় না যে সে একজন পোপ, ধর্মযাজক। ও যা তাই-ই, শুধু রাজা চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে তার খুব গণ্ডগোল বেঁধেছে। ওর কথা বলায় বড় সঙ্গী হল কানোসা, এর ধারণা শরীরটা কাঁচ দিয়ে তৈরী। লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই ও ভেঙ্গে যাবে। এই দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা আছে, এবং সেটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাই জেনেভিয়েভ যখন আপন মনে আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল, তখন আমি কিছু মনে করিনি। অবশ্য তখন ও ইসাবেল ছিল।

সেদিন ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল। ওর পরনে ছিল দামী সোনালী রঙের গলাবন্ধ কোট। সান্ধ্য পোশাক, আর সোনালী জুতো। সকাল এগারোটায় সময় এমন পোশাকে কাউকে দেখলে লোকে হাসবে, অথচ এই পরিবেশে সেটা মনে হয় নি আমার। মনে হয়েছিল, অন্য কোনো সুখী পৃথিবী থেকে ওকে এইমাত্র প্যারাসুটে করে এই গ্রহে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর সেই জগৎকে যুক্তির আলো সরলভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে দিন নেই, রাত নেই, সুমেরু-প্রভার আলোয় সবকিছু সবসময়ে স্বপ্নময় হয়ে আছে। সেখানে সময়ও যেন হারিয়ে ফেলেছে তার গতি।

প্রথম দিন থেকেই ও আমাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। আমি যুদ্ধের পোড়-খাওয়া ছেলে, অথচ ইসাবেলের সান্নিধ্যে এসে কেমন

যেন হয়ে গেলাম। ও আমার সামনে বসেছিল, অথচ আমার মনে হয়েছিল ও যেন অশরীরী, হাওয়ায় ভাসছে। ওর অসংলগ্ন কথার মাঝে এক অদ্ভুত ধারালো যুক্তির ছাপ দেখতে পেয়েছি। যখন ওকে খুব কাছে পেয়েছি বলে মনে হয়েছে, তখনি দেখলাম ও বহু দূরের জগতের মানুষ হয়ে গেছে।

প্রথম দিনেই ও আমায় চুমু খেয়েছিল, এবং এত সহজভাবে খেয়েছিল যে তার কোনো অর্থই করা যায় না। অথচ আমার রক্তে দোলা লেগেছিল, একটা বড় ঢেউ যেন পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়েছিল। আমি জানতাম ও আমায় চুমু খায় নি, খেয়েছে কোনো এক রলফ্ বা রুডল্ফকে, আবার এ-ও হতে পারে ও নামে কেউ নেই, সবই ইসাবেলের কল্পনার জগতের।

তারপর থেকে প্রতি রবিবার ও পার্কে আসত। বৃষ্টি পড়লে গির্জা ঘরে মাদার সুপিরিয়ার আমাকে উপাসনার পরেও অর্গান প্র্যাক্টিস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বৃষ্টির দিনে আমি তাই করতাম। আমি খুব ভাল বাজাই, অতএব প্র্যাকটিসের প্রশ্ন ওঠে না। আপন মনে বাজাতাম আমি। কখনও কখনও ইসাবেল এসে বলতো আধা-অন্ধকার মতন জায়গায়। বাইরে বৃষ্টি, জানলার কাঁচে ফোঁটা গড়ার শব্দ। অর্গানের সুর যেন ইসাবেলকে স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে কোন্ এক অজানা জগতে। ও তন্ময় হয়ে থাকত। কীসের এত চিন্তা? সেই প্রায়-অন্ধকার, নির্জন গির্জাঘরে দুদিকে দুজনে বসে আছি নিঃসঙ্গ প্রাণীর মতো, আধো-আলো, অর্গানের সুর আর বৃষ্টির সঙ্গীত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছে এক অনন্ত ব্যবধান। যেন আমি আর সে দুজনেই অন্ধ, মূক আর বধির হয়ে গেছি, অথচ আমরা কেউই অন্ধ, মূক বা বধির নই! এমন হঠাৎ করে কেন ও আমার জীবনে এল, ওর সঙ্গে কেনই বা আমার এই অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিছুই বুঝতে পারি না। অথচ আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে আমি নিজের অজ্ঞাতেই ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি ওর দিকে। …কিন্তু কেন…

একজন নার্স এসে খবর দিল মাদার সুপিরিয়ার আমাকে ডাকছেন।

দুরুদুরু বুকে এগোলাম তাঁর ঘরের দিকে। উনি নিশ্চয়ই ইসাবেলের সঙ্গে আমার মাখামাখিটা দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু না, মাদার সুপিরিয়ার আমাকে বললেন মে মাসের ভজন শুরু করলে কেমন হয়। মে মাসের প্রতি সন্ধ্যায় সব গির্জায় নাকি ভজন গান করার রীতি। তবে এখানে রোজ না করে শুধু রবিবার সন্ধ্যেবেলায় করতে চান তিনি! "তবে আপনাকে সকালের জন্যে যা দেওয়া হয়, ঐ রকমই টাকা দিতে পারব, তার বেশি না।"

"টাকার দাম তো ভীষণ কমে গেছে, যাচ্ছেও। তবে ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। এখানে তো মানুষ আসে ঈশ্বরের সেবা করতে, টাকার লোভে নয়। আমি খুব উদার হতে চাইলাম।

"তবে হ্যাঁ, হিজ্ রেভারেন্স (His Revernce) রাতে এখানেই খান। আপনিও চাইলে রাতের খাওয়াটা খেয়ে যেতে পারেন।"

মাদার সুপিরিয়ারের এই কথাটা আমার বেশ মনঃপূত হল। এখানকার খাবার এডুয়ার্ডের দোকানের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে, তাছাড়া প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার সৌভাগ্যও তো কম কথা নয়। উনি খেলে দু-এক বোতল ভাল মদ কি আর আসবে না? ঠিক আছে, আমি রাজী।

মাদার সুপিরিয়ার বললেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।"

আবার বাগানে ফিরে এলাম। ইসাবেল ফিরে আসবে না জেনেও মন ওকে চাইতে লাগল। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী বিকেল চারটে পর্যন্ত ও ঘুমোবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলাম। ঐতো আমার কতো নীচে শহরটা দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সরু সরু গলি, তারপর ফাঁকা মাঠ, আরও একটু দূরে পুকুর, ঝরণা, ওখানে মাত্র দশ বছর আগে পর্যন্ত বাচ্চা ছেলের মতো মাছ ধরতে যেতাম, প্রজাপতি ধরতাম। কিন্তু এই সর্বনাশা ১৯১৪ সালের যুদ্ধ যেন সব আমূল পাল্টে দিয়ে গেল। কিছুতেই যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। দুটো জীবন যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ইসাবেলের দুটো ভিন্ন জীবন-সত্তাকে চিনতে আমার

অসুবিধে হয় না। তবে ও নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে সুখী, কারণ যুদ্ধে ট্রেঞ্চের মধ্যে মানুষের অসহায় মৃত্যু, নৃশংসতা, ক্ষুধা, প্রতারণা আর প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে নীচে নেমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, ইসাবেল যেগুলোর সঙ্গে পরিচিত নয়। ফলে শান্তির এই পরিবেশেও আমরা মনের দিক থেকে অশান্ত, অসুখী।

॥ ৪ ॥

অফিসে আমরা রাইজেনফেল্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়াটা আজ ভালই হয়েছে। আমরা আজকের দিনটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রাইজেনফেল্ডের সঙ্গে আমাদের আজকের লেনদেনের ওপর। আমাদের সব মালই আছে, তবে শোকের জগতের সেরা সওদা কালো গ্রানাইট পাথরের খুব অভাব।

হাইনরিখ ক্রলকে আমরা কায়দা করে সরিয়ে দিয়েছি। রাইজেন-ফেল্ডের সঙ্গে আলোচনার সময় ও থাকলে খুব অসুবিধে হবে। তাই উইলকিকে দিয়ে জিন খাওয়ার নেমন্তন্ন করানো হয়েছে হাইনারিখের। সকালবেলায় খালিপেটে মদ পড়লে হাইনারিখের মেজাজ পাল্টে যায়। প্রচুর খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আজকেও তাই হয়েছে। উইলকির তৈরী-করা একটা কফিনের মধ্যে ঘুমোচ্ছে হাইনারিখ। উইলকিকে অবশ্য হু'বোতল মদ কেনার টাকা আমরাই দিয়েছি। উইলকি এখন আমাদের ভাস্কর কুর্ট বাকের ঘরে ডেমিনো খেলছে।

রাইজেনফেল্ডের কাছ থেকে যে মালটা আমরা চাইছি, তার জন্যে আগাম দাম দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। ব্যাংকে অত টাকা জমানোও সম্ভব নয়। অতএব আমরা ঠিক করেছি ওকে একটা তিন মাসের মেয়াদী হুণ্ডী দেব। এর সরলার্থ ওকে আমরা কার্যত কিছুই দিতে চাইছি না।

এইভাবে লেনদেনের রাইজেনফেল্ডের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ হুণ্ডীটা নিয়েই ও ছুটবে ব্যাংকে। ব্যাংক হুপক্ষকেই চেনে, তারা কমিশন কেটে টাকাটা দিয়ে দেবে রাইজেনফেল্ডকে। কমিশনের বাদটা

আমরা ওকে পুষিয়ে দেব। ব্যাংক আবার হুণ্ডীটা পাঠিয়ে দেবে সরকারী রাইখ্‌স ব্যাংকে। তারাও টাকা দিয়ে দেবে ব্যাংককে কমিশন কেটে। তিনমাস পরে আমরা পুরো টাকাটা দিয়ে দেব রাইখ্‌স ব্যাংককে। একবার চিন্তা করে দেখো কী পাবে ব্যাংক।

১৯২২ সালে আমরা এই পদ্ধতিটা জানতে পেরেছি, তার আগে মাল কেনার সময় দাম চুকোবার ফলে মুদ্রাস্ফীতির পাল্লায় পড়ে দারুণ লোকসান হতো আমাদের। এখন তো জার্মানীতে সবাই এই কায়দা ধরে নিয়েছে।

এই প্রস্তাবটা অবশ্য রাইজেনফেল্ডই আমাদের দিয়েছিল। ফলে ওর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ও এলে ওকে আমরা ভারতীয় রাজার সম্মান দেবার চেষ্টা করি। অবশ্য ওয়ারডেনব্রুক শহরে যতোটা সম্ভব ততোটাই।

"রাইজেনফেল্ডকে নিয়ে কী করা যায় বলতো?" নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে আমি বলে উঠলাম, "ওর মন ভোলাবার মতো কিছুই নেই এবার। লোকটা যতো কল্পনাবিলাসী, ঠিক ততোটাই চঞ্চল। ও এমন কিছু চায় যেটা হাত দিয়ে ধরা-ছোঁয়া যায়। হাতের কাছে তেমন কোনো সুন্দর মেয়েও নেই যে ওর লম্বা-চওড়া কাহিনী শুনবে হাঁ করে।"

জর্জ ঘাড় নাড়লো, "তাছাড়া ভাল মদও কিনে রাখা হয় নি। হাতে যা টাকা-পয়সা আছে তাতে আজ রাতের খরচাটাও চলবে কিনা সন্দেহ। সস্তা কিছুতে তো ওর মন ওঠে না।"

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল রাইজেনফেল্ড আসছে। দরজা খুলে দুজনেই স্বাগত জানালাম ওকে। ধপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে ও বলে উঠল, "অভিনয় করা ছাড়ো তো।"

"তাই করতে যাচ্ছিলাম," আমার উত্তর, "তবে জানি না কবে থেকে তুমি ভদ্রতাকে অভিনয় বলতে শুরু করেছ।"

'ভদ্রতায় আজকাল কাজ হয় না হে," রাইজেনফেল্ড ধূর্তের মতো হাসলো।

"কিসে হয়?"

"লোহার মতো শক্ত কনুই, আর রবারের মতো টানলে বড় হওয়া

বিবেক।"

"কিন্তু মিঃ রাইজেনফেল্ড," জর্জ বলে উঠল, "তোমার ভদ্রতার কথা কিন্তু সবাই প্রশংসা করে।"

"তাই নাকি? কোথাও ভুল করছেন না তো?" মুখে ঠাট্টা করলেও, মনে মনে যে ও খুব খুশি সেটা বোঝা গেল।

কথায় কথায় খাবার প্রশ্ন উঠল। তার আগে অবশ্য জর্জ জিনের বোতল বের করেছে।

"তা আজ কি খাবে রাইজেনফেল্ড?" আমার কথা মুখেই থাকলো, রাইজেনফেল্ড গর্জে উঠলো, "বড়রা যখন কথা বলবে, তখন চুপ করে থাকাই ভাল হে ছোকরা।...এই দেখ আমার এখন ছাপ্পান্ন চলছে, কিন্তু মনে হয় মাত্র কয়েক বছর আগে আমার বয়েস ছিল কুড়ি। দিনকাল কতো তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম বুড়ো হয়ে গেছি। তা জর্জ তোমার কি মনে হয়?"

"প্রায় ঐ রকমই। আমার চল্লিশ, তবে মনে হয় যেন ষাট বছরের বুড়ো। যুদ্ধের জন্যে মনে হয়।"

"আমার বেলায় কিন্তু তা নয়," আমি আগ বাড়িয়ে কথা বলি। আমি যখন যুদ্ধে যাই, তখন সতেরো পেরিয়েছি মাত্র। এখন পঁচিশ, অথচ মনে হয় এখনো সতেরো আছি। সতেরো থেকে সত্তরের মধ্যে আর কি। যুদ্ধ আমার যৌবন চুরি করে নিয়েছে।"

"তোমার ক্ষেত্রে তা নয়। তোমাকে দেখলেই মনে হয় তোমার বুদ্ধিকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। যুদ্ধ না হলে এটা ঘটতো না। যুদ্ধ তোমাকে এঁচড়ে পাকিয়ে দিয়েছে। তা না হলে তোমার বয়স বারো পেরোতো কিনা সন্দেহ।"

"ধন্যবাদ, এমন প্রশংসা শুনতেও ভাল লাগে," আমি বললাম রাইজেনফেল্ডের চোখে চোখ রেখে। তবে এটাও বুঝলাম যে, আজ সুবিধে হবে না আমাদের। রাইজেনফেল্ড অন্য মেজাজে আছে।

ওকে লোভ দেখাবার জন্যে কবিদের ক্লাবে যেতে বললাম, মেয়ে-কবি নেই শুনে তেমন আগ্রহ দেখাল না।

আমি হার স্বীকার করে কপালে যা হয় হোক এমন ভাব নিতে যাচ্ছি, এমন সময় শব্দ করে লিসার জানলাটা খুলে গেল। পাতলা পর্দার আড়ালে শুধু ব্রেসিয়ার আর প্যান্টি-পরা লিসা। আমি আমাদের ঘরের আলো জ্বালাতে যাবো, রাইজেনফেল্ড খেঁকিয়ে বলে উঠল, "আলো চাই না। আরে তোমাদের কি কবিতা ভাল লাগে না?"

রাইজেনফেল্ড জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে লিসা একটা টাইট জামা মাথা গলিয়ে পরছে।

"আহা, কী মোহিনী নারী...স্বপ্ন...স্বপ্ন...তা মেয়েটা কে?"

"স্নানরতা সুসানা," আমি রহস্য করতে চাইলাম।

"বাজে কথা ছাড়, নাম কি মেয়েটার?"

"কিছু জানিনা, আজ দুপুর পর্যন্ত ও এখানে ছিল না।"

"দারুণ মহিলা, নিশ্চয়ই ফরাসী," রাইজেনফেল্ড মাতব্বরের মত বললো।

লিসা বোহেমিয়ার মেয়ে আমি জানি, তবুও ওকে খুশি করার জন্যে বললাম, "তা জানি না। তবে কে যেন বলছিল ওর নাম মাদমোয়াজেল দ্য লা তুার।"

"দেখলে আমার অনুমান কতোটা ঠিক! আরে মেয়েমানুষ দেখলেই সব বলতে পারি আমি," রাইজেনফেল্ডকে তখন দ্যাখে কে?

লিসার ঘরের আলো নিভে গেল। এক চুমুকে বাকী মদটা গলায় ঢেলে রাইজেনফেল্ড জানলার কাঁচে মুখ রাখলো......ঐ তো লিসা নেমে এসেছে রাস্তায়। রাইজেনফেল্ড মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাঁটা দেখতে লাগলো।

রেড মিল রেস্টুরেন্টে ভীষণ ভীড়। আমরা শেষ পর্যন্ত টেবিল পেলাম অর্কেস্ট্রার পাশেই। কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কথা বলতে হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে হবে, ফলে আমরা বোবার মতো বসে থাকতে বাধ্য হলাম।

নাচের জায়গাটায় খুব ভীড়, তারই মধ্যে সাদা সিল্কের পোশাক-পরা একজনকে নজরে ধরেছে রাইজেনফেল্ডের। ও উঠে চলে গেল। মহিলাটি ওর চেয়ে এক মাথা লম্বা। কিন্তু পিছিয়ে আসার লোক নয় সে। দেখলাম

মহিলাটি বিরক্ত মুখে ওর সঙ্গে নাচতে লাগলেন।

"মুশকিল হল দেখছি, ও যদি আবার মহিলাকে সঙ্গে করে আনে, তা হলেই হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ বোতল মদ শেষ। এই রেটে চললে, আজ রাতেই দেউলিয়া হতে হবে," জর্জ বলল।

"চিন্তার কোনো কারণ নেই, মহিলা এখানকার বারমেড। আমাদের সঙ্গে খেতে বসার সময় হবে না ওর। তাহলে মদ পরিবেশন করবে কে?" আমি আশ্বাস দিলাম।

রাইজেনফেল্ড ফিরে এল, মুখ লাল, ঘামছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মন্দ নয়, তবে সেই জানলার ধারের কবিতাটি অসাধারণ। ওকে ভোলা যায় না। বুঝতে পারছ কার কথা বলছি?"

হঠাৎ জোরে বাজনা বেজে উঠলো। নাচ জমে উঠেছে, ওখানে ভীষণ ভীড়। কিন্তু একি? ফ্যান্সী ড্রেস-নাচের ভঙ্গীতে বাঁদরের মুখোশ পরে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আমারই প্রেমিকা এরনা। ও আমাকে দেখতে পায় নি, তবে ওর লাল চুল এতো দূর থেকেও চিনতে আমার ভুল হয় না। এরনা বেহায়ার মতো একটা ফাটকাবাজের কাঁধ ধরে লতিয়ে লতিয়ে হাঁটছে। আমার সারা শরীর কাঠ, মনে হচ্ছে একটা হাতবোমা গিলে ফেলেছি। এরনা নাচতে শুরু করেছে! হায় হায় এই মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে আমি দশটা কবিতা লিখে ফেলেছি। আমার অপ্রকাশিত কবিতার বই "ধুলো আর নক্ষত্রের আলো" ওকে উৎসর্গ করে বসে আছি। এক সপ্তাহ ধরে ও আমাকে এড়িয়ে চলেছে, পড়ে গিয়ে নাকি লেগেছে তাই বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। পড়েছে ঠিকই, পড়েছে ঐ ডবল-ব্রেস্ট কোট-পরা, হাতে সীলমোহরের আংটি-পরা এক ফাটকাবাজ ছোকরার খপ্পরে। আর আমিও কম বুদ্ধু নই। আজ বিকেলেই ওকে একগোছা গোলাপী টিউলিপ ফুল পাঠিয়েছি। সঙ্গে ছোট্ট একটা কবিতাও। ও নিশ্চয়ই আমার কবিতাটা ওই ফাটকাবাজ ছোকরাটাকে শুনিয়েছে এবং ওরা দুজনে নিশ্চয়ই হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

"কী হলো তোমার?" রাইজেনফেল্ড কানের কাছে চিৎকার করে উঠলো, "শরীর খারাপ লাগছে?"

"গরম," আমি চেঁচিয়ে বললাম। এরনা যদি আমাকে এখন এভাবে ঘামতে দেখে, খুব বিশ্রী হবে, তার চেয়ে আমি বেশ স্মার্টভাব দেখাবার চেষ্টা করি। যেন, নাচছে তো কি হয়েছে? আমি কেয়ার করি না।

জর্জ আমাকে দেখল, কিন্তু বলল রাইজেনফেল্ডকে, "তুমিও তো ঘামছো?"

"এটা অন্য জিনিস। এ ঘাম জীবনকে উপভোগ করার ঘাম, রাইজেনফেল্ডও চেঁচালো।

এরনা নাচতে নাচতে আমার কাছে চলে এসেছে। জামার কলার ঘামে ভিজছে আমার। আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে রাইজেনফেল্ড আবার বললো, "কী হলো হে আবার। তোমাকে দেখলেই চাঁদ-পাগলা ক্যাঙারু মনে হচ্ছে।"

আমি ওর কথার উত্তর দিলাম না। এরনা এবার আমার দিকে ফিরল, আমি দুটো আঙুল তুলে ওকে কাছে আসতে ইশারা করলাম।

"বুঝেছি, বুঝেছি," রাইজেনফেল্ড জোরে হেসে উঠল। কিন্তু আমি আরও হতাশ হয়ে গেলাম। এরনা আমাকে লক্ষ্যই করেনি।

একসময়ে বাজনা থাকল। নাচের আসরও ভাঙল, এরনা একটা কেবিনে ঢুকে পড়ল সঙ্গীর সঙ্গে।

"এইমাত্র কত ছিলে হে তুমি—সতের, না সত্তর?" অভ্যাসমতো জোরে জোরেই বলল রাইজেনফেল্ড, অথচ বাজনা থেমে গেছে। ফলে হলের সবাই ওর দিকে ফিরে তাকাল।

অন্য কথা পেড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে যাচ্ছি এমন সময় স্টেজে অন্য একজন ভাঁড়ামি করতে উঠে পড়েছে। তাকে কেউ চাইছে না দেখে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ও চলে গেল। এর পরে স্টেজে এল নতুন কনের সাদা পোশাক-পরা রেণী ছ লা ত্যুর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এরনাকে দেখাতে হবে রেণীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

রেণী তার চড়া মেয়েলী গলায় গান গেয়েই সঙ্গে সঙ্গে খাদে নামিয়ে পুরুষালি গলায় গান ধরলো। সবাই মেতে গেছে, মজা পেয়েছে।

"মহিলাটিকে কেমন লাগছে?" রাইজেনফেল্ডকে শুধোলাম।

"মহিলা ?"

"ওর সঙ্গে দেখা করবো ? মাদমোয়াজেল ছ লা ত্যুর ?"

রাইজেনফেল্ড যেন চমকে গেছে, "কী সব আজেবাজে কথা বোঝাতে চাইছ আমাকে। এটা আর জানলায় দেখা মহিলাটি কি এক ? ঐ দেখ …কে আসছে…"

সত্যিই তাই। লিসা সেই মুহূর্তে ঢুকলো। হু'টো মাঝবয়সী ফুর্তিবাজ লোক ওর হু'পাশে। আর ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন দারুণ শিক্ষিতা এক মহিলা।

"কি, ঠিক বলেছি কি না ?"

"হ্যাঁ, মেয়েমানুষ আর পুলিশের হাঁটা দেখেই রাইজেনফেল্ড সব বুঝতে পারে," মুখ টিপে হেসে কথাটা বলল জর্জ। কিন্তু নিজেও লিসাকে হাঁ করে দেখতে লাগল।

স্টেজে দ্বিতীয় খেলা শুরু হল। একটা কমবয়সী মেয়ে জিমনাস্টিক দেখাচ্ছিল। আমাদের নজর লিসায় ওপর।

"শ্যাম্পেন", বেশ গুরুগম্ভীর চালের মাথায় রাইজেনফেল্ড গর্জে উঠলো।

আমি আর জর্জ ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম, "এখানকার শ্যাম্পেন ভাল নয়, বুঝলে।"

অর্ডারটা আমি দিছি," হুঙ্কার দিয়ে উঠল রাইজেনফেল্ড।

জর্জ আমাকে চোখ টিপলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "ঠিক আছে, শ্যাম্পেন খাবে, তবে তুমি আমাদের অতিথি।"

"অসম্ভব। এটা আমার তরফ থেকে," রাইজেনফেল্ড আবার চেঁচাল।

ততক্ষণে বয়ফের বালতিতে ডোবানো সোনালী মুখের বোতল এসে গেছে। খুব সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাল রাইজেনফেল্ড। অন্য মহিলারাও ঘাড় না ঘুরিয়ে থাকতে পারেন নি। আমরাও হাসিমুখে মেতে গেছি।

একটু পরে উইলি এল। এখানে ও নিয়মিত খদ্দের। আমাদের পাশের টেবিলটা খালি হয়েছিল, উইলি সেখানে বসতে-না-বসতে রেণী ছ লা ত্যুর সঙ্গে কালো সান্ধ্যপোশাক-পরা একটা মেয়ে এসে হাজির।

একটু আগে এ জিমনাস্টিক দেখাচ্ছিল। উইলি ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল গার্দা স্লিভার। ভেবেছিলাম রাইজেনফেল্ড এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। কিন্তু না, ও এখনও লিসার ভক্ত।

"ওকে নাচতে ডাকব না কি?"

"না", জর্জ মানা করলো, কী কুক্ষণে অফিসঘরে বসে আমরা বলে ফেলেছিলাম লিসাকে চিনি না। এখন কিছু বোঝানোও যাবে না।

"তুমি নাচবে না?" গার্দা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

"ভাল জানি না। তালটা ঠিক রাখতে পারি না।"

"আমিও না, তবু চলো চেষ্টা করা যাক।"

নাচতে নাচতে হঠাৎ গার্দা বলল, "তোমরা তিনজন পুরুষ নাইটক্লাবে এসেছ, অথচ সঙ্গে বান্ধবী নেই, এটা কেমন হলো?

"কেমন আবার? আমার বন্ধু জর্জ মনে করে নাইটক্লাবে যারা বান্ধবী আনে তারা ভেড়া।"

"জর্জ কে? ঐ নাক লম্বাটা?

"না, টাকমাথা ওলাটা। ও হারেম পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, মেয়েদের নাকি বাইরে দেখিয়ে বেড়াবার জিনিস হতে দেওয়া উচিত না।"

"তা ঠিক। তোমার নিয়ম কি?"

"আমার কোনো নিয়ম নেই। হাওয়ায় ওড়া খড়কুটো।"

"আঃ, পা মাড়িয়ো না। তুমি একটুও খড়কুটো নও। অন্ততঃ পঞ্চাশ কেজি ওজন তোমার।"

আমি পা সারলাম। নাচতে নাচতে চলে এসেছি এরনার টেবিলের কাছে। এবার ও আমায় চিনতে পেরেছে, কিন্তু ফাটকাবাজটার কাঁধ থেকে মাথা সরাল না। আমি গার্দাকে কাছে টেনে নিলাম, কিন্তু চোখ এরনার দিকে।

একটু পরে হেসে গার্দা বলল, "ছাড়ো আমাকে। এভাবে কিছু লাভ হবে না তোমার ঐ লাল চুলওলা মেয়েটার ব্যাপারে। তুমি তো সেই চেষ্টাই চালাচ্ছ, তাই না?"

"না, আমি মিথ্যে কথা বললাম। কিন্তু বুঝলাম গার্দার কাছে ধরা

পড়ে গেছি। ফিরে এলাম টেবিলে, মাথা উঁচু থাকলেও সারা দেহ-মন লজ্জায় ডুবে গেছে···।

এদিকে মদের কাজ হয়েছে। জর্জ আর রাইজেনফেল্ড তুই-তোকারি করছে। যদিও জানি কাল সকালে দুজনেই সবকিছু ভুলে যাবে।

নাচতে নাচতে এরনা আমাদের টেবিলের কাছে এলো। ও যেন আমাকে খোঁচাতে চাইছে। আমার কান গরম হয়ে উঠল। এমন সময় রাইজেনফেল্ড বলল, "ওঠা যাক!" কারণটা বুঝতে অসুবিধে হল না, লিসা উঠে পড়েছো। গান-বাজনাও শেষ।

হঠাৎ দেখি টুপি-কোট নেবার জায়গায় আমি ঠিক এরনার পাশে দাঁড়িয়ে। নীরস গলায় এরনা বলল, "এভাবে যে আমার চোখে ধরা পড়বে ভাবতে পারো নি, না?"

"তুমি আমাকে ধরেছ?" আমি হাঁ হয়ে গেলাম, না, আমার কাছে তুমি ধরা পড়েছ?"

"আহা, সঙ্গিনীর ছিরি কি? শেষ পর্যন্ত নাচিয়ে মেয়ের পাল্লায় পড়লে। ছোঁবে না আমাকে। এর মধ্যে তুমি কি রোগ বাধিয়ে বসেছ তুমিই জানো।"

আমি ওকে ছোঁবার চেষ্টা করিনি। বললাম, "এখানে এসেছি ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করতে। —আর তুমি? তুমি কেন এসেছ এখানে?"

"ব্যবসা?" এরনার গলায় ছুরি, "এখানে ব্যবসা? তা কে মরলো?"

"দেশের মেরুদণ্ড, গরীব লোকেরা। এদের রোজ কবর দেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের সমাধিতে যে স্মৃতিমন্দির গড়ে তোলা হয়, তার নাম ফাটকা, বাজার।"

"আমি কি করে এই লোকারটার সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়েছিলাম," এরনা যেন আমার কথা শুনতে পায় নি এমনভাবে বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমার সব চুকেবুকে গেল হের বোদমার আজ থেকে।"

"আজ বিকেলে কে বলেছিল মাথাব্যথার জন্যে বের হতে পারব না," আমি ফোঁস করে উঠলাম, "আর এখন একটা ফাটকাবাজের সঙ্গে চলে বেড়াচ্ছে।"

এরনা দারুণ ক্ষেপেছে, "চুপ করো, কবি! ছোটলোক কোথাকার! মরা লোকের কবিতা নকল করলেই কবি হওয়া যায় না।"

"ওসব বাজে কথা ছাড়। আমি এখানে এসেছি দু'জন সৎ ব্যবসাদারের সঙ্গে, আর তুমি এসেছ কার সঙ্গে?"

"আরে, আমাকে তুমি ভেবেছ কি, ভাঁটিখানার বেশ্যা? রাস্তায় একা ফিরবো এত রাতে।"

"প্রথম তো তোমার এখানে আসাই উচিত হয় নি।"

"বাঃ বাঃ, শুরু হয়ে গেল হুকুম করা। এরপর কি বলবে, মোজা সেলাই করো। আমি এখানে বীয়ার খাচ্ছি, আর উনি শ্যাম্পেন চালাচ্ছেন।"

"শ্যাম্পেনের খরচ দিয়েছে রাইজেনফেল্ড।"

"আহা, কি অবোধ শিশু রে। শোনো, আমার পেছনে লাগবে না, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।"

ইতিমধ্যে এরনার সঙ্গী টুপি-কোট এনে ফেলেছে। সেই সঙ্গে জর্জও। "শুনলে, শুনলে ওর কথাটা।"

জর্জ ঘাড় নাড়ল, সে শুনেছে। মেয়েদের সঙ্গে কখনো তর্ক করতে নেই।...

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাইজেনফেল্ডের মেজাজ আরও ভাল হয়ে উঠেছে। "বাড়িতে গেলে ভাল কফি খাওয়াবে তো "নিশ্চয়ই রলফ্ খুব ভাল কফি করে", জর্জ বলল।

আমাদের বাড়ির গেট ঠেলে কে যেন ঢুকলো। ওঃ! সার্জেণ্ট মেজর নোপফ। আজ রাতেও আমাদের সেই কালো অবিলিস্কের গায়ে পেচ্ছাপ করছে।

"আঃ, সার্জেণ্ট মেজর, কি হচ্ছে এটা।" আমি ভীষণ বিরক্ত।

"কেন চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছ না কি করছি", নোপফের গলা জড়ানো।

শেষ পর্যন্ত এক বালতি জল এনে পাথরটা ধুয়ে দিলাম। ঘরে ঢুকেই রাইজেনফেল্ড তাকাল লিসার জানলার দিকে—"এখনো ফেরে নি দেখছি।"

…তবে ফিরবে নিশ্চয়ই, অপেক্ষা করা যাক।" "তা যাবে এখন, এদিকে ব্যবসার ব্যাপারটা সেরে রাখলে ভাল হতো না।" জর্জ এই ফাঁকে কথাটা পাড়লো।

"নিশ্চয়ই।"

আমাকে এখন কফি করতে হবে রান্নাঘরে গিয়ে, এবং যতক্ষণ না জর্জের ডাক পাই, ফিরতে পারবো না ঘরে।

ছুতোর মিস্ত্রী উইলকির ঘর থেকে হাইনরিখের নাকডাকার শব্দ এখনো আসছে। আহা, বেচারা।

জানলা দিয়ে দূরের আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে আলোর আভাস ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। তার মানে একটা অভিশপ্ত রবিবার শেষ হতে চলেছে।

॥ ৫ ॥

শোকের পোশাক পরা একটি মহিলা গেট খুলে আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়াল। কবরের জন্যে পাথর কিনতে এসেছে। আমি এগিয়ে গেলাম। "একটু ঘুরে দেখবেন নাকি?"

"না না, তার কোনো দরকার নেই", মহিলাটি তটস্থ হয়ে উঠেছেন।

"দেখুন না ঘুরেফিরে, কিনতেই যে হবে, তেমন কোনো কথা নেই। আমি না হয় চলে যাচ্ছি।"

"না, না, এই যে…আমি শুধু চাইছিলাম · আমার স্বামীর জন্যে…।"

কবরের মাথার দিকে যে পাথরের ফলক লাগান হয়, সেগুলো দেখিয়ে বললাম, "আজকাল এগুলো খুব চলছে।"

"হ্যাঁ…হ্যাঁ…ঠিক ঐ ধরনেরই…তবে জানি না অনুমতি পাবো কিনা…।"

"কি বললেন? কবরে কি দেবেন তার জন্যে আবার অনুমতি কীসের?"

"সমাধিটা যে গির্জার কবরখানায় নেই।"

আমাকে আশ্চর্য হতে দেখে মহিলা বলে উঠলেন, "যাজক রাজী নন আমার স্বামীকে গির্জার কবরখানায় রাখতে।"

"কিন্তু কেন?"

"উনি···উনি আত্ম···মানে", মহিলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন, "আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছেন বলে।"

কথাটা বলে ফেলেই মহিলা যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন, এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বড় বড় চোখ করে।

"এইজন্যে গির্জার কবরখানায় কবর দেওয়া চলবে না?"

"হ্যাঁ, ক্যাথলিক কবরখানার পবিত্র জমিতে এই ধরনের মানুষদের কবর দেওয়া নাকি চলে না?"

"যতো সব বাজে কথা", আমার রাগ হয়ে গেছে, "যাজকরা ওরকম উল্টোপাল্টা কথা অনেক বলেন। তা কোথায় কবর দিয়েছেন?"

"গির্জার কবরখানার পাঁচিলের বাইরে। সরকারী কবরখানায় অনেক আজে-বাজে লোকেদের কবর দেয়। আমার স্বামী খুব ধার্মিক ছিলেন।"

"তা কেন উনি একাজ করলেন?"

"টাকাপয়সার জন্যে। ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে জমা ছিল। পাঁচ বছরের জন্যে, এতে সুদ বেশি পাওয়া যায়। টাকাটা ছিল আমার প্রথম পক্ষের মেয়ের বিয়ের যৌতুক বাবদ। আমার স্বামী ছিলেন মেয়েটির অভিভাবক। দু' সপ্তাহে আগে টাকাটা তোলা হয়। আমার মেয়ের বাগ্‌দত্ত স্বামী টাকার পরিমাণটা জানতে পেরে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার মেয়ে একটা কথা না বলে শুধু কেঁদেছিল। আমার স্বামী সেটা সহ্য করতে পারেন নি। ওঁর ধারণা হয়েছিল উনিও যদি কিছু জমাতেন, তাহলে এরকম ঘটনা ঘটতো না।"

"তাহলে তো আপনার স্বামী কিছুই অন্যায় করেন নি।"

"সে-কথা কি লোকে বিশ্বাস করবে?"

"লোকের কথা ছাড়ুন, ওরা চিরকালই পরের খুঁত ধরে। এই দেখুন না, গত সপ্তাহে সাত জন মারা গেছে। তার মধ্যে কয়েকজন যে

সত্যিকারের বদলোক ছিল না, তা নয়।"

মহিলা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন, তাহলে বলছেন যে পবিত্র জমিতে কবর না হলেও সমাধি তৈরী করা যাবে?"

"নিশ্চয়ই! সরকারী পারমিট থাকলেই।...অতএব এখন পছন্দ করে যান, পরে কিনবেন।"

মহিলা একটু ইতস্ততঃ করে মাঝারির থেকে একটু ছোট একটা পাথর দেখিয়ে বললেন, "ওটার দাম কত?"

সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গরীবরা কখনো সবচেয়ে ছোটটার দাম প্রথমে জানতে চায় না; সম্মানে লাগে বোধ হয়। যদিও শেষে ঐ ধরনেরই ছোট জিনিস কেনে।

"এক লাখ মার্ক।"

"না, অতো টাকা আমার নেই... ।"

"তাহলে ওই বেলেপাথরেরটা নিন, চল্লিশ হাজার পড়বে। আসলে তো আপনি আপনার নামধামটা অমর করে রাখতে চান? এতেই হবে।"

"হ্যাঁ, এটা পছন্দ...কিন্তু... ।"

"কিন্তুর কিছু নেই। সোনালী বর্ডার করিয়ে দেব, নামও লিখিয়ে দেব। বাড়তি খরচ লাগবে না। আপনার জন্যে এটুকু আর করতে পারবো না।" মহিলাটি কেঁদে ফেললেন, স্বামী মারা যাবার পর থেকে কেউ নাকি তাঁর সঙ্গে একটুও ভাল ব্যবহার করে নি আমি ছাড়া।

সযত্নে পাট-করা দু' বাণ্ডিল নোট বের করলেন মহিলা। "গুণে নিন।"

"দরকার নেই। সব ঠিক আছে।" কারণ আমি জানি এখানে আসার আগে হাজার বার ধরে গুণেছেন নোটগুলো, হয়তো পরের মাসের ভাড়াটা পর্যন্ত বাড়ীতে নেই। শেষসম্বল মানুষ খুব যত্ন করেই রাখে।

"কবরের পাশে সিমেন্ট দিয়ে ঘিরেও দেবো। দেখতে যাতে বেশ ছিমছাম লাগে।"

"বিনা পয়সায়?" মহিলা ঝরঝর কেঁদে ফেললেন।

মহিলা চলে যাবার পর একটু জিন ঢাললাম। হঠাৎ ভীষণ উদার হয়ে গেছি যেন। জর্জ রাইজেনফেল্ডকে নিয়ে ব্যাংকে গেছে, আমাদের সবকিছু

নির্ভর করছে তার ওপর।

"মাত্র ছ সপ্তাহ", আমি খুব হতাশ হয়ে গেলাম।

জর্জ হেসে ফেললো, "শোনো, ছ সপ্তাহ শুনে নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। ব্যাংক ওর বেশি সময় দিতে চাইল না। তখন ডলারের দাম কি থাকবে কে জানে। রাইজেনফেল্ড একমাস পরে আবার আসবে। তখন আমার নতুন চুক্তি হবে।"

"সত্যি সত্যি আসবে তো?"

"অন্ততঃ লিসার টানে আসবে নিশ্চয়ই।"

"ভাগ্য ভাল যে ও লিসাকে দিনের বেলায় দেখে নি", আমি বললাম।

"তা ঠিক, তবে তেমন কিছু হেরফের হতো না। সব মেয়েকেই দিনের আলোতে অন্য রকম লাগে।"

আমার খটকা লাগল। তাহলে কি লিসার ওপর জর্জেরও নজর পড়েছে? নাহ, অত নীচে নামবে না জর্জ। কারণ আমাদের মধ্যে ওই-ই একমাত্র উঁচু সমাজের পরিচয় রাখে। বার্লিনের খবরের কাগজ পড়ে। শিল্প-সংস্কৃতির বিষয় খুঁটিয়ে দেখে। কোন্ সিনেমা-অভিনেত্রী কবে বিয়ে করল, কবে ডিভোর্স করল,—সব ওর নখদর্পণে, ওর এক বন্ধু লণ্ডন থেকে মাঝে মাঝে পত্রিকা পাঠায়। যদিও সে নিজে একবার মাত্র ফ্রান্স ছাড়া বিদেশে কখনো যায় নি, তাও যুদ্ধে। বার্লিন দেখেনি এখনও। তবুও ওর রুচি আমাদের চেয়ে মার্জিত।

"কাজের কথায় এসো তো, "আমি জর্জকে বললাম", চারদিকে পালিশ-করা পাথরের ক্রুশ-চিহ্ন পাঠাচ্ছে কি রাইজেনফেল্ড?"

"হ্যাঁ। দু'টো। ধন্যবাদটা কিন্তু লিসার পাওনা।"

আমি হাসলাম। হঠাৎ জর্জ বলল, "আজ সকালেই মদ খেয়েছ কেন? গন্ধ বের হচ্ছে যে! এরনার জন্যে নিশ্চয়ই নয়?"

"না। মৃত্যুর কথা চিন্তা করে। সবাইকে তো মরতে হবে একদিন।"

"তা ঠিক। এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে মৃত্যু-চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ওসব ছাড় এখন···ক্ষিদে পায়নি?"

আমি জর্জের কথার উত্তর দিলাম না। সকালের সেই ভীরু পায়রার মতো মহিলাটির মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

সন্ধ্যের একটু আগে আমি খবরের কাগজে মৃত্যু-সংবাদগুলো মন দিয়ে পড়ছিলাম, প্রয়োজনমতে অংশগুলো কেটে সযত্নে তুলে রাখা আমার কাজ। এই কাজটা আমার বেশ ভাল লাগে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। এখানে সবাই প্রথমশ্রেণীর বাবা, নিখুঁত স্বামী, আদর্শ সন্তান, নিঃস্বার্থ-নিবেদিত-প্রাণ মা, দাদামশায়, দিদিমা; এখানে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সৎ, সেনাপতিরা অত্যন্ত কোমলহৃদয়, অভিযোক্তা উকিলও যেন পরদুঃখ-কাতর। এখানে সবাই প্রয়াত আত্মাকে প্রায় স্বর্গীয় পর্যায়ে তুলে ধরে। সবাই যেন হৃদয় থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

পাঁউরুটিওলা নাইবুরের মৃত্যুর খবরটা আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করলো। ওতে নাইবুরকে সহৃদয়, বিবেকবান, ভালবাসায় ভরা স্বামী ও বাবা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আমি নিজের চোখে দেখেছি নাইবুর তার বৌকে তাড়া করেছে চামড়ার বেল্ট হাতে নিয়ে। ছেলে রোল্যাণ্ডের হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল মেরে। অথচ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে কত মহৎ হয়ে উঠেছে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে। মৃত্যুকে ঘিরে মানুষ কত মিথ্যা-ভাষণ করে ভাবা যায় না। বেঁচে থাকতে থাকে হনুমান বলা হয়, মরে গেলে তাকেই দেওয়া হয় ভগবানের মর্যাদা। মানুষ যে এখনও সৎ, সুন্দর এবং মহতের পূজারী,—একথা ভীষণভাবে উপলব্ধি করা যায় এই মৃত্যুসংবাদগুলো পড়লে। আমি মানুষজাতি সম্বন্ধে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠি।

আরও সাতটা মৃত্যু-সংবাদ কেটে নিয়েছি। নাইবুরেরটা রেখে দিলাম হাইনরিখের ফাইলে। এটার ব্যবস্থা ও করবে।

আজকের মতো কাজ শেষ। জর্জ নিজের ডেরায় চলে গেছে। জানলাটা খুললাম, লিসার ঘরে গ্রামোফোন বাজছে। লিসা লাল গোলাপের একটা বড় তোড়া আমাকে দেখালো একটা চুমোও ছুঁড়ে দিল। এটা নিশ্চয়ই জর্জের কাজ! আমি ওর ঘরটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। লিসা জানলা দিয়ে গলা বের করে চেঁচিয়ে বলল,

"ফুলগুলোর জন্যে ধন্যবাদ। তোমরা শকুন হতে পারো, আবার প্রেমিক-পুরুষও বটে।"

ও একটা চিঠি বের করে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাল: "শ্রদ্ধেয়া, আপনার রূপমুগ্ধ এই গোলাপগুলি আপনার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিচ্ছে" ফ্যাকফ্যাক করে হাসল লিসা: '৫নং হ্যাকেন স্ট্রীটের সার্সিকে'—আচ্ছা সার্সি কি?"

"সার্সি হল এক ধরনের মোহিনী, যারা পুরুষকে ভেড়া করে দেয়।"

গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল লিসা। এটা কিন্তু জর্জের কাজ নয়, জিজ্ঞেস করলাম, "কে লিখেছে ওটা?"

"আলেক্স রাইজেনফেল্ড।...যে বেঁটে ষাঁড়টি কাল তোমাদের সঙ্গে নাইটক্লাবে ছিল?"

"ও কিন্তু ষাঁড় নয়, সাধারণ মানুষও নয়, ও একজন কোটিপতি।"

লিসার মুখের ভাব পাল্টে গেল। কি ভাবল যেন। তারপর হেসে চলে গেল। আমিও অকারণে এরনার কথা ভাবতে ভাবতে কুর্টবাকের স্টুডিয়োর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

ও ঘরের সামনে সিঁড়িতে বসে গীটার বাজাচ্ছিল। পেছনে সত্যসমাপ্ত সেই সিংহমূর্তিটা। একটা পার্টির অর্ডার আছে।

"আচ্ছা কুর্ট, কেউ যদি তোমার একটা ইচ্ছা এখুনি পূরণ করে দেয়, তবে তুমি কি চাইবে?"

"এক হাজার ডলার," এক লহমাও সময় না নিয়ে কুর্ট বললো।

"ফুঃ,...আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা ভাবজগতের লোক।"

"আমি তো তাই। আর সেইজন্যেই তো হাজার ডলার চাই। একটা বড় ফ্ল্যাট বাড়ি কিনে সেগুলো ভাড়া দিয়ে দেব। তারপর আরাম করে ভাড়ার টাকায় পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে বসে খাবো, আর গানবাজনা করবো।"

আমি আর থাকতে পারলাম না, "আমি ভাবতে পারি নি কুর্ট, তুমি এমন একটা স্থূলপ্রকৃতির লোক। ভাড়ার টাকায় খাবে?"

"হ্যাঁ, এই সিংহ আর ঈগলের মূর্তি গড়তে আমার আর ভাল লাগে না।"

"তবে কি ভাল লাগে তোমার? জীবনের অর্থই বা কি?"

"আহার, নিদ্রা আর মৈথুন," সাফসাফ জবাব দিল কুর্ট।

নাহ্, ছলনাময়ী নারীর চিন্তা ভুলতে হলে এরকম সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা যায় না। আমি ফিরলাম।

গেটের কাছে লিসা, হাতে সেই গোলাপ ফুলেরতোড়া। "নাও, এগুলো, এসবে আমার দরকার নেই।"

"সেকি? তুমি প্রকৃতির দান ভালবাস না?"

"না! আমাকে ফুল দিলে কাজ হবে না।"

"কি দিলে হবে?" আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না।

"গয়না," লিসার উত্তর, "তুমি কি ভেবেছিলে?"

"জামাকাপড়ে হয় না।"

"হয়, ঘনিষ্ঠতা বাড়লে পরে।···তোমার কি মেজাজ খারাপ আছে আজ? একটু চাঙ্গা করে দেব নাকি?" লিসার ঠোঁটে হাসি।

"ধন্যবাদ! আমি বেশ চাঙ্গাই আছি। চাইলে তুমি নাইটক্লাবে চলে যেতে পারো।"

"আমি কিন্তু নাইটক্লাবের কথা বলছি না। আচ্ছা, তুমি কি ঐ পাগলাদের ওখানে এখনো অর্গান বাজাও?"

"হ্যাঁ", আমি আশ্চর্য হলাম, "তা—তুমি কী করে জানলে?"

"কথা তো বাতাসে ভাসে। জানো, তোমার সঙ্গে ওখানে একদিন যেতে ইচ্ছে করছে, নিয়ে যাবে?"

"নিয়ে যেতে হবে না, তুমি নিজেই চলে যাবে সেখানে।"

ঠাট্টাটা ফিরিয়ে দিল লিসা, "তা আমাদের মধ্যে কে ওখানে আগে যাবে বলা মুশকিল।···এই নাও, ঘাস-পাতাগুলো ফেরত নাও। আমার কত্তার ভীষণ ঈর্ষা।"

"কী বললে?"

"খুরের ফলার মতো ঈর্ষা। আর হবেই বা না কে?"

ঈর্ষা কী করে খুরের ফলার মতো হয়, তা আমার জানা নেই; তবে উপমাটা ভাল লাগলো। "তা তোমার কত্তার যদি এতোই ঈর্ষা,—তো রাতে তুমি নাইটক্লাবে যাও কী করে। আর এইসব গয়না-পোশাক?"

"আরে, সব স্বামীরাই বোকা, নকল গয়না বলে চালিয়ে দিই।"

আর কথা না বাড়িয়ে ফুলের তোড়াটা হাতে গছিয়ে দিয়ে লিসা চলে গেল।

নিজের ঘরে ফিরলাম, সূর্যাস্তের আলোয় ঘরটা ভরে আছে। রাইজেন-ফেল্ড দামী জিনিসই পাঠিয়েছিল। কমসে-কম পঞ্চাশ হাজার মার্ক।

কাল রাতে এরনার সঙ্গে ফট্ করে ওরকম ব্যবহার না করাই উচিত ছিল। ওরও তো ঈর্ষা হতে পারে! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। চট্ করে কয়েক লাইন লিখে নিলাম। তারপর ফ্রিৎস ক্রলকে ডাকলাম, আমাদের মালিকের বংশধর। বয়স বারো।

" কী হে, দু হাজার মার্ক রোজগার করবে?"

"বলুন না কী করতে হবে? ওঃ সেই ঠিকানায় তো?"

"হ্যাঁ।"

গোলাপ আর চিঠিটা নিয়ে ফ্রিৎস চলে গেল। কুর্ট, লিসা, ফ্রিৎস এরা কত সহজে পৃথিবীর সবকিছু বুঝে ফেলে, অথচ আমি পারি না কেন? নাঃ, ফ্রিৎসকে না পাঠানোই ভাল। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে।

...বেড়িয়ে যখন ফিরলাম তখন আকাশে অনেক তারা। টেবিলের ওপর ফুলের তোড়াটা, আমার পাঠানো চিঠি, খামটা খোলা হয় নি, আর ফ্রিৎসের চিরকুট "মহিলাটি বলেছেন গলায় দড়ি দিতে—ইতি ফ্রিৎস।"

রাগে, অপমানে, লজ্জায় অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলাম। কিন্তু এভাবে নতিস্বীকারের কোনো মানে হয় না। আর একটা চিরকুট লিখে আমি চলে গেলাম রেডমিল নাইটক্লাবে। দারোয়ানকে বললাম, এটা পাঠিয়ে দাও ফ্রাউলিন গার্দা স্নিডারকে।

অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে দারোয়ান বলল এটা চাকরদের কাজ। বেশ তাই হবে। ফুলটা গার্দার কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এরনা আসুক, ওকে নিজের চোখে একবার দেখুক।

এলোমেলোভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ির ফিরলাম।

॥ ৬ ॥

গাছপালার মাথার ওপরে লাল চাঁদ। বেশ গরম লাগছে। কাঁচ-মানুষ ধীরে ধীরে চলে গেল। রাতে ওর বিপদ কম। তবুও মাথাটা ঢেকে নিয়েছে। যদি ঝড়বৃষ্টি হয়, বাজ পড়ে। আমি আর ইসাবেল বাগানের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে।

"রুডলফ, আবার তুমি আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। কোথায় ছিলে?"

রুডলফ! যাক্ আজকে আর আমায় রলফ্ বলে নি। বললে এমন সন্ধ্যেটাই নষ্ট হয়ে যেত।

"আমি তো তোমায় ছেড়ে যাই নি। অন্য কাজে গিয়েছিলাম, তোমাকে ছাড়ি নি তো।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"একটু বাইরে গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"তা জানি না ইসাবেল। তবে মানুষ অনেক কাজ করে কারণ না জেনেই···।"

"কাল রাতে তোমাকে অনেক খুঁজেছিলাম। একটা অদ্ভুত চাঁদ ছিল আকাশে। আজকের মতো লাল, চঞ্চল চাঁদ না। এমন ভারী শান্ত, ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ চাঁদ যে, তুমি তাকে এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে পারো।"

"থাকলে অবশ্য ভালই হতো। কিন্তু ইসাবেল, চাঁদকে কি করে খাবে?"

"জলের সঙ্গে। খুব সহজ। ও পাল পাথরের মতো লাগে। খাবার সময় টের পাবে না, পরে বুঝবে। তবে আলো জ্বালা চলবে না। আলো জ্বাললেই সব মিলিয়ে যায়।"

"কিন্তু জলের সঙ্গে খাবে কি করে?"

হাতটা বাড়িয়ে দেখালো ইসাবেল, "জানলা দিয়ে গ্লাসটা বাইরে ধরবে। তখন চাঁদ ওর মধ্যে? তুমি দেখতে পাবে, গ্লাসটা আলোয় ভরে গেছে।

"তার মানে চাঁদের ছায়াকে বলছ তুমি ?"

"না, ছায়া নয়। ভেতরেই থাকে।···ছায়া···ছায়া বলতে তুমি কি বোঝো ?"

"এই যেমন আয়নায় নিজেকে প্রতিফলিত দেখি। সব মসৃণ জিনিসের ওপর ছায়া পড়ে। জলেও।"

"তাই নাকি ?" হঠাৎ জুতোটা খুলে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ইসাবেল বলল, "হয়তো তাই।"

"হয়তো না, আমার কথাটাই ঠিক। কিন্তু তুমি যা দেখো, সেটা তুমি না, তোমার ছায়া।

"আমি না। কিন্তু ছায়া যখন পড়ে তখন আমি কোথায় থাকি ?"

"আয়নার সামনেই। তা না হলে নিজেকে দেখবে কী করে ?"

"তোমার সাথে আমি একমত নই, রুডলফ। এই অবস্থায় আয়নারা কি করে ?"

"কাছে যা থাকে, তাদের প্রতিফলিত করে।"

আর যদি কিচ্ছ না থাকে ?"

"তা হয় না। কিছু-না-কিছু থাকবেই।"

"কিন্তু রাতে ? যখন চাঁদ থাকে না, শুধু অন্ধকার থাকে, তখন আয়নায় কিসের ছায়া পড়ে শুনি ?"

"অন্ধকারের," মুখে বললেও নিজের উত্তরটা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রইল। প্রতিফলনের জন্যে তো আলো দরকার!

"তাহলে পুরো অন্ধকার থাকলে আয়নারা মরে যায় ?"

"ঠিক তা না, হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে। আলো এলে আবার জাগে।"

"কিন্তু যখন স্বপ্ন দেখে ? ওরা কীসের স্বপ্ন দেখে বলো তো ?"

"কারা ?" আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"আয়নারা।"

"আমার তো মনে হয় ওরা সব সময়েই স্বপ্ন দেখে। আমাদের স্বপ্ন দেখে। আমাদের ডান দিক হল ওদের বাঁ দিক, ওদের বাঁ আমাদের ডান।"

ইসাবেল পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো আমার মুখের দিকে, "তাহলে ওরা

আমাদেট উল্টোদিক ?"

আমি চুপ করে রইলাম। হেসে ইসাবেল বললো," দেখলে, একটু আগে তুমি বলছিলে ওদের মধ্যে কিছু থাকে না, এখন বলছ আমাদের উল্টোদিকে থাকে।"

"তা ঠিক। তবে যতক্ষণ সামনে থাকি। সরে গেলে পরে থাকে না।"

"তা তুমি জানলে কি করে ?" ইসাবেল যেন জেরা করছে।

"নিজেই দেখতে পাবে। ঘরে যাবার পর পিছন ফিরে দেখো, তোমার ছায়াটা আয়নায় আর নেই।"

"কিন্তু যদি বলি ওরা ছায়াটাকে লুকিয়ে নেয় ?"

"কি করে লুকোবে ? সবকিছুকে প্রতিফলিত করাই তো আয়নার কাজ। তাই তো ওদের 'আয়না' বলা হয়। আয়না কিছু লুকোতে পারে না।"

ইসাবেলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠলো।

"তাহলে ওটার কি হয় ?"

"কোন্‌টার ?"

"ছায়ার ? আমাদের উল্টোদিকটার ? ওটা কি আবার লাফিয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসে ?

"তা আমি জানি না।"

"তাই বলে হারিয়ে যেতে তো পারে না ওটা।"

"না, হারায় না।"

"তা হলে কি হয় ওটার", ইসাবেল আরো জোর দিয়ে বললো, "ওটা কি আয়নায় থাকে ?"

"না। আয়নায় কিছুই থাকে না।"

"তুমি এত জোর দিয়ে বলছ কেন ? তুমি চলে যাবার পর তো আর দেখতে আসো না।"

অন্য লোক যারা আসে, তারাও ওটা দেখতে পায় না। তারা তখন আয়নায় নিজের ছায়াটাই দেখে।"

"যদি বলি ওরা নিজের ছায়া দিয়ে আগেকার ছায়াকে ঢেকে ফেলে। আমার ছায়াটা যাবে কোথায় ? ওখানে থাকতে বাধ্য।"

"তাতো নিশ্চয়ই", আমার গলায় অপরাধীর সুর, "তুমি যখন আবার আসবে আয়নার সামনে, তখন নিজের ছায়াটা দেখতে পাবে।"

ইসাবেল খুব উত্তেজিত হয়ে বললো, "সেই কথাটাই তো আমি বলতে চাইছি তখন থেকে। তবে কেন তুমি বললে ছায়াটা ছিল না ওখানে।"

ইসাবেল শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরেছে। এই মুহূর্তে ওকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব শোনানো মূর্খতা। তাছাড়া আয়না সম্বন্ধে আমার নিজের মনেও নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

হঠাৎ আমার গায়ে ভর দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো ইসাবেল, "ওটা কোথায়? বলো আমাকে, আমার একটা অংশ কি সর্বত্র রয়ে গেছে? যতোগুলো আয়নায় আমি নিজেকে দেখেছি! তাহলে কি আমি ঐ অসংখ্য আয়না গুলোতে ছড়িয়ে আছি! ওরা কি প্রত্যেকে আমার একটা করে অংশ নিয়ে নিয়েছে? ছুতোররা যেমন করে কাঠের গা চেঁছে ফেলে, আয়না-গুলোও কি তেমনি আমার শরীর থেকে একটা করে পাতলা অংশ কেটে নিয়েছে! তাহলে আমার আর কি রইল?"

"তোমার সবটাই এখানে আছে। আয়না কিছুই কেড়ে নেয় না, বরং ফিরিয়ে দেয়। আমাদেরই একটা আলোকিত অংশকে প্রতিফলিত করে আবার আমাদেরই দেখা দেয়।"

"আমারই অংশ?" ইসাবেল যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না, "কিন্তু ধরো তা যদি না হয়? ধরো আমি হাজার হাজার আয়নার তলায় চাপা পড়ে আছি? সম্পূর্ণ হরিয়ে গেছি আমি। প্রথম যেবার আমি আয়নায় নিজের মুখ দেখেছিলাম, আমার সেই মুখটা কি আজও আছে? ওরা কি আমাকে টুকরোটুকরো করে চুরি করে নেয় নি?"

"না। কেউ তোমায় চুরি করে নি। আয়না চুরি করে না, শুধু প্রতিফলিত করে।"

চাঁদের লাল আলো এসে পড়েছে ইসাবেলের মুখে, ওর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, "কী যে হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবকিছুই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আমায় শক্ত করে চেপে ধরো থাকো রুডলফ, ছেড়ে দিও না। ঐ দেখ আয়নায় ছায়াগুলো

কালো কালো পাহাড়ের মতো আমার দিকে ছুটে আসছে। ওরা যেন আমায় ছুঁতে না পারে।"

এই নিস্তব্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এখুনি, আমি তাই বললাম, "চলো ইসাবেল, ওধারে যাই, ওখানে অনেক আলো।"

কথা না বলে ও আমার কাঁধে মাথা রাখল। আমি ওর নাক-মুখ-চোখের স্পর্শে পেতে লাগলাম। গভীর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল আমার মন, এই মাথাটার মধ্যে কী আছে কে জানে? তবে যাই থাকুক না কেন, আমাদের এই পরিচিত জগৎ থেকে সেটা ভিন্নতর। সেখানকার অনন্ত রহস্য কোনোদিনই জানতে পারব না আমরা।

"চলো ইসাবেল। কেউ জানে না কোত্থেকে সে এসেছে, পাবেই বা কোথায়—শুধু এই টুকু জানি যে আমরা একসঙ্গে আছি, এক হয়ে আছি।"

প্রায় জোর করে ওকে টেনে তুললাম। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি; অথচ জানি আমরা দুজনেই ভিন্নতর এক গ্রহের মানুষ শত চেষ্টাতেও এক হতে পারছি না।

"তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো?" খুব নরম সুরে বললো ইসাবেল।"

"না, কখনো না।"

"দিব্যি গালো।"

"গালছি।"

"ঠিক আছে রুডলফ", ইসাবেলের অনেক সমস্যা যেন মিটে গেছে এমন ভাব, "কিন্তু ভুলে যেও না। তুমি বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাও।"

"ভুলব না।"

"চুমো খাও।"

আমি ওকে কাছে টেনে নিলাম। ঠিক কি বা করি বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত শুকনো ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকালাম। হঠাৎ আমার ঠোঁটে ও কামড়ে ধরলো। রক্ত বেরিয়ে গেল। ইসাবেল হাসছে, ওর মুখের ভাব পাল্টে গেছে, "রক্ত!···তুমি আবার আমায় ঠকাতে। তাই এবার রক্তের সীলমোহর দিয়ে দিলাম, আর কোথাও চলে যেতে পারবে না।"

গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমি কোথাও যেতে চাই-ও না।···কিন্তু একি

করলে? মাদার সুপিরিয়ারকে কী বলবো আমি?"

"কিছু বলবে না। সবাইকে কি সব কথার জবাব দিতে হয়।"

এর উত্তর হয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ইসাবেল জেনী হয়ে গেছে, চেহারায় ফুটে উঠেছে এক ধরনের ধূর্ত হাসি। কে যেন ডাকতে এল ভজনের সময় হয়েছে।

ভজন শেষ হল। হাজার মার্ক পেয়ে গেছি। এবার খাবার ঘরে এসে বসলাম। বিশপের প্রতিনিধি বোদেনদিয়েক আগেই এসে বসে আছেন। এখন তাঁর গায়ে যাজকের জাব্বা-জোব্বা নেই। সাধারণ জামা পরে আছেন। একটু আলো ধূপধুনোর ধোঁয়ায় আর মোমের আলোতে তাঁকে বেশ স্বর্গীয়-স্বর্গীয় লাগছিল, এখন একেবারে সাদামাথা মানুষ। অথচ এঁরই কাছে আগে কতবার গেছি অপরাধের স্বীকারোক্তি করার জন্যে।

এটা ঠিক খাবারঘর নয়, অতিথিদের খাবার দেওয়া হয় এখানে। মাদার সুপিরিয়ার এক বোতল মদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, খাবার এল বলে। দশবছর আগে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না বিশপের প্রতিনিধির পাশে বসে মদ খাব।

বোদেনদিয়েক একটু মদ চেখে দেখলেন, "হাঁ...প্রিন্স হাইনারিখ ফন প্রুসেনের এলাকায় স্কেলিস রেইন-হার্টসার্ডসনে...মাদার সুপিরিয়ার ভাল জিনিসই পাঠিয়েছেন। তা মদ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান-গম্যি কেমন?"

"যৎসামান্য।"

"এসব শেখা উচিত। খাদ্য এবং পানীয় প্রভুর দান। এদের বুঝতে হবে, উপভোগ করতে হবে।"

অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, "মৃত্যুও তো ঈশ্বরের কান, সেটাও কি উপভোগ করতে হয়।"

"খ্রীষ্টানের কাছে মৃত্যু কোনো সমস্যাই নয়। তবে উপভোগ করার প্রয়োজন নেই। খুব সহজেই মৃত্যুর রহস্যটা বোঝা যায়। মৃত্যু হল অনন্ত জীবনে প্রবেশের দরজা। এতে ভয় খাবার কিছু নেই। অনেকের কাছে এটা একটা যুক্তি...।"

"কেন? কী ভাবে?"

"অসুস্থতা, ব্যথা, নিঃসঙ্গতা, দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া।"

"মুক্তি?" আমি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললাম, "কী দরকার ছিল এই দুঃখশোকের জগৎটা তৈরি করার?"

বোদেনদিয়েক আরও একটু মদ ঢেলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি আবার বললাম, "ঈশ্বর কেন সরাসরি আমাদের শাশ্বত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন না?"

"বাইবেলে সব আছে মানুষ, স্বর্গ, পতন···।"

"দেখুন ওসব কথা আমার সব শোনা আছে। কবে কতো হাজার আগে আমাদের পূর্বপুরুষ পাপ করেছিলেন তার শাস্তির বোঝা আজও আমাদের বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু কেন?"

গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে বোদেনদিয়েক বললেন—"ঈশ্বর ক্ষমার প্রতিমূর্তি। মানুষের ঘৃণা আর ক্রোধকে মুছে দেবার জন্যেই তো ক্ষমা আর ভালবাসার জন্যে একজনকে পাঠিয়েছিলেন। এ জীবনে যতো কষ্ট ভোগ করে নেবে পরের জীবনে ততোটাই সুখ।"

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলাম এ কথা শুনে, থাকতে না পেরে বললাম, "আমি এক মহিলাকে জানতাম তিনি দশ বছর ক্যান্সারে ভুগেছিলেন। ছ'বার মারাত্মক ধরনের অপারেশন হয় তাঁর শরীরে, তাতেও তিনি মরেন নি। অথচ ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পান নি একদিনের জন্যেও। এক সময়ে তাঁর দুই ছেলে মারা গেল। মহিলা গির্জায় যাওয়া, উপাসনা করা, সবকিছু ছেড়ে দিলেন। গির্জাকে অমান্য করে চরম পাপের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় তিনি একদিন মারা গেলেন। শাস্ত্র অনুসারে অনন্ত নরকে দগ্ধ হচ্ছেন তিনি। ঈশ্বর কি এঁকে ভালবেসে সৃষ্টি করেছিলেন। আর এটাই কি ন্যায়বিচার?"

গ্লাসের মদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোদেনদিয়েক বললেন, "মহিলাটি কি তোমার মা?"

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

"উনি তোমার মা, তাই না?"

গলায় কী যেন আটকে গেল আমার, "ধরুন, তাই যদি হয়···"

"মৃত্যুর মুহূর্তেও যদি কেউ ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তবে মুক্তি হয়ে যায়···। পরমপিতার বিচার বড় সূক্ষ্ম।"

"তিনি সত্যিই বিচার করেন?"

"করেন। তার নাম ভালবাসা।"

"ভালবাসা," আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, "অপরকে দুঃখ দিয়ে ভালবাসা? জানি না এটা কি ধরনের ভালবাসা?"

বোদেনদিয়েক হাসলেন, "তোমার আগেও কিন্তু অনেকে এমন কথা ভেবেছেন, বলেছেন।"

"তা ঠিক। এবং তাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।"

"তুমিও করছো। ভালই, সন্দেহই বিশ্বাসের মূল।"

আমি বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। কথা বের হল না মুখ দিয়ে। সবকিছুর উত্তর যেন বোদেনদিয়েকের মুখে জোগানো আছে।

এবার খাবার এসে গেল। বোদেনদিয়েকের মুখচোখ খুশিতে চক্‌চক্ করছিল: "বেশ ভাল ভাল খাবার দেখছি···বাঃ।"

আর কোন কথাবার্তা না বলে উনি নিজের প্লেটে খাবার নিয়ে খেতে শুরু করে দিলেন। অগত্যা আমিও। এমন সময় ডাক্তার এলেন। উনি এখানেই থাকেন।

"খাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে? তাহলে বসে পড়ুন। দেরী করলে সব ফুরিয়ে যাবে।"

"সময় নেই। ঝড় এল বলে। এই সময় রোগীরা ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।"

"ঝড়ের তো কোন লক্ষণই নেই।"

"নেই। তবে আসবে। রোগীরা এটা আগে থাকতে বুঝতে পারে।"

"ঠিক আছে, একটু মদ অন্ততঃ খেয়ে যাও। এই বিধর্মীটার নাম করে", বোদেনদিয়েক কথাটা বলে আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপলেন, যেন বেশ মজা হচ্ছে।

ডাক্তারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। রঙটা গাঢ়। চোখগুলো গর্তে বসা।

মুখটা লম্বা, কান দুটো বেশ বড়। নাম গুইদো ওয়েরনিক।

"ফ্রাউলিন তারহোভেন কেমন আছেন?"

"তারহোভেন? মানে জেনোভিয়েভ···খুব একটা ভাল না। আজ কেমন দেখলেন ওকে? কোনো পরিবর্তন?"

"নাহ্, ···আগের মতনই তো। একটু উত্তেজিত দেখলাম।"

আগ বাড়িয়ে বোদেনদিয়েক বললেন, "এখানে কে যে কখন কেমন থাকে কিচ্ছু বলা যায় না।"

ডাক্তার তখন বোদেনদিয়েকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। হঠাৎ আমার মনে হল কিছুই ভাল লাগছে না, এমন কি খেতে পর্যন্ত না।···জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাইরে আকাশ থমথমে। ছায়া-ছায়া মেঘ ভাসছে। ইসাবেলের কথাটা মনে পড়ে গেল "আমার সেই প্রথম মুখটা কোথায়?"··· সত্যিই তো আমাদের প্রথম সবকিছু কবে যেন হারিয়ে গেছে, কিছুতেই তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় যেন একটা নিয়ম আছে, আবার বিশৃঙ্খলাও আছে। কেউ কি এই নিয়ম আর বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচতে পারে?

আমার ভাবনায় বাধা পড়লো। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝিলিক। গাছপালার সারা দেহে এক স্বাদিত আশঙ্কার শিহরণ। . নিয়ম-শৃঙ্খলায় যেন বিদ্রোহ দেখা দিতে যাচ্ছে। অথচ ঘরের মধ্যে ডাক্তার আর বোদেনদিয়েক পরম নিশ্চিন্তে আলোচনায় মত্ত। বাইরের আসন্ন বিদ্রোহের ছায়া পর্যন্ত পড়ে নি তাঁদের ঘরের চৌকাঠে।

"বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে," আমি বললাম।

"তাই নাকি? ডাক্তার মুখ তুললেন। উনি তখন খুব মন দিয়ে ইসাবেলের দ্বৈত সত্তার অসুখের কথা ব্যাখ্যা করছিলেন। কীভাবে এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বিভিন্ন সময়ে নিজেকে বিভিন্ন মানুষ ভাবে।···অথচ আমার মনে হলো এ রোগটা তো আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। আমরাও নিজেদের নানান ভূমিকায় চিন্তা করি, তাহলে সত্যিকারের রোগী কে?

টেবিলের কাছে গিয়ে গ্লাসের বাকী মদটুকু গলায় ঢাললাম। বাঃ, এখন

তো বেশ ভাল লাগছে। মনটা বেশ মেজাজী হয়ে উঠছে।

"নাঃ, যাই, বন্দী করে রাখা রোগীগুলোকে এ সময়ে ভালভাবে সামলাতে হয়।"

কিছু রোগী আছে যাদের কখনও ঘরের বাইরে আসতে দেওয়া হয় না। ওরা ভারী হিংস্র।

"আপনার ঠোঁটে কি হল?" ডাক্তার জানতে চাইলেন।

"কিছু না। ঘুমের ঘোরে কামড়ে ফেলেছি।"

বোদেনদিয়েক হেসে ফেললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে একজন নার্স ঢুকলো, হাতে নতুন একটা মদের বোতল, তিনটে গ্লাস। ডাক্তার কিন্তু আর অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন।

"আশা করি তোমার আর চলবে না", মদের বোতলটা তুলতে তুলতে বোদেনদিয়েক প্রশ্ন করলেন।

"চলবে। ভালই লাগছে, তাছাড়া আপনিই তো শেখালেন।"

আমার গ্লাসে সিকি ভাগ, আর নিজের গ্লাসটা প্রায় পুরো ভরে নিয়ে বোদেনদিয়েক বললেন, "স্বাস্থ্য এবং সুখের জন্য।"

খুব দূরে কোথাও বাজ পড়ছে। আমার ঘরে এরনার চিঠিগুলো সামনে নিয়ে বসে আছি আমি। এরনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। আমি এক এক করে ওর বদ্‌গুণগুলোর হিসেব করেছি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে তারপর আর দ্বিধা হয় নি। এমন যদি হয় কাল একটা দামী গাড়ী নিয়ে নাইটক্লাবে যাই, সঙ্গে থাকবে দু-তিন জন নামকরা অভিনেত্রী আর পকেট নোটে ঠাসা। কিংবা কাল যদি কাগজে বের হয় কয়েকটা শিশুকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দারুণভাবে পুড়ে গেছি আমি।··· লিসার ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

জানলা খুলে ও ইশারা করল। আমার ঘর অন্ধকার, ও আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে না, তবে ও কাকে ইশারা করছে নিজের বুকে আঙ্গুল রেখে।

সাবধানে মুখ বের করে দেখলাম জর্জের ঘরে আলো, জানলাও খোলা। ···একটু পরে নিজের বাড়ির দরজা খুলে লিসা বেরিয়ে এল। হাতে জুতো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জর্জের দরজা খোলার শব্দ পেলাম তাহলে তলে তলে এতো দূর এগিয়েছে ওরা ?

ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এর এক নিজস্ব সঙ্গীত আছে। জলের স্রোত রাস্তা দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ দেখি জর্জের জানলা দিয়া লিসার নিটোল হাতটা বেরিয়ে এসেছে। জর্জের টাকমাথা কিন্তু দেখ গেল না। প্রকৃত প্রেমিক নয় জর্জ।

দুম্ করে শব্দ হল, সার্জেন্ট-মেজর নোপফ ঢুকলেন। এগিয়ে যাচ্ছিলেন কালো অবিলিস্কাটার দিকে, অভ্যেসমত পেচ্ছাপ করার জন্যে। কিন্তু বৃষ্টির চোটে তা আর পারলেন না।

এরনার চিঠিগুলো জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম তলায়। জলের স্রোতে ভেসে যেতে লাললো আমার প্রেমের সাক্ষ্য-প্রমাণ।

গুনগুন করে কথা বলতে শুরু করেছে লিসা আর জর্জ। আজকের রাত ওদের কাছে মধুময় হয়ে উঠুক। প্রকৃতিও আজ বন্য হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হল আমার ঘরটা যেন এক অসীম শূন্যতায় ভরা। দুঃসহ যাতনায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, এখুনি যদি একটা যোগের বই পেতাম, তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে খানিকটা স্বস্তির মুখ দেখতাম।

বিছানার দিকে এগোতে গিয়ে আয়নায় ছায়া পড়ল। ওটা কে? আমার দিকে তাকিয়ে আছে? ঠোঁটের দিকে তাকালাম, কার বিদেহী ঠোঁট যেন ওটাকে স্পর্শ করেছে। ভয়ে চমকে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

॥ ৭ ॥

রাইজেনফেল্ড তার কথা রেখেছিল। আমাদের উঠোনে স্মৃতিস্তম্ভ আর স্তম্ভমূল সার করে দাঁড় করানো হয়েছে। প্যাকিং খোলা হচ্ছে, তারপর সাজিয়ে রাখা হবে। খুব দামী দামী পাথরের জিনিস। দপ্তরের সবাই এখানে এসে জড়ো হয়েছে। জর্জের মা শ্রীমতী ক্রলও ঘুরেফিরে সব দেখছেন। গেটের পাশে দাঁড় করানো সেই কালো আবিলিস্কটার দিকে

করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন ; ওটা তাঁর স্বামীর আমলের জিনিস।

কুর্ট বাক একটা বড় কাল পাথর নিজের স্টুডিয়োতে ঢেকোচ্ছে। একটা মুমূর্ষু সিংহ বানাতে হবে ওটা দিয়ে। তবে দাঁত ব্যথা-করা, সিংহ না। পিঠে বল্লম-বেঁধা মূর্তি, উকট্রিনজেনের গ্রামে যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এটাকে স্থাপন করা হবে। আবসরপ্রাপ্ত মেজর উকট্রিনজেন এবং ক'জন বৃদ্ধ সৈনিকদের কমিটি থেকে এই ধরণের অর্ডার এসেছে। উকট্রিনজেনের অবশ্য ইচ্ছে চার-মাথাওলা একটা সিংহ তৈরি করা হোক, প্রত্যেকটার মুখ থেকে আগুনের হল্কা বের হবে।

উরটেমবার্গ ধাতু-কারখানা থেকেও একই সঙ্গে মাল ডেলিভারি দিয়ে গেছে। উড়তে যাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে চারটে ঈগলের মূর্তি মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে—ছুটো ব্রোঞ্জের, ছুটো ঢালাই লোহার। দেশের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে অন্য যুদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভে ওগুলো বসানো যাবে। আমার তদারকিতে সুন্দর করে সাজানো হচ্ছিল।

মাথার ওপর কে যেন নীল আকাশে বিশাল চাঁদোয়া খাটিয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে দিনটাকে। পাখিদের গানে বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। অথচ আজই কাগজে তিনটি আত্মহত্যার খবর আছে—সকলেই নিম্নবিত্তের মানুষ। শ্রীমতী কুবালকে বসবার ঘরে গ্যাসের নলটা খুলে দিয়ে তারই পাশে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন ; বিধবা শ্রীমতী গ্লাসকে পাওয়া গেছে তাঁর রান্নাঘরে, পাশে পড়েছিল তাঁর ব্যাংকের পাসবই, মাত্র পঞ্চাশহাজার মার্ক জমা আছে ; পেন্সন পাওয়া সরকারী কেরানী হোপফ্ আত্মহত্যা করার আগে সুন্দর করে দাড়ি কামিয়েছিল, সুন্দর করে রিপু-করা পুরনো স্যুটটা পরেছিল, হাতে লাল সীললাগানো হাজার মার্কের এক গোছা নোট, কয়েকদিন আগে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ওগুলোর দাম নেই।

ছুতোরমিস্ত্রী উইলকির ঘর থেকে ঠোকাঠুকির শব্দ আসছে। ওর ব্যবসা বেশ ভালই চলছে মনে হলো।

সকাল দশটাতেই হাইনরিখ সাইকেল নিয়ে বোধ হয় বেরিয়ে পড়েছে শোকের বাড়িতে বাড়িতে খবর পৌঁছে দিতে হবে আমাদের নতুন মাল আজই এসেছে।

এবার আমরা একটু দরাজ হাতে খরচ করতে পারি। শ্রীমতী ক্রল আমাদের স্যাণ্ডউইচ আর কফি দিলেন। লিসা বেরোল দরজা খুলে, পরনে টকটকে লাল সিল্কের পোশাক। ক্রল বুড়িওকে একেবারে পছন্দ করেন না, "নোংরা কোথাকার।" জর্জ সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদে পা দিল, "নোংরা? কে নোংরা?"

"কেন দেখতে পাচ্ছ না, ঐ মেয়েটা। ওপরের কাপড়ে কি তলার নোংরা ঢাকা পড়ে?"

জর্জ আর কথা বাড়াল না। ভালবাসার ব্যাপারে নোংরা-পরিষ্কারের প্রশ্নটাই অবান্তর, ওটা বুড়ো হয়ে যাবার লক্ষণ। লিসা আর যাই হোক, মোটেই নোংরা নয়।

সার্জেন্ট মেজর নোপফের তিনটি মেয়েই পুলিন্দা হাতে বেরিয়ে পড়েছে। ওরাই সেলাইয়ের কাজ করে। নোপফ তার পেনসেনের একাটা কানা-কড়িও বাড়িতে দেয় না।

খুব যত্ন করে যুদ্ধের দুটো স্মৃতিস্তম্ভের প্যাকিং খুলে গেটের পাশে সাজালাম। এদুটো যেমন দামী, তেমনি সুন্দর। নজর কাড়বে সবার।

"জর্জ এ দুটো যেন তোমার ভাই দুম করে কাউকে ধারে বিক্রি করে না বসে।"

"না, ততোটা ভয়ের কিছু নেই। তিন সপ্তাহ সময় তো হাতে আছেই। তার আগে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তারপর আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে পাঁচ হাজার মার্ক দামের একটা সিগার সযত্নে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করলো।

অফিসঘরে ফিরে দেখি গার্দা স্লিডার বসে আছে। গায়ে সবুজ সোয়েটার, স্কার্টটা একটু ছোট, কানে খুব বড় রিং, নকল পাথর-বসানো। বুকের বাঁ দিকে রাইজেনফেল্ড গোলাপের তোড়ার একটা লাল ফুল সযত্নে আটকানো। ফুলটা দেখিয়ে ও বলল, "অসাধারণ। সবাই ঈর্ষা করছে। এসব উপহার তো রাজরানীর পাবার কথা।"

ওকে দেখে আমার মনে হল এটাই বোধ হয় জর্জের ভাষায় পার্থিব ভালবাসা—সুস্পষ্ট, দৃঢ় সংকল্প, তারুণ্য, আর কোনোরকম ছলচাতুরি নেই।

আমি ওকে ফুল পাঠিয়েছি, ও এসেছে তার প্রতিদান দিতে। ফুল পাঠানোর উদ্দেশ্যটা ও সহজভাবেই নিয়েছে।

"আজ বিকেলে কি করছ?"···গার্দা প্রশ্ন করল।

"পাঁচটা পর্যন্ত এখানে কাজ আছে। তারপর একটা হাঁদাকে শেখাতে যাবো।"

"তার মানে ছ'টা। ঠিক আছে, তারপর আলস্টাডটার হলে এসো, ওখানে আমি ব্যায়াম করি।"

একটুও না ভেবে বললাম, "যাবো"

গার্দা উঠে পড়ল, "বেশ তাহলে" তারপর কোনো কথা না বলে মুখটা বাড়িয়ে দিল আমার মুখের কাছে। আমি কিন্তু এতোটা আশা করিনি। খুব সাবধানে আমি ওর গালে চুমো খেলাম।

"ভীতু কোথাকার", কথাটা বলেই গার্দা আমাকে ঠোঁটে চুমো খেল গাঢ় করে, "আজ এখানে ঘুরে বেড়ানো শিল্পীদের মতো ভাবালুতা দেখানো চলে না। দু'সপ্তাহ পরেই আমি এখান থেকে চলে যাব···বেশ আসছ তো ছ'টার পরে?"

ও যখন চলে যাচ্ছে তখন শ্রীমতী ক্রল বাগানে ঢুকলেন জলের ঝারি নিয়ে।

"বাঃ, বেশ ভদ্র মেয়ে তো! কি করে মেয়েটা?"

"জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখায়।"

"কি আশ্চর্য। এরা কিন্তু ভাল হয়। গান-টান গায় না তো?"

শুধু জিমন্যাস্টিক করে।"

"ও কি কিছু কিনতে এসেছিল?", বৃদ্ধার প্রশ্ন।

"এখনও সময় হয় নি···।"

বৃদ্ধা হেসে ফেললেন, "শোনো হে লুডউইগ, তোমার যখন সত্তর বছর বয়স হবে তখন মনে হবে এখনকার জীবনযাত্রাটা কি বিশ্রীই না ছিল।"

"ও কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না, কারণ এখনই এই জীবন যাত্রা আমার কাছে বিশ্রী লাগে।" বৃদ্ধা আবার হাসলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।

আর্থারের বইয়ের দোকান। আজ গৃহ শিক্ষকদের মাইনে পাবার দিন। আমার ছাত্র আজ চেয়ারে কিছু পেরেক ছড়িয়ে রেখে ছিল। রাগে ওর মাথাটা জলের চৌবাচ্ছায় চেপে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিল। রাগটা কোনো রকমে সামলেছি, তাহলে মাইনে পাব না।

"যোগের বই চাইছেন ?···এই নিন সবরকম বই আছে এর মধ্যে যোগের, বৌদ্ধধর্মের, নিরীশ্বরবাদের···তাআপনি কি ফকির হতে চাইছেন ?"

বেশ বিরক্ত লাগলো ওর কথাটা শুনে। কি মনে করে এই ছুঁচলো দাড়ি ছোট্টখাট্ট মানুষটা। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, প্রশ্ন করে বসলাম আর্থারকে—"আচ্ছা বলুন তো বেঁচে থাকার মানে কি ?"

"বেঁচে থাকার মানে ? আপনি কি ঠাট্টা করছেন নাকি ?" সোমবারের বিকেলে দোকানে এই ভীড়ের জন্যে আপনি জানতে চাইছেন জীবনের মানে কি ?"

"হ্যাঁ। এবং আপনার স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে প্রশ্নটার উত্তর আপনার জানা নেই···এই এতো বই থাকা সত্ত্বেও।"

"প্রশ্নটা আপনার ক্লাবে তোলেন নি কেন ?"

"তুলেছিলাম," আমি বললাম, "সব দায়সারা, এড়িয়ে যাওয়া উত্তর পেয়েছি। আমি চাই প্রকৃত সত্যটা জানতে।"

"প্রকৃত সত্য ?···ওসব দার্শনিকদের কাজ। আমি একজন বইয়ের দোকানের মালিক, একজনের স্বামী, বাবা। এটাই আমার কাছে যথেষ্ট।"

"পঁচিশ বছরে বয়সেও কি আপনার ঐ ধারণা ছিল ?"

"নিশ্চয়ই। তখনও চাইতাম দোকান হবে, বিয়ে করব, বাবা হবো। তাই বলে সাধু বা ফকির হবার ইচ্ছে হয়নি।"

একজন মহিলা খদ্দেরকে দেখে তার দিকে ছুটে চলে গেল আর্থার। আমিও কথা না বাড়িয়ে কাউন্টারের ভেতরে ঢুকে শোকেসে রাখা বাছা বাছা দর্শনশাস্ত্রের বই দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত প্লেটোর "সিম্পোজিয়াম" আর ভদ্র আচরণের ওপর একটা বই নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আলস্টীডটার হক একটা সরাইখানা, ভ্রাম্যমান অভিনেতা, যাযাবর,

গাড়োয়ানরা থাকে। তিন তলায় দশ বারটা ঘর আছে, ভাড়া দেওয়া হয়, তারপর একটা বড় হলঘর, সেখানে ব্যায়াম করার সব সাজ-সরঞ্জাম রাখা। সরাইখানার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্যই মদ। মাঝে মাঝে অপরাধ জগতের বাসিন্দারাও আসে এখানে।

হলে ঢুকতেই দেখি রেণী ছ লা ত্যুর পিয়ানো বাজিয়ে গান তুলছে। ডান ধারে একটা লোক বাঁশের ছড়ি দিয়ে দুটো কুকুরকে খেলা শেখাতে ব্যস্ত। দুটি কুস্তিগীর টাইপের স্ত্রীলোক মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ঐ তো গার্দা, একটা ট্রাপিজে দোল খাচ্ছে পাখির মতো।

"ও প্র্যাকটিশ করছে," রেণী বললো, "ও আবার সার্কাসে ফিরে যেতে চায়।"

"সার্কাস, ও কি আগে সার্কাসে ছিল?"

গার্দা দুলতে দুলতে আমাকে দেখছিল।

"উইল কি সত্যিই টাকা-পয়সা ওলা লোক?" হঠাৎ রেণী আমাকে প্রশ্ন করল।

"মনে তো হয়। আজকালকার অভিধান অনুসারে তা বটেই। নানারকম কারবার করছে।"

"পুরুষমানুষ ধনী হবে এটা আমি চাই···সব মেয়েরাই চায়," রেণী হাসলো।

"সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি, সৎ কর্মচারীর চেয়ে জোচ্চোর ফাটকা-বাজদের দাম অনেক বেশি মেয়েদের কাছে।"

রেণী এবার জোরে হেসে উঠল, "সততা আর সম্পদকে এক করে ফেল না। তবে আমরা চাই সুখ স্বাচ্ছন্দ আর নিরাপত্তা।"

ধপ্ করে লাফ দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো গার্দা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "রেণীর কথা শুনো না, ও মিথ্যে কথা বলছে।"

"মেয়েরা যেদিন মিথ্যে কথা বলা বন্ধ করবে সেদিন তারা আর মেয়ে থাকবে না," রেণী খিল খিল করে হাসলো।

গার্দা আমাকে বললেন, "দাঁড়াও পোষাক পাল্টে আসছি।"

"গার্দাকে সুখী করার চেষ্টা কোরো," রেণী বললো ভারী অদ্ভুত ভাবে,

"মাত্র দু সপ্তাহ তো, খুব একটা কঠিন হবে না, তাই না ?"

আমি বেশ বিব্রত বোধ করতে লাগলাম, এক্ষেত্রে তো বলার কিছু নেই। আমাকে বাঁচালো উইলি, দারুণ সেজে এসেছে সে। ফুলবাবুটির মতো লাগছে। রেণীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আলতো ভাবে চুমো খেল উইলি, তারপরে পকেট থেকে নীলকান্তমণি বসানো একটা সোনার আংটি বের করে রেণীর আঙ্গুলে পরিয়ে দিলো। রেণী যেন নিজেকে সামলাতে পারছে না, এমন ভাবে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, "ওঃ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে !"

ওর চিৎকার শুনে গার্দা ড্রেসিং গাউন চাপিয়েই বেরিয়ে এসেছে, "কি হলো ?"

"তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও সবাই," উইলি বেশ উদার ভাবে ঘোষণা করলো, "বেরোতে হবে।"

গার্দা আর রেণী তৈরী হতে চলে গেলো।

"এ কাজটা কেমন হলো উইলি, আংটিটা তুমি রেণীকে পরেও তো দিতে পারতে। গার্দার কাছে আমি ছোট হয়ে যাবো ?"

"শোনো ওসব বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ো না," উইলি আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করলো, "আমি যেভাবে রেণীকে চাই, তুমি গার্দাকে সে-ভাবে চাও না। রেণী এক অসাধারণ মহিলা।"

"যদি এতই অসাধারণ তো বিয়ে করছ না কেন ?"

"বিয়ে ?" উইলি যেন আকাশ থেকে পড়লো, "এই ধরনের মেয়েকে বিয়ে করা যায় না। ফুর্তি করার বান্ধবী, তার বেশি নয়।"

রেণী ফিরে এসেছে, ওরা দুজনে গাড়ীতে করে চলে গেলো। আমি চাইছিলাম গার্দা যেন এসব না দেখে। একটু পরে গার্দা এলো।

এডুয়ার্ডের হোটেলের কয়েকটা কুপন পকেটে আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় কুপন চলে না। কী করি ভাবছি, তার আগেই গার্দা বললো, "আমার একটা প্ল্যান আছে, শুনবে ?—চলো গ্রামের দিকে বেড়িয়ে আসি। একটা ট্যাক্সী নিয়ে নেবো। তারপর পায়ে হাঁটবো।"

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। গ্রামে পায়ে

হেঁটে বেড়ানো—ঠিক এই প্রস্তাবটাকে কী ভাবে ব্যঙ্গ করেছিল এরনা। তবে কি এরনা কথাটা গার্দাকে বলেছে? তা বলতে পারে।

"তার চেয়ে ওয়ালহাল্লাতে গেলে হয় না," আমি খুব সাবধানে কথাটা পাড়লাম।

"কী দরকার। আমি আলুর স্যালাড তৈরী করে রেখেছি। কিছু সসেজ আর বীয়ার কিনে নিলেই চলবে।"

আমি যেন কিছুতেই গার্দার এই সুন্দর প্রস্তাবটা ভাল মনে মেনে নিতে পারছিলাম না। এতো সুখ কী আমার সইবে?

"ঠিক আছে গার্দা, তুমি যা বলছো তাই হবে, চলো বনে বাদাড়ে একটু ঘুরে আসি।"

॥ ৮ ॥

উসট্রিনজেন গ্রাম সেদিন খুব সেজেছে, পতাকায় পতাকায় ছয়লাপ। জর্জ, হাইনরিখ ক্রল, কুর্টবাক আর আমি হাজির। যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের ডেলিভারী আমরা দিয়েছি, আজ তার উদ্বোধন। দুটো গির্জারই যাজকরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আলাদা আলাদা ভাবে করেছেন। ক্যাথলিকদের গির্জাটা অনেক বড়, ওরা খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে করেছে। স্মারকস্তম্ভ উন্মোচনের আসরে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্ট পুরোহিতরা উপস্থিত।

যে সব মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হচ্ছে তার মধ্যে দুজন ইহুদীও আছে। অথচ ইহুদী ধর্মগুরু রাবাইকে আসতে দেওয়া হয় নি। তার কারণটা কিন্তু খুবই সহজে বোঝা যায়। প্রাক্তন সৈনিকদের যে সমিতিটা এর আয়োজন করেছে তার মাথা হলেন অবসর-প্রাপ্ত মেজর ভোকেন স্টেইন, কারণ ইহুদী বিদ্বেষী। স্তম্ভের গায়ে ইহুদী দুজনের নাম লেখানোর ব্যাপারে পর্যন্ত ওঁর আপত্তি ছিল। কারণ দেখিয়েছিলেন উদ্ভট—ওরা ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় নি, সেখান থেকে অনেক দূরে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওঁর আপত্তি ভোটে টেঁকে নি। মজার ব্যাপার কি মেয়র সাহেবের নিজের ছেলে একবারও যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে না গিয়ে অসুখে ভুগে হাসপাতালে মারা যায় ১৯১৮ সালে, তিনি মেজরের কথাটা বেশ জোর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন।

আজকে মেজর ভোকেন স্টেইন সম্পূর্ণ রাজকীয় বাহিনীর উর্দি পরেছেন, যদিও এটা নিয়ম না। ১৯১৮ সালের যুদ্ধকে সবাই ঘৃণা করেছিল, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, আজ তারা তাই নিয়ে গর্ব করে। শতমুখে যুদ্ধের বর্ণনা দেয়, নিজের বীরত্বের কাহিনী বলে। যুদ্ধে যারা নিকট আত্মীয় হারিয়েছে তাদের মনের ক্ষত আজও মিলিয়ে যায় নি, অথচ যাদের ঐ জাতীয় ক্ষতি হয় নি তারাই বেশি বড়াই করে। মেজর ভোকেন স্টেইন দেশাত্মবোধক বিরাট বক্তৃতা দিলেন, সত্যি গর্ব করে শোনার মতো।

তারপর আবরণ সরানো হলো। পিঠে বল্লম বেঁধা সিংহ, স্তম্ভের চার কোণে ডানা তোলা চারটে ঈগল, দামী গ্রানাইট পাথরে তৈরী, কাজটা নিখুঁত হয়েছে।

এরপর ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের যাজকরা এসে মালা দিলেন বেদীতে, অন্যেরাও দিলেন। আমার হঠাৎ মনে হলো যুদ্ধের সময় নিশ্চয়ই জর্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশে সব পুরোহিতরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। যাতে তাদের সৈন্যরা নিরাপদে থাকে, তাঁদের দেশ ধ্বংস না হয়—তখন ঈশ্বর ঠিক কাদের কথা শুনতেন আদৌ? শোনেন কি?

যাই হোক উৎসব শেষ হলো, সন্ধ্যের পর গির্জাতে ভজনা হবে। সেটাকেও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

আমরা অপেক্ষা করে আছি, কারণ কথা আছে উৎসবের পর আমরা টাকা পাবো। দেরী করা চলবে না, এর মধ্যে ডলারের দাম হু হু করে বাড়ছে।

আমি আর জর্জ গুটি গুটি হাজির হলাম মেয়রের বাড়ী। উনি তখন কেক, কফি আর সিগার সাজিয়ে বেশ আরাম করে বসেছেন। আমরা বলতেই উনি সরাসরি জানালেন এখন টাকা-পয়সা দেওয়া যাবে না। পরের সপ্তাহে আসুন।

ভাগ্য ভাল যে হাইনরিখ আমাদের সঙ্গে নেই, ও থাকলে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেতো। কুর্টবাকও একটা স্বাস্থ্যবতী গ্রামের মেয়ের সঙ্গে "প্রকৃতি" দেখতে চলে গেছে।

কফি আর কেক দেওয়া হলো আমাদের, সেইসঙ্গে সিগারও। আমরা আপত্তি করলাম না।

"কিন্তু দামটা আজই চাই," জর্জ জানালো। "কথা ছিল তাই, তাছাড়া আমাদের ভীষণ টাকার দরকার।"

"টাকার তো সবারই দরকার," মেয়রের কেরানী গায়ে পড়ে কথাটা বললো।

"পরের সপ্তাহে আসুন," মেয়রের এক কথা।

"দেখুন, তা হয় না, আমরা যাকে দেবো, তারটা এমনিতেই তিন সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে," জর্জ নাছোড়বান্দা।

"বেশ তো আর একটা সপ্তাহে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না," মেয়র বেশ দরাজ গলায় কথা বলছেন মদে চুমুক দিতে দিতে।

হঠাৎ ওপর-পড়া হয়ে কেরানীটি বলে উঠলো, "যদি টাকা না পান তাহলে কি স্মৃতিস্তম্ভটা তুলে নিয়ে যাবেন?"

"তাও করতে পারি," আমি বলে উঠলাম, "আমরা চারজন আছি, কোনো অসুবিধে হবে না।"

"সে চেষ্টা করে লাভ হবে না, এখানকার কয়েক হাজার লোকের সামনে থেকে উৎসর্গ করা জিনিস কী করে নিয়ে যাবেন?"

বুঝলাম ফাঁদে পড়ে গেছি। কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় কে একজন জানলা দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, "মেয়র, শিগ্‌গীর আসুন, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে।"

"কী হয়েছে?"

"বেস্টে···ছুতোর মিস্ত্রী ·ওরা··ওরা ওর পতাকা টেনে নাবাতে গিয়েছিল, তখনই ঘটেছে।"

"কী হয়েছে? বেস্টে কি গুলী চালিয়েছে? এই সব হতভাগা সমাজ-বাদীগুলোকে নিয়ে কি যে করি।"

"না, বেস্টের নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।"

"আর কারুর নয়?"

"না, শুধু বেস্টের।"

মেয়রের মুখ স্বাভাবিক হয়ে এলো, "এত চেচাঁমেচি করার কিছু নেই, চলো যাচ্ছি।" মেয়র আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "বুঝতেই তো পারছেন গুরুতর ব্যাপার। আজ আর কোন কথা হবে না আপনাদের সঙ্গে।"

আমরাও ওঁর সঙ্গ নিলাম। ব্যাপারটা এমনিতে এমন কিছু না, আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে দারুন গোলমেলে। আজকে যাদের নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ তারা সবাই মারা গিয়েছিল জার্মানীতে রাজতন্ত্র থাকা কালে, ফলে পুরনো আমলের পতাকা টাঙ্গিয়ে ছিল সবাই, মেয়রের তাই নির্দেশ ছিল। কিন্তু এখনকার সরকারী পতাকা হলো প্রজাতন্ত্রের পতাকা। বেস্টে নিজের বাড়ীতে সেটাই টাঙ্গিয়ে ছিল।

ঘটনা স্থলে পেঁাছে দেখি বেস্টে তার বাড়ীর পাশে গলিতে পড়ে আছে, পাশে প্রজাতন্ত্রের পতাকাটা ফালাফালা করে ছেঁড়া। বেশ একটা ভীড়ও আছে। একজন পুলিশ ছোট্ট নোটবুকে কী যেন লিখছে। কে কে দেখেছে ঘটনাটা প্রশ্ন করতেই সকলে মুখে কুলুপ আঁটলো।

"একটা ডাক্তার ডাকলে হতো না," জর্জ বললো মেয়রকে।

"তার কি কোনো দরকার আছে? বরং একটু জল···" মেয়র না তাকিয়েই উত্তর দিলেন।

কিন্তু না ডাক্তার এলেন, এবং এসে এক নজর দেখেই ঘোষণা করলেন লোকটা মারা গেছে। এবার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের পালা শুরু হবে।

আমি আর জর্জ কেটে পড়লাম। একজনকে কফি খাইয়ে নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারলাম বেস্টের বেয়াড়াপনা ঘোচাবার জন্যে একদল লোক এসে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তারপর তারা পতাকাটা নামাবার চেষ্টা করতেই বেস্টে বাধা দেয়, তখন ঘুষোঘুসিতে এই কাণ্ড। এই বেস্টে যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক, ওর ফুসফুসে গুলী লেগেছিল, তাই এইটুকু মারামারিতেই মুখে রক্ত উঠে শেষ হয়ে গেল।

লোকটাকে সাক্ষী হবার কথা বলতেই চমকে উঠলো, "ছেলে বৌ নিয়ে ঘর করি, ও সব ঝামেলায় জড়িয়ে নিজের বিপদ টেনে আনতে সে রাজী নই।"

আমরা ধৈর্য্যধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি ভোকেনস্টেইন হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। এখন আর গায়ে মিলিটারী উর্দি নেই। উনি এই গ্রামে থাকেন না আর, চলে গেছেন ওয়ারদেনব্রুক শহরে, সেখানে তিনি প্রাক্তন সৈন্যদের সমিতির সভাপতি।

কুর্টবার্ক ফিরে এসেছে, সঙ্গে সেই মেয়েটি এবং অজস্র ফুল। বেস্টে মারা গেছে শুনে মেয়েটা খুব মুচড়ে পড়ল, তাহলে রাতে নাচ-গানের আসর বসছে না।

ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা আবার চললাম মেয়রের কাছে।

সারা গ্রামটা যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের শান্ত হয়ে গেছে।

"আপনারা নিশ্চয়ই আবার টাকা-পয়সার কথা বলতে আসেন নি?" শুকনো অথচ রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন মেয়র।

"তাই এসেছি। এটাই আমাদের পেশা। তাছাড়া মৃত্যু নিয়েই তো আমাদের কারবার।"

"আপনাদের কিছুটা ধৈর্য্য ধরতেই হবে। এখন আমার হাতে একটুও সময় নেই। জানেন তো কি ঘটে গেছে?"

"হ্যাঁ জানি। আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আরও অনেককিছু জেনেছি। আপনি আমাদের সাক্ষী মানতে পারেন ঐ ব্যাপারে। তাছাড়া টাকার জন্যে তো আমাদের থাকতেই হচ্ছে, আমরা কাল পুলিশে গিয়ে সব খবরটা দিতে পারবো।"

"সাক্ষী? কীসের সাক্ষী?" মেয়র যেন হতভম্ব।

"বেস্টের খুনের। খুন এবং খুনের জন্য উত্তেজিত করার ব্যাপারে", জর্জ খুব শান্তভাবে বললো।

"তোমরা কি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ", রাগে গর গর করে উঠলেন মেয়র।

"আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না", জর্জের গলা আরও শীতল।

কোনো কথা না বলে আলমারী খুলে নোটের বাণ্ডিল টেবিলে ছুঁড়ে দিলেন মেয়র "গুণে নিয়ে রসিদ দিয়ে যাবেন।"

'গুণে নিয়ে রসিদ দিলো জর্জ। চাপা গর্জন করে মেয়র বলে উঠলেন, "এখান থেকে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন কোনো অর্ডার পাবেন না, এটা কি বুঝতে পারছেন ?"

"তা কে বলতে পারে। আমরা হয়তো বিনা পয়সায় বেস্টের সমাধিতে স্তম্ভ বসাতে পারি।"

আর কথা না বাড়িয়ে স্টেশনে এলাম। কুর্ট আর হাইনরিখ অপেক্ষা করছিল।

"টাকা পেয়েছ ?"

"পেয়েছি।"

"জানতাম", হাইনরিখ ঘাড় নাড়লো, "এরা খুব ভদ্রলোক।"

"তা ঠিক", আমি সায় দিলাম।

দূরে একটা বেঞ্চে ভোকেনস্টেইন বসে আছেন ভাবুকের মতো।

"এটার কি হবে বলো তো ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোন্‌টার ?"

"বেস্টের ব্যাপারটা।"

জর্জ দার্শনিকের মতো উত্তর দিলো, "কিছু হবে না। সবাই মিলে প্রমাণ করে দেবে ছুতোর মিস্ত্রীটারই দোষ। প্রজাতন্ত্র হয়েছে বটে, কিন্তু সেই আগেকার জজ, পুলিশ, প্রশাসন তো বদলায় নি। ফলে নতুন কী আশা করো ?"

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমারও তাই মনে হলো—সত্যিই তো নতুন কি আর আশা করা যায়। যুদ্ধে আমরা লক্ষ লক্ষ লোককে মরতে দেখেছি। একটা মৃত্যুতে এতো কাতর হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই কি ? একটা লোক মরলে তাকে আমরা বলি মৃত্যু—বিশ লক্ষ মরলে সেটা হয়ে যায় পরিসংখ্যান।

॥ ৯

"সমাধি-মন্দির", শ্রীমতী নাইবুর বলে উঠলেন, "হয় সমাধি মন্দির, নয়তো অন্য কিছুই না।"

"ঠিক আছে", আমি বললাম, "সমাধি মন্দিরই হোক"। নাইবুর মারা যাবার অল্প সময়ের জন্যে এই শান্ত, ভীরু মহিলাটি ভীষণ বাচাল আর ঝগড়াটে হয়ে উঠেছেন। রুটিওলার কবরে স্মৃতিস্তম্ভ হবে, না, সমাধি হবে তাই নিয়ে দু'সপ্তাহ ধরে মহিলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলছে আমার।

"একটা নমুনা দেখতে চাই যে", শ্রীমতী নাইবুর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

"সমাধি মন্দিরের নমুনা হয় না। রাণীর নাচের আসরের পোষাকের মতো বিশেষ অর্ডার দিয়ে করাতে হয়। কিছু নক্শা আছে, তবে মনে হয় আপনার জন্যে বিশেষ ধরণের একটা কিছু করাতে হবে।"

"নিশ্চয়ই, একেবারে স্পেশাল ধরণের হতেই হবে, তা নাহলে আমি কিন্তু হোলমান অ্যাণ্ড ক্লোৎজ-এ যাবো।"

"মনে তো হয় আপনি ওখানে ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছেন। তবে এটা ঠিক আমরা চাই আমাদের খদ্দেররা আগে আমাদের প্রতিযোগী কোম্পানীগুলো দেখে আসুন।"

হোলমান ক্লোৎজের এজেন্ট কাঁছনে অস্কার আগেই খবর দিয়েছে আমাদের। আমরা ওকে বেশি কমিশন দেবার লোভ দেখিয়ে এসেছি, যদি খদ্দেরটাকে আমাদের কাছে ভিড়িয়ে দিতে পারে। অস্কার এখন দোটানায় পড়েছে—কোন্ দিকে যাবে।

"দেখান, আপনাদের নক্শা, ছবি যা যা আছে দেখান", শ্রীমতী নাইবুর এমন মেজাজে কথা বললেন যেন উনি একজন জমিদার গিন্নী।

নক্শা আমাদের একটাও নেই; তাই কিছু না বলে যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের কয়েকটা স্কেচ দেখালাম। বেশ রঙ দিয়ে আঁকা, জানি ওঁর মনে ধরবে।

"সিংহ ?...উনি কিন্তু সত্তিকারের পুরুষ ছিলেন। তবে মুমূর্ষ সিংহ না। লাফ দিতে যাচ্ছে এমন সিংহ চাই।"

"আচ্ছা সামনের পা তোলা ঘোড়া হলে কেমন হয় ?"

শ্রীমতী মাথা নাড়লেন, "ঈগল"।

"আসল সমাধি মন্দির কিন্তু ছোট গির্জার মতো হওয়া উচিত। রঙীন কাঁচ, মার্বেলপাথরের শবাধার। তাতে ব্রোঞ্জের মালা, বাইরে থাকবে পাথরের বেঞ্চ, ওখানে বসে আপনারা প্রার্থনা করবেন। চার পাশে এক ফালি ফুলের বাগানও থাকবে। পুরো জায়গাটা ছোট ছোট গ্রানাইট পাথরের থাম দিয়ে ঘেরা থাকবে, তাতে আটকানো থাকবে লোহার শেকল। গেটে থাকবে আপনাদের পারিবারিক নামের আদ্যাক্ষরগুলো।"

শ্রীমতী নাইবুর একমনে শুনে গেলেন আমার কথা যেন কোনো ধ্রুপদী গান শুনছেন, "শুনতে খারাপ লাগছে না। তবে মৌলিক কিছু নেই ?"

আমার রাগ হয়ে গেলো। শ্রীমতীও ধনী খদ্দেরের মতো কটমটিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

"নেই কে বলল ?" আমি বিষ মিশিয়ে বলতে লাগলাম, "আচ্ছা। আমাদের ভাস্কর কয়েক বছর আগে করেছিল—কফিনের মাথার কাছে বসে বিধবা কাঁদছেন, একজন দেবদূত মৃত আত্মাকে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছেন। অন্য হাতে বিধবাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। সাদা মার্বেলের তৈরী হবে, দেবদূতের ডানা মেলাও হতে পারে আবার গোটানোও হতে পারে...।"

"চমৎকার। আর কি আছে ?"

"অনেক সময় পেশাটাকে তুলে ধরা হয়, যেমন এক্ষেত্রে রুটিওলা ময়দা মাখছেন, মৃত্যু পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে টোকা দিচ্ছেন। মৃত্যুকে চোখ-মুখ ঢাকা আলখাল্লা পড়ানো যেতে পারে, আবার কংকালও করা যেতে পারে, তাতে খরচ আর পরিশ্রম দুই-ই বাড়বে, বিশেষ করে কংকালের পাঁজরগুলো করা খুব কঠিন।"

শ্রীমতী নাইবুর কোনো মন্তব্য করলেন না, যেন তিনি আরও কিছু

শুনতে চান। "অবশ্য সেই সঙ্গে আত্মীয় স্বজনরা হাঁটুমুড়ে বসে আছে তাও দেখানো যেতে পারে।"

"আর কি?"

"এছাড়া আর কিছু নেই আপাততঃ", আমি সোজাসুজি উত্তর দিলাম।

"তাহলে তো আমরা হোলমান অ্যাণ্ড ক্লোৎজ-এ যেতেই হচ্ছে," কথাটা বলে শ্রীমতী অপেক্ষা করতে লাগলেন, ভাবখানা এই যে আমি এবার কাকুতি-মিনতি জানাবো ওঁকে। কিন্তু তা না করে আমি বললাম, "বেশ তো, নিশ্চয়ই যাবেন। আমরা চাই খদ্দেররা সব দেখে শুনে সব শেষে আমাদের কাছে আসুন। নাম বলতে চাই না আমাদের প্রতিদ্বন্দী একটা কোম্পানীর তৈরী জিনি যে দেবদূতের দুটোই বাঁ পা, যীশুর এগারোটা আঙুল হয়ে গিয়েছিল, যখন জানা গেলো তখন আর কিছু করার ছিল না।"

"ও ব্যাপারে নজর রাখবো", শ্রীমতী জানালেন। তা উনি নজর রাখতে পারেন। এখন শোক দেখানোটাই ওঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

কফিন-মিস্ত্রী উইলকি নিজের কারখানা থেকে বেরিয়ে এলো। গোঁফে কাঠের গুঁড়ো। তাতে একটা বাক্স, তাতে স্প্রাট মাছ ভাজায় ভর্তি।

"জীবন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?" আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

বেশ তারিয়ে তারিয়ে মাছ ভাজা খেতে খেতে ও বললো, "সকালে একরকম ধারণা, বিকেলে অন্যরকম, শীতে একরকম, গ্রীষ্মে অন্যরকম, খাবার আগেও যে রকম, খাবার পরে সে রকম না, হয়তো যৌবনে যেরকম ধারণা আছে, বার্দ্ধক্যে সেরকম থাকবে না।"

"চমৎকার খুব বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছ।"

"তাই নাকি, তা উত্তর যদি জানাই ছিল তবে জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"শুধু শেখবার জন্যে, সকালে একভাবে প্রশ্নটা করি, বিকেলে অন্যভাবে, শীতে একভাবে, গ্রীষ্মে অন্যভাবে, সহবাসের আগে একভাবে, পরে অন্যভাবে..."

"দারুণ...দারুণ বলেছ, ওসব কথা তো ভুলতেই বসেছিলাম। শোনো তোমার কাছে সোয়েটার পারা যে মেয়েটা আসে ওর সঙ্গেভাব করিয়ে দাও

না আমার।"

আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম কফিন-মিস্ত্রীর দিকে। ও নিঃসন্দেহে গার্দার কথা বলছে। এবং আমি এখন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছি। তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, "আমি মেয়েমানুষের দালালি করি না। তবে তোমাকে একটা অযাচিত উপদেশ দিচ্ছি—মেয়েদের নিয়ে ঐ কারখানায় ঢুকো না। মেয়েরা কফিন দেখলেই আঁতকে ওঠে।"

"তবে যাবো কোথায়? হোটেলে? অতো খরচা পোষাবে না। পার্কে? পুলিশ আছে। এই উঠোনে? এর চেয়ে আমার কারখানা অনেক ভাল।"

"তোমার কোনো ফ্ল্যাট নেই?"

"আছে। বাড়িউলিটা দজ্জাল। বছর দশেক আগে বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক করেছিলাম, সেটা ও আজও ভুলতে পারে নি। দাও না ওই সোয়েটার পরা মেয়েটার সঙ্গে ভাব করিয়ে।"

আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখালাম বাক্সটায় আর মাছ ভাজা নেই। ও হাত ধুতে চলে গেলো। আমিও নিজের অফিসে এসে নাইবুরের সমাধি মন্দিরের নক্‌শা তৈরী করার কাজে ডুবে গেলাম।

নোপফের যমজ মেয়ের একটা এসে উকি মেরে আমার হাতের কাজ দেখে গেলো, ওর খুব পছন্দ হয়েছে। এমন সময় দেখি উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছে গার্দা। আমি তাড়াতাড়ি আঁকার জিনিষপত্র নামিয়ে রাখলাম। উইলকি কি যেন একটা ধুচ্ছিল, ও মাছভাজার বাক্সটা দেখিয়ে ছুটো আঙ্গুল তুললো, অর্থাৎ দুবাক্স মাছ ভাজা দেবার লোভ দেখাচ্ছে। বিনিময়ে গার্দার সঙ্গে ভাব করতে চায়।

আজ গার্দা ছাই রঙের স্কার্ট আর হালকা ছাই রঙের সোয়েটার পরেছে, খুব স্মার্ট লাগছে। কফিন মিস্ত্রীও গার্দাকে চাইছে-যে নারীকে একাধিক পুরুষ চায় তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরও বাড়ে।

"নাইট ক্লাবে গিয়েছিল?" প্রশ্ন করলাম।

গার্দা মাথা নাড়লো, "ঐ নর্দমায়? নাহ·· আমি প্র্যাকটিস করছিলাম।"

ভীষণ ভাল লাগছিল গার্দাকে। পেছনে তাকিয়ে দেখি উইলকি জামার বোতাম আঁটলো, চুল আঁচড়ালো, তারপর তিনটে আঙুল তুললো —তার মানে পাঁচ বাক্স মাছভাজার টোপ দিচ্ছে ও। মন্দ না। কিন্তু তাই বলে? না, না, এরনার ব্যবহার, বা ইসাবেলের নিস্পৃহতার পর গার্দা যেন আমার জীবনে স্বপ্নের মতো উদয় হয়েছে। হঠাৎ দারুণ খুশিতে উপছে উঠে আমি বললাম, "চলো গার্দা, আজ ওয়ালহাল্লায় যাই। খিদে আছে তো? মন ভরে খাব। এক সপ্তাহ আগে তুমি এখানে এসেছ, আবার চলে যাবে। চলো আজ একটা উৎসব জানাই।"

ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসছি দেখি হতাশ নয়নে দাঁড়িয়ে আছে উইলকি। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দশটা আঙুল তুললো। তার মানে দশবাক্স মাছভাজা?

"কেন নেবো না?" এডুয়ার্ড নবলক এতো মিষ্টি করে বললো কথাটা যে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাতে কুপন নেয় না নবলক; কিন্তু গার্দাকে এক নজর দেখেই ও রাজী হয়ে গেছে: শুধু তাই না টেবিলের কাছে একটু ঘুরঘুর করার পর বললো। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?"

বাধ্য হলাম, কারণ ও আমার কুপন নিতে রাজী হয়েছে। "এডুয়ার্ড নবলক, হোটেল মালিক, কবি, কোটিপতি, এবং কৃপণ"···আর এ হলো "ফ্রাউলিন গার্দা স্নিডার।"

"ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না ফ্রাউলিন," এডুয়ার্ড একাধারে খুশি আবার রেগেও গেলো।

"নামটাও না?" আমি খোঁচা দিলাম।

গার্দা হাসলো, "আপনি কোটিপতি? কি ভালই না লাগছে শুনে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো এডুয়ার্ড, "ব্যবসায়ীর দুঃখের কথা ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ বোঝে না। কাতা যে চিন্তা থাকে।···এর কথায় কান দেবেন না ফ্রাউলিন। আপনি কি সুন্দর···ঈশ্বরের তৈরী কি অপরূপ প্রাণী··· আপনি যেন এক মুক্তপাখি বিষাদের আকাশে ডানা মেলে উড়ে

বেড়াচ্ছেন।"

আমি হাঁ হয়ে গেছি, আজ এডুয়ার্ডের হলো কি ? আজ গার্দা দেখছি দারুণ মোহিনী হয়ে উঠেছে। "ওসব কেতাবী বাণীর কথা বাদ দাও এডুয়ার্ড। এই মহিলাও একজন শিল্পী। আর তুমি কি আমাকেই বিষাদের আকাশ বলতে চাইছ ? কই খাবার কোথায় ?" বাহ্…হের নবলক দেখছি বেশ কাব্য করে কথা। বলতে পারেন," গার্দা বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো এডুয়ার্ডের দিকে, "এতো কাজকর্মের মধ্যেও কাব্য করার সময় পান কখন ? নিশ্চয়ই আপনি খুব সুখী মানুষ, ধনীতো বটেই…আর কি প্রতিভা… ।"

"সবই করতে হয় বুঝলেন না," উজ্জ্বল মুখে বলে উঠলো নবলক, "তা হলে আপনিও একজন শিল্পী ?"

আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে এডুয়ার্ড ইতিমধ্যে রেণী দ্য লা ত্যুরকে ভুলে বসে আছে। এখন ওর লক্ষ্য গার্দা।

"হ্যাঁ শিল্পী, তবে গানবাজনায় নয়। সার্কাসে বাঘ সিংহ খেলায়।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, আবার আমি সার্কাসে ফিরে যাচ্ছি," গার্দা চোখ নামিয়ে বললো।

"কিছু খাওয়াবে ? না, শুধু গল্পই করে যাবে ?" আমি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

এডুয়ার্ড ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, আমি নিজে দেখছি। একজন সম্মানিত শিল্পী অতিথি হয়েছেন আমার।"

চলে যাওয়া এডুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে গার্দা মন্তব্য করলো। "দারুণ দারুণ মানুষটা। বিবাহিত ?"

"ওর কিপটে আর নোংরা স্বভাবের জন্যে বৌ ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

টেবিল ক্লথের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে গার্দা বললো, "বৌটারই দোষ। পুরুষদের একটু কম খরচে হওয়া ভাল। তাতে টাকা জমে।"

মুদ্রাস্ফীতির যুগে সেটা করা কি সবচেয়ে বোকামী হবে না ?"

"টাকাটা ভালভাবে খাটাতে হবে বৈকি," ভারী ছুরি কাঁটাগুলো

নাড়তে নাড়তে গার্দা বললো, "তোমার বন্ধু কবি হলে কি হবে, ব্যবসা ভালই করছে দেখছি?"

আমি একটু চমকে উঠলাম, "তা ঠিক। তবে তাতে অন্য কারুর লাভ হয় না। নিজের বৌটাকে ও উদয়াস্ত ঝিয়ের মতো খাটাতো। এডুয়ার্ডের কাছে বৌ মানে খাটা-খাটনি করার বিনিপয়সার লোক।"

গার্দা মোনালিসার মতো রহস্যময় হাসি হেসে বললো, "প্রত্যেক আয়রণ সেফের নিজস্ব চাবি আছে, বুঝলে খোকা।"

আমি ক্রমশঃ অবাক হয়ে উঠছি। এই মেয়েটাই কত সরল জীবনের কথা কালকে পর্যন্ত শুনিয়েছে আমাকে। আর আজ!

আমি শেষ চেষ্টা করবার জন্যে বললাম, "এডুয়ার্ড মোটা, নোংরা আর বিশ্রি রকমের 'কিপটে"। নারী বিশেষজ্ঞ রাইজেনফেল্ড আমায় বলেছিল এই তিনটে বিশেষণ শুনলেই মেয়েরা সেই পুরুষটিকে আর চাইবে না। কিন্তু গার্দা যেন সাধারণ মেয়েদের পর্যায়ে পড়ে না। সে বেশ আগ্রহ নিয়ে কাটগ্লাসের ঝাড়লণ্ঠনগুলো দেখছিল, "ওঁর ব্যাপারে যত্ন নেবার মত কেউ নেই দেখছি। বৌটার মতো হলে চলবে না, এমন একজনকে চাই যে ওঁর ভাল গুণগুলোকে প্রশংসা করবে।"

এবারে আমি আতংকিত হয়ে উঠেছি। এই দুটো সপ্তাহ সুখে কাটাব ভেবেছিলাম, তা আর হলো না দেখছি, "এডুয়ার্ডের কোন সদগুণ নেই।"

"প্রত্যেক মানুষের আছে", গার্দা হাসলো, "শুধু প্রকাশ করিয়ে নিতে হয়

ঠিক সেই মুহূর্তে প্লেট সাজিয়ে খাবার নিয়ে এল ওয়েটার "এসব কি

"রাজহাঁসের মেটে দিয়ে তৈরী খাবার।"

"এসব তো আমরা আনতে বলি নি।"

"হের নবলক নিজে অর্ডার দিয়েছেন," "এই বলে ওয়েটারটা বেশি অংশটা তুলে দিলো গার্দার পাতে,আমারটায় সামান্য। আমি রাগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগে পায়ের ওপর পা দিয়ে চাপ দিলো গার্দা। ওর প্লেটটা আমায় দিয়ে আমারটা ও নিজে নিলো, "পুরুষরাই তো বেশিটা খাবে।"

ওয়েটারটা থতমত খেয়ে গেলো, "হ্যাঁ, তাতো বটেই, কিন্তু সেটা বাড়িতে ...এখানে...", তার মানে এডুয়ার্ডই ওকে বলে কয়ে পাঠিয়েছে।

এডুয়ার্ড পৌঁছে গেছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। এক নজরে সব ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমার প্লেট থেকে বড়ো একটা অংশ তুলে নিয়ে আবার গার্দার প্লেটে রেখে দিলো। তারপর বেশ বিগলিত ভাবে বললো, "নিন খান।" আমার দিকে ফিরে বললো, "কেমন লাগছে ?"

"মন্দ না। তবে হাঁসের মেটে যদি বলো তবে খারাপ।"

"এটা হ্যাঁসেরই মেটে।"

"স্বাদটা লাগছে বাছুরের মেটের মতো।"

"জীবনে কোনো দিন হাঁসের মেটে খেয়েছো", নবলক ব্যঙ্গ করে বললো।

"এডুয়ার্ড, বললে বিশ্বাস করে না এতো খেয়েছিলাম যে বমি করে ফেলেছিলাম।"

এডুয়ার্ড হো হো করে হেসে বললো, "কোথায় ?"

"ফ্রান্সে। যুদ্ধের ট্রেনিং নেবার সময়। একটা গুদাম দখল করা হয়েছিল যাতে খালি হাঁসের মেটে ছিল। কদিন ধরে শুধু ঐ খেয়েছিলাম আমরা।" —আমি কিন্তু বমি করার আসল কারণটা বললাম না, গুদামের একদিকের দেওয়ালে একটা গজালের ওপর ঝুলছিল এক বৃদ্ধার মৃতদেহ, তার খুলিটা ভাঙ্গা টুকরো করে।

এডুয়ার্ড আমাকে আর ঘাঁটালো না। ঝুঁকে পড়ে গার্দাকে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন লাগছে।"

"চমৎকার।"

দারুণ খুশিতে ডগমস করতে করতে এডুয়ার্ড চলে গেলো। "দেখলে, যতো কৃপণ বলছিলে, ততো কৃপণ নয় মানুষটা।"

"শোনো সার্কাসের মেয়ে", আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলাম, "ঐ লোকটার সব দর্প চূর্ণ করে একজন ফাটকাবাজের হাত ধরে বেরিয়ে গেছে ওর বৌ। এরপর কি তুমি আমার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করতে চাইছো ?"

খাওয়া বন্ধ না করেই হেসে গার্দা উত্তর দিলো, "বাজে বোকো না তো।

এতো ঠুনকো সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে না। তার চেয়ে রোজগারের ধান্দা করো। ঐটাই তো তোমার দুঃশ্চিন্তা।"

"উপদেশটা ভালোই। কিন্তু করবো কি করে? ম্যাজিক?"

"অন্যরা যেভাবে করে।"

"এডুয়ার্ড এটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে।"

"আর উইলি?"

"ও তো নানা ধরণের ধান্দা করে। ও তো ফাটকাবাজ। যতোদিন না ধরা পড়ে ততোদিন চালিয়ে যাবে।"

"তাহলে দেখছো তো করা যায়" গার্দা শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে পুরতে বললো। আমি বলতে যাচ্ছিলাম ও রকম হতে আমি পারবো না। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, তবুও শান্ত ভাবে বললাম, "মনে হচ্ছে তুমিই ঠিক বলছো।"

"ঠিকই বলছি", গার্দা ঘাড়নেড়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে ওটা কি?"

দেখি এডুয়ার্ড আমাদের জন্যে একটা মুরগীর রোস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। দারুণ দামী খাবার। ওয়েটারকে সরিয়ে দিয়ে এডুয়ার্ড নিজেই পরিবেশন করতে লেগে গেল। আমার পাতে পড়লো পাঁজরার হাড়। বিজয়ার হাসি নিয়ে এডুয়ার্ড বললো, "এগুলো খেতে খুব ভাল। চুষে খেতে হয়।" আমিও পরাজিতের মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। প্রায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরে যাচ্ছে এডুয়ার্ড, আমি হেঁড়ে গলায় ডাকলাম। "এডুয়ার্ড।" প্রায় তেড়ে এসে আমায় বললো, "ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?"

"আমি তো চেঁচাই নি। গার্দা স্যালাড চাইছে।"

এডুয়ার্ড সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে, গার্দাকে লক্ষ্য করে বললো…"আপনি…?

…আপনি আমায় ডাকলেন?"

কি ঘটছে বুঝতে না পেরে গার্দা বললো, "তা স্যালাড থাকলে একটু খেতাম।" এবার এডুয়ার্ড বোকার মতো ফিরে গেলো। ওর ধারণা গার্দা রেণী দ্য লা তুরেরেই বোন, দুরকম গলায় কথা বলতে পারে।

ওয়েটারটা অবশ্য বললো, "হের বোদমার কিন্তু ডেকে ছিলেন, ঐ মহিলা

না।" কিন্তু এডুয়ার্ড তখন হতাশায় ক্ষেপে গেছে, ওর কথা কানে নিলো না।

বেশ রাত হয়েছে। আমি জানলার কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে অনেকটা দূর পর্যন্ত। লাইলাকের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা রাস্তা পার হয়ে চট্ করে ঢুকে পড়লো আমাদের বাগানে। এটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি মাথা ঘামালাম না।

হঠাৎ নজরে পড়লো রাস্তা দিয়ে বেঁটে মতো একটা ছায়া এগিয়ে আসছে। একটু কাছে আসতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। ঘোড়ার কসাই ওয়াটজেক। আজ দুঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরছে। বাজারে আজকাল ঘোড়ার মাংসর চাহিদা খুব বেশি। ওদের ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। ভেবেছিলাম ওয়াটজেক লিসাকে খুঁজবে, তারপর না পেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু তা হলো না। ভাবলাম জর্জকে গিয়ে খবর দি। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিরক্ত করতে নেই। কসাইটা জানলা দিয়ে চার পাশটা দেখলো। একটু পরে দেখি দরজার সামনে চেয়ার টেনে বসেছে। পায়ের বুট জুতোয় লম্বা একটা ছুরী গোঁজা। লিসা ফিরলেই ধরবে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। আজ বিশ্রী একটা কেলেংকারী হবে দেখছি। ওয়াটজেক তো আজ আর দরজা ছেড়ে নড়বে না। আর লিসারও কথা বলিহারি। জর্জের ঘরে ঢুকেছে তো আর বেরোবার নাম নেই। একটু আগে ওদের বক্‌ম-বক্‌ম শেষ হয়েছে। এবার যদি সোজা গিয়ে স্বামীর হাতে পড়ে। আমি শিউরে উঠলাম।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নেমে গেলাম জর্জের ঘরে। টোকা দিতেই ওর টাক মাথা বেরিয়ে এলো। সব ঘটনাটা বললাম।

"কী হবে তাহলে? তুমি ভাই যেমন করে হোক ওকে সরাও এখান্ থেকে।"

"এতো রাতে?", আমি অবাক হচ্ছি দেখে জর্জ হাত চেপে ধরলো। "যেমন করে পারো, নইলে···।"

···আমি বাইরে বেরোলাম; একটু হাই তুলে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটজেকের

দিকে এগোলাম। "ভারী সুন্দর রাত।"

"রাতটা সুন্দরই বটে", ওয়াটজেক উত্তর দিলো।

"তা তো নিশ্চয়ই", আমি ওর সুরে সুর মেলালাম।

"তবে বেশিক্ষণ থাকবে না", ভয়ংকর গলায় কথাটা বলে উঠলো ওয়াটজেক।

"কী থাকবে না ?", আমি খুব সাবধানে বললাম।

"কী তুমি জানো ?", আমি কি বলছি। এই নোংরামি ?"

"নোংরামি ?" এবার আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি, "কী বলছো তুমি ?"

আমার চোখ পড়লো ওর বুটের মধ্যে গোঁজা লম্বা ছুরীটার ওপর। তার পর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য : জর্জ পড়ে আছে, তার গলাটা কাটা। আশ্চর্য এরা নিজের বৌকে শাস্তি দেয় না, দিতে ভয় পায়। ত্বদিক বাঁছিয়ে আমি বললাম, "সব কিছু নির্ভর করে কী চোখে দেখবে ব্যাপারটাকে।" আমি ভেবে পাছিলাম না কেন এতোক্ষণ চুপ করে বসে আছে ওয়াটজেক, জর্জের ঘরতো একতলায়, জানলাও খোলা।

"এসবের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, "খুব গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলো ওয়াট-জেক, "রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। পাপীকে শাস্তি পেতেই হবে।"

আমি ওকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। দারুণ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। হয়তো এখন ওকে জব্দ করতে পারি, কিন্তু পরে ?

"ওর কথা শুনেছো তুমি ?" ওয়াটজেক প্রশ্ন করলো।

"কার কথা ?"

"তুমি ভাল করেই জানো। তিনি। আর আছেই বা কে ? মানুষ তো ঐ একজনই।"

আমি কিছুই শুনিনি। রাস্তা নির্জন। জর্জের জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। সময় কাটাতে হবে, তাই বেশ চেঁচিয়ে ওর সঙ্গে গল্প করার ভান করতে শুরু করলাম, "কার কথা শোনার ব্যাপারে বলছো ?"

"বেঁচে থাকা মানুষ, তিনি। ফুয়েরার। অ্যাডল্ফ হিটলার।"

"হিটলার", আমি মনে মনে স্বস্তি পেলাম, "উনি।"

"উনি ?···এ কথা বলছো কেন ? তুমি ওঁকে সমর্থন করো না ?" ওয়াট-

জেক চালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললো।

"সে তুমি ভাবতেও পারবে না কতোটা সমর্থন করি। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন উঠছে কি করে?"

"তাহলে ওঁর কথা শুনলে না কেন?"

"কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।"

"আজ রেডিওতে উনি কথা বলছেন। আমার আস্তাবলে একটা হ'ব্যাটারীর রেডিও আছে, তাতে শুনেছি। অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন। একমাত্র উনিই জানেন গলদটা কোথায়। সব কিছু বদলে দিতে হবে।"

"সে তো নিশ্চয়ই। বদলাতে হবেই। তা একটু বীয়ার হবে নাকি?" আমি টোপ দিলাম।

"বীয়ার? কোথায়?"

"ব্লুমসে। ঐ কোণের রেষ্টুরেণ্টে।"

"আমি আমার বৌয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

"অপেক্ষা তো ব্লুমসেও করতে পারো। তা হিটলার কী বললেন? জানতে ইচ্ছে করছে খুব। আমার রেডিওটা বিগড়ে বসে আছে।"

কসাই উঠতে উঠতে বললো, "সব কিছুই বলেছেন। উনি সব জানেন। নব।"

চেয়ারটা ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে ও আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলো। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ব্লুমস গার্ডেন রেষ্টুরেণ্ট।

॥ ১০ ॥

গোধূলিতে কাঁচ-মানুষটি একটা গোলাপ ফুলের কেয়ারীর সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সপ্তম জর্জ একটা সরু বাদাম গাছের বীথিকায় পায়চারি করছে। মাঝবয়সী একজন নার্স একটা কুঁজোবুড়োকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশে বসা দুজন লোক পরস্পরকে বুঝিয়া চলেছে কেন কে পাগল, কিন্তু কেউই কাদের কথা শুনছে না।

পরিবেশটা মোটামুটি শান্ত। একদিনে ডলারের দাম বেড়ে গেছে কুড়ি

হাজার মার্ক, তবুও কারুর দুঃশ্চিন্তা নেই। একটা বয়স্ক দম্পতি শুধু গত রাতে আত্মহত্যা করেছে। আজ সকালে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে পোষাকের আলমারীর মধ্যে। কাপড় শুকোতে দেবার দড়ির দুই প্রান্ত দুজনে বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। কারণ ঐ দড়িটুকু ছাড়া সারা বাড়িতে আর একটুকরো সুতো নেই। সবই বিক্রি হয়ে গেছে। এমন কি ঐ আলমারীটা পর্যন্ত। খদ্দের আলমারীটা নিতে এসে আবিস্কার করেছে মৃতদেহ দুটো। প্রথমে খদ্দের বমি করতে করতে পালিয়ে যায়, বলেছিল ঐ আলমারী তার দরকার নেই। পরে বিকেলের দিকে মনের দুর্বলতা কাটিয়ে মাল নিয়ে চলে গেছে। ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন—তাঁদের ইচ্ছে ছিল গ্যাসে আত্মহত্যা করার, কিন্তু বিল বাকী থাকায় কোম্পানী গ্যাসের লাইন কেটে দিয়ে গেছে। ওঁরা আলমারীর খদ্দেরটির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন।

ইসাবেল এলো, নীলরঙের টেনিস হাফ প্যান্ট, গোলাপী ব্লাউজ, আর অ্যাম্বারের মালা গলায়। এদিকে বেশ ক'দিন দেখা হয় নি ওর সঙ্গে। ইদানীং উপাসনা হয়ে গেলেই বাড়ি পালাতাম। বোদেনদিয়েক এবং ডাঃ ওয়েরনিকের সঙ্গে রাতের খাওয়াটা ভালই হতো, কিন্তু ওদের সঙ্গ এড়াবার জন্য চুপচাপ চলে যেতাম। তার চেয়ে গার্দার সঙ্গে বসে স্যাণ্ডউইচ আর স্যালাড খাওয়া অনেক ভাল।

"এতোদিন কোথায় ছিলে?", প্রত্যেকবারের মতো আজও প্রশ্ন করলো সে। "ওখানে, যেখানে টাকার মূল্য সবচেয়ে বেশি।" ও আমার পাশে বেঞ্চের হাতলে বসলো। আমার পাশে বসা মানুষ দুটি রেগে উঠে চলে গেলো। যেন কিছুই হয় নি, ইসাবেল আমার পাশে বসলো, "বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা কেন মারা যায়, তুমি জানো রুডলফ?"

"জানি না।" আমি আর ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছি না কারণ ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া আর ভাল দেখায় না।

"কদিন পরেই যদি মরে যেতে হয় তবে ওদের জন্ম নিয়ে লাভ কি?"

"এসব প্রশ্ন তুমি বিশপের প্রতিনিধি বোদনদিয়েককে জিজ্ঞেস কোরো। উনি বলেন ঈশ্বর সবকিছু লিখে রাখেন, এমন কি মাথা থেকে প্রতিটি চুল

খসে পড়ারও হিসেব রাখেন।"

ইসাবেল হাসলো, "ঈশ্বর সব লিখে রাখেন? কার কথা? নিজের? কিন্তু কেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ?"

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেলো, "হ্যাঁ উনি সর্বজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, সদাশয়, এবং সকলকে ভালবাসেন, তবুও শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুর মাতারাও মারা যায় পৃথিবীতে এতো দুঃখ কেন, কেউ তার কারণ দেখাতে পারে না।"

ইসাবেলের হাসি উবে গেছে, "সকলে সুখী নয় কেন রুডলফ?"

"জানি না। হয়তো উনি চান না।"

"না, তুমি জানো না। ঈশ্বর ভয় পান, সকলে সুখী হয়ে গেলে কেউ আর তাঁকে চাইবে না।"

"কিন্তু কিছু সুখী লোক আছে, তারাও ঈশ্বরের ভজনা করে", আমি প্রতিবাদ করলাম।

"তাই নাকি?" অবিশ্বাসীর সুরে বলে উঠলো ইসাবেল, "তারা ভজনা করে এই ভয়ে, পাছে তাদের সুখ নষ্ট হয়ে যায়। সকলেই ভয় পায়। তুমি ভয় পাও না রুডলফ?"

"পেতাম, যখন যুদ্ধে ছিলাম।"

"না, ওই ভয়ের কথা বলছি না। ওর তো কারণ আছে। আমি বলছি অকারণ অর্থহীন ভয়ের কথা।"

"কীসের? প্রাণের?", আমি জানতে চাইলাম।

ইসাবেল মাথা নাড়লো, "না, আরও আগের ব্যাপার?"

"মৃত্যুর?"

"না"—মাথা নাড়লো ইসাবেল, তারপর গম্ভীর হয়ে গেলো। এই মুহূর্তে ওকে আর পাগল মনে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলে উঠলো, "কথা বলছো না কেন?"

"কথা বলে কী হবে?"

"অনেক কিছু হবে। তুমি কি কথা বলতে ভয় পাও?"

একটু চিন্তা করতেই মনে হলো, সত্যিই তো কথাকে আমরা ভয় করি। কথা দেওয়া, কথা রাখা সব কিছুই আমাদের দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে।

ইসাবেল পাটা গুটিয়ে নিয়ে বললো, "অথচ কথা না বলেও মানুষ বাঁচতে পারে না।"

ক্রমশঃ রাতের নিস্তব্ধতা চারদিক থেকে গাঢ় হয়ে আসছে। কোথেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো অকারণে। আমার বুকের মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠছে।

"তুমি কি আমাকে ভয় পাও", ইসাবেল ফিসফিস করে বললো।

আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, "না, একমাত্র তোমাকেই আমি ভয় পাই না। কারণ তুমিও আমার মতো পৃথিবীর সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাও।"

"কিছু একটা তো বলবে?"

"অনেক সময় কিছুই বলা যায় না ইসাবেল। তখন নিজেই নিজের বাধা হয়ে দাঁড়াই।"

"ছুরী নিজেকে কাটতে পারে না রুডলফ। ভোঁতা হয়ে যেতে পারে, যদি ব্যবহার না করো। তুমি কি তাই চাও?"

"জানি না ইসাবেল?"

"জানবার জন্যে বেশি সময় নষ্ট কোরো না রুডলফ। ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে কথার আশ্রয় নিতেই হবে। কথা অনেকটা প্রদীপের মতো, সব কিছুই অন্ধকার দূর করে দেয়। দেখছো না সব কিছু কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠছে। রক্ত আর লাল নেই। তুমি আমায় সাহায্য করছ না কেন রুডলফ?"

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, ধরা গলায় বলে উঠলাম, "ওগো আমার অচেনা জগতের রহস্যময়ী, আমি যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম!"

ইসাবেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "এসো আমার সঙ্গে। ওরা ডাকছে।"

"কারা?"

"শুনতে পাচ্ছ না? কণ্ঠস্বর। ওরা সব সময় আমায় ডাকে।"

"তোমায় আমি ভালবাসি ইসাবেল।"

আবছা অন্ধকারের মধ্যে একজন নার্স এগিয়ে এলো, "সময় হয়ে গেছে।"

"ওরা আমায় ডাকছে। ওদের তুমি কোনো দিনেও খুঁজে পাবে না। ওরা এতো কাঁদে কেন?" কথা বলতে বলতে ইসাবেলের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ভারী হয়ে এলো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস। ওর প্রায় নেতিয়া পড়া দেহটা কোন রকমে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সোকায় শুইয়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল ও আর বেঁচে নেই। একটা চাকর এসে ওকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

মাদার সুপিরিয়ার দ্বিতীয় বোতল মদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বোদেনদিয়েক খাওয়া সেরেই চলে গেছেন। বসে আছি শুধু আমি আর ডাক্তার ওয়েরনিক।

"যে কেস গুলো সারার নয়, তাদের মেরে ফেলা হয় না কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আপনি মারতে পারবেন?" ডাক্তার পাল্টা প্রশ্ন করলেন। "তা বলতে পারছি না। ধরুন কেউ ধীরে ধীরে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মৃত্যুর দিকে তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তার কষ্টের দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্যে কোনো ইনজেক্শান দেবেন না?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন না।

"ভাগ্য ভাল যে আজ বোদেনদিয়েক নেই। অতএব নৈতিক বা ধর্মীয় কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধে আমার সঙ্গী একটা সৈন্যের পেট এপাশ থেকে ওপাশে পর্যন্ত ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ও বলেছিল ওকে যেন আমরা গুলি করে মেরে ফেলি। আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করার পর ও মারা গেলো। অযথা তিনদিন ওর কষ্ট বাড়িয়ে কী লাভ হয়েছিল আমাদের কে জানে। বহু মানুষকে আমি দগ্ধে দগ্ধে মরতে দেখেছি, আমার মাও তাদের একজন। অথচ সামান্য একটা ইনজেক্শান দিলেই সুরাহা হতো।"

ডাক্তার তখনও চুপ। আমি বললাম, "আমি জানি, কারুর প্রাণ নেওয়া মানে তাকে হত্যা করা। যুদ্ধের পর থেকে একটা মাছিকেও মারতে চাই না আমি। অথচ এই যে মাংস খাচ্ছি, এর জন্য একটা প্রাণীকে তো প্রাণ দিতে হয়েছে। কী বিচিত্র এই জীবনের ধাঁধা। এমনিতে একটা কুকুর বা

অসুস্থ মানুষকে মারতে আমাদের বিবেকে বাধে। অথচ যুদ্ধে লাখ লাখ লোককে অকাতরে মেরে ফেলি লাভ লোকসান না বুঝেই।"

ডাক্তার এবারও মুখ খুললেন না দেখে আমি বলে চললাম, "বোদেনদিয়েক অবশ্য ধর্মপুত্তুর, উনি এখনি বলবেন পশুদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা অন্যায়। কিন্তু তাই কি?......বোদেনদিয়েক সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা অদেখা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। অবশ্য তার কোনো কারণ না দেখিয়ে, তার বক্তব্য বিশ্বাস থাকলেই সব হয়। তবে আমার ধারনা এই সব ভক্তি টক্তির মূলে কিন্তু আসলে একটা জিনিস...... মৃত্যু ভয়। কিন্তু কেন?"

"শেষ হয়েছে?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

"না—তবে আপনাকে প্রশ্ন করতেও যাচ্ছি না আর।"

"ভাল। তার কারণ কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবো না।"

"ঠিক বলেছেন। পৃথিবীর সব লাইব্রেরী ঘাঁটলেও বোধ হয় উত্তর পাবো না।"

বোতলের শেষ মদটুকু দুজনে গ্লাসে ঢেলে নিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন: "যুদ্ধে ক'বছর ছিলেন?"

"তিন বছর।"

"চমৎকার।"

ভাবলাম এবার গতানুগতিক যুদ্ধের প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু তার ধারে কাছে গেলেন না ডাক্তার, "আপনি কি মনে করেন যুক্তি জীবনের একটা অংশ?"

"জানি না। তবে যে সব দুঃস্থ-দারিদ্ররা বুকে হেঁটে চলেছে সমাজের নীচু স্তরে তাদের জীবন আছে বলে কি মনে করেন আপনি?"

"দেখুন আমি বিজ্ঞানী। আমি অতো কিছু জানি না। আমার কাজ শুধু পর্যবেক্ষণ করা। আর বোদেনদিয়েক সব কিছু মেনে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। আর, আপনি এই দুইয়ের মাঝে অনিশ্চয়তার দোলায় দোলেন।"

বুঝলাম ডাক্তার আমার আলোচনা শেষ করে দিতে চাইছেন, তাই বললাম, "ফ্রাউলিন তার হেভেন কেমন আছেন? আগের চেয়ে ভাল?"

"খারাপ। ওর মা এসেছেন কিন্তু মেয়ে মাকে দেখে চিনতে পারলো না।"

"চিনতে চাইলো না।"

"আমিও তো তাই বলছি। মেয়েটা মাকে চিনতে চাইলো না, চিৎকার করে চলে যেতে বললো। ঠিক যেমনটা হয়?"

"তার মানে?"

"তাহলে তো দ্বৈতসত্তার অসুখের ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে হয়; অতো সময় নেই আজ। পরে হবে।"

"আচ্ছা ডাক্তার। ও কি সারবে?"

"মনে তো হয় না।"

"তবে কেন ওকে এখানে অযথা রেখে চিকিৎসা করছেন।"

"পৃথিবীতে অনেক কেন'র উত্তর হয় না।···চলুন আমি একটু ওয়ার্ড দেখতে যাবো, একটা সাদা অ্যাপ্রন পরে আমার সঙ্গে আসুন।"

সেণ্ট্রাল কাফেতে বসে আছি আমরা—আমি, জর্জ আর উইলি। সে রাতে আর বাড়ি ফিরতে না ইচ্ছে করছিল আমার। ডাক্তার পাগলা গারদে যা দেখিয়েছেন তাতেই মন মেজাজ পাল্টে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে, ট্রেঞ্চে, মাঠে, নদীতে, নালাতে, হাসপাতালে বাঁচবার আর মরবার যে সংগ্রাম অহরহ দেখেছিলাম চার বছর আগে, সেগুলোই যেন অন্যরূপে ধপধপে বিছানা ফিসফিসে নির্দেশ আর ফ্যালফেলে দৃষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম পাগলা গারদের ওয়ার্ডে।

"উঠে দাঁড়ান"—হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। এই নিয়ে চারবার। অর্কেস্ট্রায় জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীত বাজান হচ্ছে। এবার আর আমরা দাঁড়ালাম না। কয়েকটা ছোকরা এর আগে তিনবার লাফিয়ে অর্কেস্ট্রার মঞ্চে উঠে পড়ে জাতীয় সঙ্গীতের ধুনটা বাজাতে হুকুম দিয়েছে। তিনবারই আমরা দাঁড়িয়াছি।

একটা বছর সতেরোর ছেলে আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "উঠে দাঁড়ান।"

"দূর হ···স্কুলে গিয়ে পড়গে যা", আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম।

"বলশেভিক!" ছেলেটা না জেনেই চেঁচিয়ে উঠলো, "বন্ধুগণ আমাদের মধ্যে কিছু বলশেভিক বসে আছে।"

ছেলেগুলো অকারণে উগ্র স্বদেশ প্রেম দেখাচ্ছিল। প্রায় ডজনখানেক ছেলে চলে এসেছে আমাদের টেবিলের চার পাশে।

"দাঁড়ান, নয়তো ঝঞ্ঝাট হবে।"

"কীসের ঝঞ্ঝাট?" উইলি জানতে চাইলো।

"সেটা নিজের চোখেই দেখবেন। কাপুরুষ দেশদ্রোহী, দাঁড়ান উঠে।"

"দূর হয়ে যা। আমরা কি তোদের মতন কচিখোকার কথায় উঠবো-বসবো নাকি?" এবার জর্জ গর্জে উঠেছে।

একজন বছর ত্রিশের ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলেন, "জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি আপনাদের কি কোনো শ্রদ্ধা নেই?"

"আছে। তবে হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে এভাবে নয়। দেশপ্রেমের প্রমাণ আমরা ট্রেঞ্চে দিয়ে এসেছি", জর্জ বললো।

"ও কথা সবাই বলে। প্রমাণ কি?"

উইলি উঠে দাঁড়ালো, বিশাল চেহারা তার। বাঁ পাটা তুলে দেখালো, পেছন দিকে কামানের গোলা লাগার চিহ্ন। ও কিন্তু পাটা তুলেছিল একটা ছেলের মুখ লক্ষ্য করে। হাঙ্গামা বাঁধতে যাবে এমন সময় ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূতের মতো হাজির হলো বোদো লেডার হোস। চামড়ার ব্যবসা করে, ঝানু লোক, যুদ্ধে আমাদের সঙ্গেই ছিল। "আমি এতোক্ষণ সব লক্ষ্য করছিলাম। আমার ক্লাবের ছেলেরা কাছেই আছে। এরা যদি গণ্ডগোল করতে চায় বলবে, আমি আছি।"

ততক্ষণে দোকান মালিক হাত কচলাতে কচলাতে এসে হাজির, "আমার দোকানে এসব চলবে না। যা করার বাইরে গিয়ে করুন।" ততক্ষণে অর্কেষ্ট্রায় অন্য সুর বাজাতে শুরু করেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি যে ছোকরার দল চেন, পাথর আর লাঠি নিয়ে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে বোদোও তার দলকে ডাকলো।

"আচ্ছা পরে দেখে নেবো", ছোকরার দল শাষিয়ে চলে গেলো।

উইলি হেসে বললো, "নিশ্চয়ই, তবে দলে আরো একটু ভারী হয়ে এসো।"

বোদোর ক্লাবের সঙ্গে আমরা হাটতে লাগলাম। আকাশে অসংখ্য তারা। দোকানগুলোর জানলায় আলোর বন্যা। যুদ্ধের সঙ্গীদের সঙ্গে পথ হাঁটতে খারাপ লাগে না মাঝে মাঝে অতীতের স্মৃতি গুলো ভেসে ওঠে।

"অন্যকোনো রেষ্টুরেণ্টে যাবে নাকি?" বোদো জানতে চাইলো, "আমাদেরটায় গেলে চলবে কি? ওখানে ঐ রকম বাঁদর নেই। চলো।"

এখানে কফি, বীয়ার, আইসক্রীম পাওয়া যায়। ওপরতলায় হলঘর, সেখানে সভাটভা বসে বিভিন্ন ক্লাবের। বোদোর ক্লাবটা হল গানের ক্লাব। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে ওদের সভা হয়। শহরে এখন এই ধরনের অসংখ্য ক্লাব গজিয়ে উঠেছে।

"সমবেত সঙ্গীত গাইবার লোক আমাদের আছে", বোদো বললো, "শুধু চড়া সুরে গাইবার গায়ক আমাদের নেই। যুদ্ধের সময়ে বোধ হয় সকলে মারা গেছে। এখনকার ছোকরাদের গলার আড় ভাঙ্গে নি এখনও।"

"উইলি চড়া সুরে গান গায়", আমি বললাম।

"সত্যি?" দারুণ খুশিতে চকচক করে উঠলো বোদোর মুখ, "একটা গাও তো উইলি।"

বোদো মিষ্টি সুরে একটা গান গাইলো। উইলি সঙ্গে সঙ্গে চড়া সুরে ওটা গেয়ে দিলো। "খাসা গলা", বোদের মন্তব্য, "আচ্ছা এটা দেখাও তো?" দ্বিতীয় বারও উইলি পাশ মার্ক পেলো।

"আমাদের ক্লাবের সদস্য হয়ে যাও", বোদো জোর দিয়ে বললো, "পরে যদি পছন্দ না হয় ছেড়ে দিও।"

উইলি প্রথমে একটু ইতঃস্ততঃ করলো, পরে আমাদের চমকে দিয়ে রাজী হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ক্লাবের কোষাধক্ষ্য করে নিলো ওরা। এর ফলে ও আমাদের বীয়ার, মটরসুঁটির স্যুপ আর শূয়োরের মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করলো।

বেশ গল্প জমে উঠলো, এক সময়ে উইলি বলে বসলো ওর পরিচিত এক মহিলা আছেন যিনি একই সঙ্গে মিষ্টি সুরে আর পুরুষদের মতো চড়া সুরে গান গাইতে পারেন। ও রেনী দ্য লা ত্যুরের কথা বলতে চাইছিল। বোদোরা তো দারুণ খুশি। রেণীর অনুপস্থিতিতেও তাকে সম্মানিত সদস্য করে নিলো।

এরকম একজন শিল্পীকে নিয়ে ও অন্য দলগুলোকে কী ভাবে হারিয়ে দেবে তাই ভেবে আনন্দে মশগুল।

কিছুক্ষণ পরে আমি আর জর্জ উঠে পড়লাম। উইলি জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ আমাদের ওপর নজর রাখলো। নাঃ, কেউ আমাদের আক্রমণ করতে আসে নি।

বাজার এলাকা এখন শান্ত। মিষ্টি সুরের গান ভেসে আসছে কোত্থেকে যেন। "আচ্ছা জর্জ, তুমি কি সুখী?"

জর্জ ক্রল তার উত্তর না দিয়ে বললো, "আচ্ছা তার আগে তুমি বলোতো ছুঁচের ডগায় মানুষ কতোক্ষণ বসে থাকতে পারে?"

॥ ১১ ॥

আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রীষ্মের গরম যেন শীতের স্রোতে ভেসে যেতে বসেছে। ডলারের দাম এক লক্ষ্য কুড়িহাজারে দাঁড়িয়ে। আমাদের ছাদের নালীর একটা অংশ হুম্ করে ভেঙ্গে পড়লো।···এর মধ্যে ছোটো খাটো দু-একটা বিক্রি আমি করে ফেলেছি। এক বিধবার দুটো বাচ্চা ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেছে। পাশের ঘরে জর্জ কাসছে তারও ঐ রোগ হয়েছে। এ এক মারাত্মক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা। এক বোতল মশলা মেশানো গরম মদ দিয়ে রেখেছি ওর টেবিলের পাশে। ও খোশ মেজাজে নানাধরণের ম্যাগাজিন পড়ছে।

চির-অক্লান্ত হাইনরিখ এসে হাজির। "কয়েকটা অর্ডার হয়েছে, সেগুলো লিখে রাখবে কি?"

"নিশ্চয়ই। বলতে শুরু করো", আমি জানালাম। লেখানোর পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো হাইনরিখ। আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, "এ ভাবে যদি আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে বলে রাখছি আমাদের দেউলিয়া হতে আর বেশি দেরী হবে না।"

ওকে রাগাবার জন্যে আমি শুধু বললাম, "দেউলিয়া"?

"হ্যাঁ হ্যাঁ···আমি কি বলতে চাইছি তা তুমি জানো।"

"সত্যি ?···তাহলে নিজের হয়ে এতো ওকালতী করছ কেন ? সবাই তোমাকে বিশ্বাস করে···।"

"ওকালতী ?···উসট্রিনজেনে কী হয়েছে জানো ?"

"ওরা কি খুনীটাকে খুঁজে পেয়েছে ?" আমি সুধোলাম। "খুনী···তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক ?", বেশ রেগেছে হাইনরিখ, "ওটা তো দুর্ঘটনা মাত্র। আমি বলতে চাইছি মেয়রের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের কথাটা। শুধু তাই না, ছুতোর মিস্ত্রির বিধবাকে তোমরা নাকি বলে এসেছ বিনা পয়সায় কবরের পাথর দেবে ?"

ওর কথার উত্তর দেওয়া মানে বাজে তর্ক করা। আমি জানলার দিকে তাকালাম, যেন বৃষ্টি দেখতে মত্ত। হাইনরিখের মতো লোকেরা নিজের বুদ্ধির ওপর বড় বেশি নির্ভর করে। করুক। অন্যদের ঘাড়ে তার বোঝা না চাপালেই হলো। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাইনরিখ নিজের থেকে বলতে শুরু করলো কী ভাবে মেয়রকে ও বুঝিয়েছে। এবং এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যেই। এবার ঐ গ্রাম থেকে কিছু অর্ডারও পাওয়া যাবে।

আমি সব শুনেটুনে বেশ উদাসীন ভাবে বললাম, "তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত ? তোমাকে পূজো করা ?"

"দ্যাখো, তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।"

"তাই নাকি ? কতোটা ?" আমার গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

"ভুলে যেও না তুমি এখানকার কর্মচারী মাত্র।"

"ওটা আমি সব সময়েই ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তা না হলে তিনগুণ মাইনে আদায় করে ছাড়তাম তোমাদের কাছ থেকে। নক্‌শা করি, ম্যানেজারী করি, বিজ্ঞাপনও দেখি।···আমি তোমাদের এক-পায়ে-খাড়া থাকা চাকর নই। তা যদি বলো তো দেখিয়ে দেবো হোলমান অ্যাণ্ড ক্রেংজে আমাকে এখুনি লুফে নেবে।"

হঠাৎ দরজা খুলে জর্জ ঢুকলো, পরনে লাল সাটিনের পাজামা, "তুমি কি উসট্রিনজেনের কথা বলছিলে হাইনরিখ ?"

"তাছাড়া আর কি ?"

"তাহলে চলে যাও মাটির তলায় ভাঁড়ার ঘরে, চুপ করে এক কোনে দাঁড়িয়ে থাকো।···একটা খুন হয়ে গেছে, একজনের সংসার ভেসে গেছে, সেটা বড় কথা না, তোমার কাছে বড় কথা হলো মেয়রের সঙ্গে ভদ্রতা করা ?" দারুণ ক্ষেপেছে জর্জ, তার মুখ থেকে মশলা-মেশানো মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। হাইনরিখের দিকে দুপা এগোতেই ভয়ে পিছিয়ে গেল, "এই কাছে আসবে না বলছি। তুমি আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা না ধরিয়ে ছাড়বে না দেখছি। যদি দুইজনেই এক সঙ্গে বিছানায় পড়ি তাহলে কি হবে বলোতো ?"

দুই ভাইয়ের ঝগড়া প্রত্যক্ষ করছিল আর একজন : লিসা—একটা ছাপা ড্রেসিং গাউন পরে ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রায় জোর করে হাইনরিখকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো, "যাও ভাল করে কুলকুচো করো ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। আমিও জর্জকে জোর জবরদস্তি করে শুতে পাঠালাম।

"যাও, যাও, শুয়ে পড়ো, ভীষণ ঘেমে গেছো।"

"ঘাম হওয়া ভাল, দেখছো না আকাশও ঘামছে। আর রাস্তার ওপারে জীবনের আর এক সজীব নমুনা···বুক খোলা ড্রেসিং গাউন, মুক্তোর মত দাঁতের সারি···অথচ কি জীবন কাটাচ্ছি আমরা···কবরের জিনিসপত্র বেচে চলেছি···বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারি না আমরা।··· পারি না সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।···" কথাগুলো শেষ করতে করতে জর্জ এগিয়ে এসেছিল জিনের বোতলটা নেবার জন্যে।

"দাঁড়াও, এটা এভাবে খেয়ো না। মশলা মিশিয়ে গরম করে দিই, তারপর খাও।"

স্টোভের নীল শিখাগুলো দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। অল্পক্ষণের মধ্যে মদটা গরম হয়ে উঠলো। লেবু আর মশলার গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে।

কে যেন আসছে। সরকারী কবরখানার কবরখানকে লাইবেরমান ঢুকলো। চারপাশে নজর বুলিয়ে নিয়ে বুক ভরে গরম মদের নিঃশ্বাস নিলো। লাল পাজামা পরা জর্জের দিকে তাকিয়ে বললো, "জন্মদিন ?"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা।"

"অভিনন্দন।"

"অভিনন্দন কেন?" জর্জ আশ্চর্য হয়েছে।

"ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যবসা বাড়ায়। বাইরে তার প্রমাণ আছে। অনেকে মারা যাচ্ছে।"

লাইবেরমানের বয়স আশির কোঠায়, বেশ হাসিখুশি লোক। আমি বললাম, "লাইবেরমান, আমরা ব্যবসার আলোচনা করছি না। জর্জের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তার জন্যে ব্যবস্থা নিচ্ছি। এক গ্লাস ওষুধ চলবে নাকি?"

"আমি শুধু জিন খাই।" তাই দেওয়া হলো। এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে লাইবেরমান ব্যাগ থেকে চারটে বড়সড়ো ট্রাউট মাছ বের করে টেবিলে রাখলো—"উপহার।"

চারটে মাছ টেবিলে শুয়ে, তাদের ফ্যাকাশে চোখে মৃত্যুর চিহ্ন প্রকট হয়ে আছে।

"দুপুরের খাওয়াটা ভালই হবে। বিশেষ করে তোমার জন্যে জর্জ। আজ হালকা খাওয়াই ভাল।"

মাছগুলোকে রান্নাঘরে রেখে এলাম। শ্রীমতী ক্রল বেশ খুশি "মাখন আর সেদ্ধ আলু দিয়ে খেতে ভালই লাগবে"—তিনি জানিয়ে দিলেন।

রান্নাঘরে ঢুকলেই আমার মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ঝক্‌ঝকে বাসন-পত্র। কেৎলী হিস্ হিস্ করছে। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর গন্ধ মনকে মাতাল করে তোলে।

লাইবেরমান কয়েকটা ঠিকানা এনেছে। সত্যিই ইনফ্লুয়েঞ্জাতে বেশ লোক মরছে। যুদ্ধের পর থেকে মানুষের যেন দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে। ঠিকমতো খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ আমার মনে হলো এই চাকরিটা পাল্টাতে হবে। মৃত্যু জিনিষটাই এখন আমার কাছে অসহ্য লাগে।

জর্জ ইতিমধ্যে একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে এসেছে। দারুণ ঝকমকে

রঙ। জর্জ বাড়িতে থাকলে রঙীন জিনিষ পছন্দ করে। ইসাবেলের একটা কথা মনে পড়ে গেলো, সঠিক না হলেও এই ধরণের—এই পরিবেশে আমার ঈশ্বরের কয়েক ইঞ্চি কাছে ঘনিষ্ঠতর হতে পারছি।

ওয়ালহাল্লা হোটেলে কবিদের আড্ডাখানায় কাঠের পার্টিশান দিয়ে ঘেরা ছোট একটা জায়গা। বাইরের তাকের ওপর গ্যেটের একটা আবক্ষ মূর্তি, অনেক জার্মান কবি সাহিত্যিকের ছবি দেওয়ালে ঝোলানো। এখানে শহরের বুদ্ধিজীবী আর কবিরা মিলিত হন প্রতি সপ্তাহে। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকও আছেন। যার লেখা ছাপা হয় তাঁর কাগজে তারা খুব তোষামোদ করে, যাদেরটা ছাপা হয় না তারা নাক কুঁচকোয়। উনি অবশ্য দুটোই গায়ে মাখেন না। পাইপ টানেন, তর্কে অংশ নেন। তবে সবাই তাঁর ব্যাপারে একটা বিষয়ে এক মত—সম্পাদক মশাই আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই খোঁজ খবর রাখেন না।

কিছু জেলা জর্জ, পেনসন প্রাপ্ত পদস্থ সরকারী কর্মচারী, শিল্পী, গায়করাও আসেন এখানে। আর্থার বাউয়ারও আসে।

আজও এসেছে, ম্যাথাই গ্রুণ্ড তাকে খুব তেল দিচ্ছে, যদি ওর "বুক অফ ডেথ" বইটা আর্থার ছাপে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এডুয়ার্ড নবলক এলো, চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমাকে চমকে দিয়ে আমার পাশেই বসে পড়লো। সেই ঘটনাটার পর থেকে আমি একটু এড়িয়ে চলছিলাম ওকে। "কেমন চলছে?"

"চমৎকার।" আমি বললাম।

"কিছু কবিতা লিখেছি। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না।"

"কেন? আপত্তি হবে কেন?"

"না, মানে কবিতাগুলোর নাম দিয়েছি গার্দা…।"

"যা খুশি নাম দেবে," বলতে গিয়ে আমি থেমে গেলাম, "গার্দা বললে না? তা গার্দা কেন? গার্দা স্নিডার?"

"না, না, শুধু গার্দা।"

আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো, "এর মানে কি? কি বলতে চাইছ তুমি?"

এডুয়ার্ড মেকী হাসলো; "কিচ্ছু না, শুধু কাব্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। কবিতায় সার্কাসের কথা আছে।"

"বাজে কথা ছাড়ো তো এডুয়ার্ড। আসল কাথাটা বলে ফেলো তো, জোচ্চোর কোথাকার?"

"জোচ্চোর," এডুয়ার্ড কৃত্রিম রাগের ভাব দেখালো—"বলতে গেলে জোচ্চোর তো তুমিই। তুমি আমাকে বুঝিয়ে ছিলে ও সেই উইলির বান্ধবী রেণীর মতো গাইয়ে মেয়ে।"

"কক্ষনো না। ওটা তুমি ধরে নিয়েছিলে।"

"যাইহোক। পরে আমি খোঁজখবর নিলাম। তুমি মিথ্যোবাদী; মেয়েটা গানই জানে না। 'সার্কাসের মেয়ে।'

"এতো সব জোগাড় করলে কোত্থেকে?" আমি হুল না ফুটিয়ে পারলাম না।

"হঠাৎ মাদমোয়াজেল স্পিডারের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। তা দেখা করায় কি দোষ আছে।" খুব ভাল মানুষের মত মুখ করে বললো এডুয়ার্ড। আমার সন্দেহ বাড়ছে—"শোনো এডুয়ার্ড, গার্দার মতো মেয়েকে কবিতা দিয়ে ভোলানো যায় না।"

এডুয়ার্ড কিন্তু চটলো না। ভাব দেখাচ্ছিল ও শুধু কবি নয়, একটা বড় রেস্টুরেন্টের মালিকও বটে। আর এটাও জানি শেষেরটার জন্যে গার্দার দুর্বলতা থাকতে পারে।

"হতচ্ছাড়া..." রাগে গরগর করে উঠলাম আমি, "তবে কোনোলাভ হবে না তোমার। গার্দা কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে।"

"না, যাচ্ছেন না," একমুখ হেসে এডুয়ার্ড জানালো, "ওঁর কন্ট্রাক্টের মেয়াদ আজই বাড়ানো হয়েছে।"

হাঁ হয়ে গেলাম আমি, "তাহলে আজই তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?"

সামান্য তোতলালো এডুয়ার্ড..."হ্যাঁ...মানে, হঠাৎ...আজকেই...দেখা হয়ে গেলো।"

ওযে মিথ্যে বলছে এটা মুখে চোখে ফুটে উঠলো। "এবং তাই কবিতা উৎসর্গ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছো," না বলে থাকতে পারলাম না।

আমি, "তা কবিতা কি পাঠানো হয়ে গেছে যথাস্থানে?" তবে বলে রাখছি একটা কথা। গার্দার একটা যমদূতের মতো ভাই আছে, বোনকে ভীষণ ভালবাসে। এর আগে দুজনকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে বোনকে বিরক্ত করার জন্যে।"

"যতোসব বাজে কথা," এডুয়ার্ড মুখে বললেও, মনে মনে সে ভয় পেয়েছে সেটা ওর চোখ দেখে বোঝা গেলো।

কবি হানস হান্‌কারমান পাশে এসে বসলেন। উনি বেশ কয়েকটি কবিতার বই, নাটক লিখেছেন, সব কটিই অবশ্য অপ্রকাশিত এখনো পর্যন্ত।

"লেখাটেখা কেমন চলছে বন্ধু?" উনি জিজ্ঞেস করলেন, "অটো বামবাসের একটা নোংরা লেখা বেরিয়েছে, পড়েছ নাকি? আর্থার বাউয়ার নচ্ছারটা আবার ওটা ছেপেছে?"

অটো বামবাস আমাদের শহরের সবচেয়ে নামকরা কবি। সকলেই ঈর্ষা করি ওকে। গ্রাম্যপথ, নদী, ঝরনা, মাঠ নিয়ে কবিতা লেখে। আর্থার ওর দুটো চটি বইও ছেপেছে। হান্‌কারমান মনে মনে অটোকে ঘেন্না করে। অথচ অটোর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

"একটু আগে তোমরা সার্কাসের ঐ মেয়েটার কথা বলছিলে না? ওকে আমি চিনি।" হান্‌কারমানের কথা শুনে মনে হলো গার্দার গুরুত্ব কম নয়, ওকে নিয়ে কবিতা লেখা চলে।

আরও অনেকের সঙ্গে আলাপচারি হলো, কিন্তু আমার মনের কাঁটাটা খচখচ করতেই থাকলো।

॥ ১২ ॥

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বিরাট কালো কাকের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসলেন বোদেনদিয়েক। বেশ খোশ মেজাজে বললেন, "এই যে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত আছো তো?"

"নজর রেখে চলেছি," আমি উত্তর দিলাম।

"আহারে, দার্শনিক। তা শেষ পর্যন্ত কি পেলে?"

ভাল করে ওঁকে দেখে নিয়ে আমি না বলে থাকতে পারলাম না, "এটাই জানতে পারলাম যে গত দুহাজার বছরে খ্রীষ্টধর্ম পৃথিবীর তেমন কোনো মঙ্গল করতে পারে নি।"

মুহূর্তের জন্যে তাঁর প্রসন্নতার ভাবটা কেটে গিয়ে কঠোর হয়ে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার শান্ত হয়ে গিয়ে বললেন, "এই ধরনের মন্তব্য করার ব্যাপারে নিজেকে কি অপরিণত মনে করো তুমি?"

"করি, তবে এই বয়সের ব্যাপারটা তুলে কাউকে দোষ দেওয়াটা খুব একটা দুর্বল যুক্তি নয় কি? অন্য কিছু বললে ভাল হয় না?"

"বলতে পারি। তবে উদ্ভট কথা বললে তার প্রতিবাদ করার দরকার দেখি না। সাধারণ মন্তব্য করে কোনো কিছুকে বোঝাবার চেষ্টা করাটা কি অর্থহীন নয়?"

"হ্যাঁ। কথাটা আমি বলেছিলাম এই জন্যে যে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তাছাড়া একটা গূঢ় ব্যাপারও আছে। ইদানীং তো আমি খুব ইতিহাস পড়ছি।"

"কেন? সেটাও কি বৃষ্টি পড়ার জন্যে?"

খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না আমি, "কারণ আমি কিছুতেই আর হতাশার মধ্যে ডুবতে চাই না, পৃথিবী সম্বন্ধে কুশ্রী ধারনা করতে চাই না। ঈশ্বরে অন্ধ ভক্তি রাখলেও আমরা কেউ চোখ বুজে একটা বড় সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারছি না যে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এবং আপনাদের মতো শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদের আমি দেখেছি, অবশ্য সবাই নয়, দেখেছি বেদীর সামনে ক্রুশ চিহ্ন নেড়ে নেড়ে যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।"

বোদেনদিয়েক টুপির জল মুছতে মুছতে বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুপথ-যাত্রী মানুষকে আমরা শেষ সান্ত্বনা জানাই—একথা ভুলে যেও না।"

"অতোদূর যাবার কি দরকার আপনাদের। তার চেয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে কি আপনারা বোঝাতে পারেন না যে যুদ্ধে যেও না। যুদ্ধের সময় কয়েকবার গির্জায় গেছি। দেখেছিলাম যাজকরা আমাদের সাফল্যের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। আপনার কি ধারনা

যীশুর কানে সেকথা পৌঁছেছিল?"

এরপরেই বোদেনদিয়েকের সঙ্গে আমার বেশ তর্ক শুরু হয়ে গেলো। বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের ধ্যানধারনা কেমন? ইতিহাস পড়লে সত্যিই কি কিছু জানা যায়? আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী খ্রীষ্টানদের মুছে ফেলার জন্যে গির্জা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কেন? "তুমি কি এদের সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করেছ নাকি?"

"করেছি; এবং জেনেছি খৃষ্টানদের জন্যে এদের সহ্যশক্তিই ছিল সবচেয়ে বেশি। এখন সার বুঝেছি সহ্যশক্তিই সবচেয়ে বড় জিনিষ।"

"তাই নাকি।" বোদেনদিয়েক বেশ রেগেছেন। তারপর হঠাৎ জোরে হেসে উঠে বললেন, "শোনো হে বোদমার এই দুহাজার বছরে বহু সল বদলে গিয়ে পল হয়ে গেছেন। এবং তোমার মতো সামান্য মানুষেরা এইভাবে তর্কও চালিয়ে এসেছে যুগযুগান্ত ধরে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তুমি যে পথ দিয়েই খুশি এগোও না কেন, দেখবে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বর।"

কথাগুলো বলেই বোদেনদিয়েক ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও উপাসনার পর ইসাবেলকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে গেলাম। ঘন গাছপালার জন্যে বৃষ্টি ততো জোরে পড়ছে না, তাছাড়া কমেও এসেছে। ইসাবেল একটা কালো বর্ষাতি পরেছে। বোদেনদিয়েকের সঙ্গে তিক্ত আলোচনার কথা ভুলে গেছি ইসাবেলের সান্নিধ্যে এসে। বৃষ্টির জন্যে ঠাণ্ডা থাকলেও ওর দেহের উত্তাপ আমি আমার মন দিয়ে অনুভব করতে পারছি।

হঠাৎ ইসাবেল দাঁড়িয়ে পড়লো, "তুমি আমাকে তেমন ভালবাস না?"

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম, "এর চেয়ে বেশি ভালবাসা যায় না, আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

"না, যথেষ্ট না। সেরকম ভালবাসো না তুমি। তেমন ভাবে না।"

"সেদিক দিয়ে ঠিক বলেছ চরমভাবে ভালবাসা যায় না। পৃথিবীতে বড় দুঃখ, বড় কষ্ট।..."

"না, তা নয়। সেরকমভাবে ভালবাসলে আমরা দুজনে আলাদা কেন?"

"ওহ...তুমি বলছো তাহলে আমরা এক হয়ে যেতাম?"

ইসাবেল শুধু ঘাড় নাড়লো। হঠাৎ জর্জের একটা কথা আমার মনে পড়ে গেলো, "আমাদের সবসময়েই আলাদা হয়ে থাকতে হবে, তবে আমরা পরস্পরকে ভালবেসে এক হয়ে গেছি এই বিশ্বাস নিয়ে থাকবো।"

"তুমি কি মনে করো কোনো এক সময়ে আমরা দুজনে এক ছিলাম?"

"জানি না। ও ভাবে জানাও যায় না। ছিলাম কিনা তা মনে রাখা সম্ভব না।"

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ইসাবেল বললো, "ঠিক বলেছ রুডলফ, মানুষ মনে রাখতে পারে না। কিছুই না, কিন্তু কেন? তুমি শুধু খুঁজে চলো, খুঁজেই চলো। সব কিছু চলে যায় কেন? শুধু মনে থাকে অনেক কিছু ছিল। এরকম হয় কেন? বলো না রুডলফ।"

দমকা বাতাসের সঙ্গে জলের ছাট এসে খানিকটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো আমাদের। সত্যিই, মাঝে মাঝে এক-একটা ঘটনার সামনে পড়লে মনে হয় এটা বহুকাল আগে ঘটে গিয়েছিল। ঠিক কোথায় এবং কখন তা অবশ্য মনে পড়ে না। "মনে রাখা যায় না ইসাবেল। এটা অনেকটা বৃষ্টির মতো। অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলে জল হয়েছে, কিন্তু সেই জলের ফোঁটা কি মনে রাখতে পারে অক্সিজেন-হাইড্রোজেনকে আলাদা আলাদা ভাবে? এখন ওরা শুধু বর্ষার জলধারা, অতীতকে মনে পড়ে না তাদের?"

"কিংবা চোখের জলের মতো," ইসাবেল বললো, "কিন্তু চোখের জলে মিশে থাকে স্মৃতির বেদনা।"

এরপর অনেকক্ষণ কথা না বলে দুজনে শুধু হাঁটতে লাগলাম। সঙ্গী বলতে পায়ের তলায় পাথরের নুড়ির শব্দ। পাঁচিলের বাইরে গাড়ীর হর্ন বাজাচ্ছে কেউ, শেষ ডাকেও সাড়া দিচ্ছে না।

"তাহলে এটা মৃত্যুর মতো", ইসাবেল যেন শেষ কথাটা বললো।

"কোনটা?"

"ভালবাসা। প্রকৃত প্রেম।"

"কে জানে ইসাবেল? মনে হয় কেউ সঠিক কথাটা বলতে পারবে না। আমরা যতক্ষণ 'আমি' হয়ে আছি ততক্ষণ সব বুঝতে পারি, সেই বৃষ্টির জলের মতো এক হয়ে যায়, আমাদের 'আমি গুলো' হারিয়ে যায়।"

"কিন্তু প্রেম যদি সত্যিকারের হয় তবে আমরা দুজনে মিশে গিয়ে এক হয়ে যাবো, অনেকটা মৃত্যুর মতো।"

"হয়তো।...তাই বলে আমরা কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো না। মৃত্যু কি তা তো কেউ জানে না। ফলে তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনাও করা চলে না। তবে আমাদের আগেকার সত্তাটাকে হারিয়ে ফেলে আমরা আবার একা হয়ে যাই।"

"তাহলে প্রেম কি সব সময়েই অপূর্ণ থেকে যায়?"

"না পূর্ণ তো বটেই," আমার মধ্যে আবার স্কুলমাস্টার জেগে উঠছে।

"ছাখো রুডলফ, প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেও না। অপূর্ণ হতে বাধ্য। তা যদি না হয় তবে একটার পর একটা বিদ্যুৎ চমকায় কেন?"

"কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায় অবশ্য, তবে সেটা অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হয়।"

"মৃত্যুর মতো?"

"ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মৃত্যুর অন্য কোনো নাম আছে। আমরা তো শুধু এক তরফা দেখছি। হয়তো এটাই ঈশ্বর আর আমাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রেম।"

"তাই কি ভালবাসা এতো বিষাদময়?" ইসাবেল মুখ থেকে জলের কণা মুছে বললো।

"বিষাদময় তো নয়। পূর্ণতা লাভ করে না, বা ধরে রাখা যায় না বলে আমরা দুঃখ পাই।"

"কেন রুডলফ? এরকম হবেই বা কেন?"

"এটাই আমাদের নিয়তি।"

"নিয়তি?" ইসাবেল যেন মানতে রাজী না।

"হ্যাঁ।"

"হতে পারে না। এটাই দুঃখ," কথাটা শেষ না করে ইসাবেল আমার কাঁধে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

"কাঁদছ কেন? এতে কান্নার কিছু নেই। অনেক কিছুর জন্যে অনেক কিছুকে তো আমরা বিসর্জন দি। না দিয়ে উপায় থাকে না।" কথাটা

ইসাবেলকে বললাম বটে তবে মনে হলো কতোবার আমি আমাকে অনেক কিছুর জন্যে অকাতরে বিসর্জন দিয়েছি। কেন দিয়েছি, তার কোনো কারণ তখন বুঝতে পারি নি। আবার মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় সব কিছুই তো বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে।

ঘন্টা বেজে উঠলো, ইসাবেল বললো, "চলো যাবার সময় হয়েছে।"

"চলো, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে আসছো ?"

"হ্যাঁ ইসাবেল।"

দরজার কাছে এসে ইসাবেল বললো, "এসো আমার সঙ্গে।"

আমি মাথা নাড়লাম, "না। আজ নয়।"

কোনো কথা না বলে ইসাবেল আমার দিকে তাকালো, দৃষ্টিতে হতাশা নেই, বরং ও যেন আমায় ভর্ৎসনা করছে। আমি যেন নিজের অজান্তে একটা শিশুকে আঘাত করে ফেলেছি বা একটা চড়াই পাখিকে মেরে ফেলেছি।

অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে বললাম, "আজ না কাল।"

ইসাবেল চলে গেলো। কয়েক পা এগোবার পরই দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে: "ফ্রাউলিন তার হোভেনকে পৌঁছে দিয়ে এলেন কি ?"

"হ্যাঁ।"

ভালো···ভালো···মাঝে মাঝে ওকে একটু দেখবেন। আপনার সঙ্গে কাটাবার পর ওর মন মেজাজ অনেকক্ষণ ভাল থাকে।"

"ও তো আমাকে অন্য লোক ভাবে।"

"তা ভাবুক। আমি আপনার জন্যে চিন্তা কল্পি না, আমার রোগিনী ভাল হলেই হলো।" একটু চোখ কুঁচকে ডাক্তার আবার বললেন, "আজ সন্ধ্যেবেলায় বোদেনদিয়েক আপনার প্রশংসা করছিলেন।"

"আমার ? সে রকম তো কারণ দেখছি না।"

"ওর বক্তব্য আপনি এবার সঠিক পথে ফিরে আসছেন।"

"কী আশ্চর্য···" আমার মুখ দিয়ে আর অন্য কথা বের হলো না।

···শহরে ফিরছি। মন থেকে ইসাবেলের চিন্তা দূর করা সম্ভব হচ্ছে

না। ওকে যেন আমি ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে এসেছি।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে পৌঁছে গেলাম জুতো ব্যবসায়ী কার্ল ব্রিলের বাড়ী। গ্রামোফোনের শব্দ ভেসে আসছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় এখানে একটা আসর বসবে, তাতে আমারও নেমন্তন্ন আছে। আজকের আসরে ফ্রাউ ব্রেকমান তাঁর বিখ্যাত খেলাটা দেখাবেন। দ্বিধা করতে করতে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

তামাক আর বীয়ারের গন্ধে ভরপুর। কার্ল ব্রিল আমাকে জড়িয়ে ধরলো, এখনি ওর পা টলছে। "ঠিক সময়ে এসেছ হে।—বাজীর টাকা পড়ে গেছে। এখন শুধু একটু ভাল গানবাজনা চাই। গ্রামোফোনটা একঘেয়ে লাগছে। "ব্লু দানিয়ুব' বাজাবে।"

"বাজাবো।"

পিয়ানো আনানোই ছিল, টুলে বসে পড়লাম। এক বোতল বীয়ার রাখা! পাশে ভুলোয় মোড়া একটা বড় পেরেক, আর হাতুড়ি।

বাজনা শুরু হলো। বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় কার্ল ব্রিল আমার কাছে এলো, "ক্লারা তৈরী হচ্ছে। আজ ত্রিশ লাখের মতো বাজীর টাকা উঠেছে। এখন একমাত্র প্রার্থনা ও যেন দারুণ খেলা দেখায়। তা নাহলে কালকে আমি আধাদেউলে হয়ে যাবো।"

কার্ল চোখ টিপলো, "ঐ সময়ে খুব জবরদস্ত কিছু বাজিয়ো, যাতে ক্লারার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তুমি তো জানো ও গান-পাগলা।"

"ঠিক আছে যুদ্ধের বাজনা বাজাবো," আমি বললাম, "কিন্তু আমার জন্যে একটা সাইড বাজী ধরলে হয় না?"

"কী যে বলো? তুমি নিশ্চয়ই ক্লারার বিরুদ্ধে বাজী ধরতে চাও না?"

"না, ওর হয়ে।"

"কতো?" চট করে জিজ্ঞেস করলো কার্ল।

"মাত্র আট হাজার। ওতেই আমার ভাগ্য ফিরবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে কার্ল ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "কেউ কি আমাদের এই পিয়ানো-বাজিয়ের বিরুদ্ধে আশি হাজার বাজী ধরতে রাজী আছেন।"

"আমি", একটা মোটা লোক এগিয়ে এসে একগোছা নোট রাখলো বেঞ্চের ওপর। আমিও আমার টাকা রাখলাম তার পাশে। "জুয়ার দেবতা যেন আমায় কৃপা করেন, তা নাহলে কাল খাওয়া জুটবে না।"

"তাহলে শুরু করা যাক", কার্ল ব্রিল বললো।

পেরেকটা সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হলো। দেওয়ালের কাছে গিয়ে, পাছা বরাবর উচ্চতায় পেরেকটাকে পুঁতে দিলো কার্ল। তিন ভাগের এক ভাগ ঢুকেছে। তারপর যেন ভীষণ জোরে চাপ দিচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে বললো, "ভাল ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, কেউ দেখতে চাইলে দেখতে পারেন।"

মোটা লোকটা এগিয়ে এলো, সামান্য টানাটানিতে পেরেকটা খুলে বেরিয়ে পড়লো, "বুঝেছ কার্ল," মোটা বলতে লাগলো, "আমি তো ফুঁ দিয়ে ওটা খুলে ফেলতে পারি। এতো টাকার বাজীর কি দরকার ?"

কার্ল রেখেছে, "দেখো, হাত দিয়ে ঠুকে আমিও একটা পেরেক টেবিলে পুঁতে দিতে পারি, তাই বলে পাছা দিয়ে পেরেক খুলে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তোমরা যদি চাও বাজীর টাকা তুলে নিতে পারো।"

মোটা কোনো উত্তর না দিয়ে পেরেকটাকে অন্য জায়গায় পুঁতলো। মাত্র ৬।৭ সেন্টিমিটার বেরিয়ে আছে। ভাল করে টেনে দেখে নিয়ে বললো, "বেশতো এবার খেলা শুরু হোক।"

কার্লের মুখ কালো, অথচ কিছু করার নেই: এমন সময় পর্দা তুলে ক্লারা এল, গায়ে জাপানী কিমানো, কালো রঙের।

দারুণ চেহারা, যেন লোহা দিয়ে তৈরী। মুখটা বুলডগের মতো। বুক, পাছা সব যেন পাথরের তৈরী। সকলের দৃষ্টি ওর পাছার দিকে। পাছা দিয়ে পেরেকটা খুলে নেবে ক্লারা। এ খেলা আগেও দেখানো হয়েছে, তবে আজ মোটাটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসেছে একটু।

ক্লারা এসে সবাইকে সার্কাসী কায়দায় অভিবাদন জানালো। তারপর ধীরে ধীরে দেওয়ালের কাছে গিয়ে পেরেকের ওপর পাছাটা রেখে দাঁড়ালো। সারা শরীর শক্ত করে, একবার···ছুবার···তিনবার চেষ্টা করার পর হঠাৎ ঠং করে শব্দ হলো। ক্লারা সরে দাঁড়ালো, পেরেকটা মেঝেতে।

কার্ল ব্রিলের মুখে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

মোটা লোকটা পেরেকটা হাতে নিয়ে শুধু বললো, "অবিশ্বাস্য"।

সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে ক্লারা চলে গেলো। কার্ল ব্রিলের হিসেব মতো প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ ভাগ করে দিলো।

মনের সুখে আমি পিয়ানোয় নানা সুর বাজাতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গিয়ে বৃষ্টি, কুয়াশা আর ইসাবেলের মুখ ভেসে উঠলো।

স্বপ্নের জগৎ থেকে নেমে আসতে হলো বাস্তবে। এখানে খুব জোর তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রাউ ব্রেকমানের জন্যে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে মোটা লোকটার। প্রচুর মদের ঝোঁকে ও কার্ল ব্রিলকে তিনগুণ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল। তার মধ্যে একটা শর্ত ছিল ফ্রাউ ব্রেকমানের সঙ্গে চা খাওয়া আর গল্প করার। সে এখন সেই শর্তটা পূরণ করতে চায়। ক্লারাতো কার্লের বিয়ে করা বৌ নয়, একসঙ্গে থাকে মাত্র। তবে কেন এতো শুচিবাই ওঁকে নিয়ে।

কথাটা শুনে কার্লের মেজাজ পাল্টেছে। ওসব কথা মদের ঝোঁকে অনেকেই বলে, তাই বলে সেগুলো কি মানতে হবে? তর্ক এবার ঝগড়ায় মোড় নিলো। ঠিক সেই সময় একজন অতিথি একটা মেশিন চালিয়ে ফেলেছে। অল্পের জন্যে হাতটা কাটেনি। সবাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কাটা জায়গায় একটু মদ ঢেলে দিলো কার্ল। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললো, "মোট্‌কাটা কোথায়?"

"সরু হয়ে গেছে," কে যেন বললো। সবাই হো হো করে উঠলো।

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো মোটা, ওর একটা হাত পেছনদিকে মুচড়ে ধরে আছে ফ্রাউ ব্রেকমান। যন্ত্রনায় বেঁকে গেছে মোটা। ঘরের মাঝখানে এনে এক ঝটকায় মোটাকে ছুঁড়ে দিলো মেঝেতে।

"আমার হাতটা বোধ হয়ে খসে গ্যাছে..." যন্ত্রনায় ককিয়ে উঠছিল মোটা।

বেশ সুখ্যাতি আছে ক্লারার, এর আগে দুটো চোরকে এমন মেরেছিল

যে ওদের হাসপাতালে যেতে হয়।

বাড়ি ফিরছি। গেটের কাছে এসে দেখি যথারীতি নোপফ অবিলিস্কের সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে ক্ষেপে গিয়ে এক ধাক্কা মারলাম, "এ হে হে প্যাণ্টটা একেবারে ভিজে গেল।"

"কাজটা বাড়ি গিয়ে সারলে হতো না।" হঠাৎ খুব মায়া হলো নোপফের জন্যে। বেচারা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। কাল কিছু ফুল পাঠাতে হবে ইসাবেলকে, কার্লের ওখানে যে টাকা জিতেছি তাই দিয়ে। ইসাবেলই আমার একমাত্র ভরসা এখন। অথচ ও আমার সঠিক পরিচয় জানে না। কিন্তু কজনই বা জানে?

হোলমান অ্যাণ্ড ক্লোৎজ-এর ভ্রাম্যমান সেলসম্যান কাঁদুনে-অস্কার আমাদের অফিসে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম খবর কি। গ্রামে ইনফ্লুঞ্জোর প্রকোপ কেমন চলছে?

"কারুর তেমন কেমন কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। চাষারা তো ভাল খেতে পাচ্ছে। শহরে উল্টো—আমার কোম্পানীর জন্যে দুটো অর্ডার প্রায় খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলে এনেছি। একটা লাল গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ ২২ লাখ মার্ক। অন্যটা একটু ছোট ১৩ লাখ মার্ক। ভালই দাম পাওয়া গেছে। যদি তোমরা একলাখ কমাও তাহলে অর্ডারটা তোমরাই পাবে। আমার কমিশন কুড়ি পার্সেণ্ট।"

"পনের," আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এলো।

"কুড়ি," কাঁদুনে-অস্কার জোর দিলে, "পনের তো আমি হোলমান অ্যাণ্ড ক্লোৎজ থেকেই পাই। তাহলে শুধু শুধু ঠকাতে যাব কেন?"

ও মিথ্যে বলছে, ওর কোম্পানী ওকে মাত্র দশ পার্সেণ্ট কমিশন দেয়, সঙ্গে যাতায়াতের আসল খরচ। খরচটা তো পেয়েই যাচ্ছে তাই বাড়তি দশ পার্সেণ্টও আমাদের দিতে চাইছে অর্ডারটা।"

"নগদে দাম পাবে?" জানতে চাইলাম।

"ওটা তোমাদের দায়িত্ব। তবে পার্টিগুলো বড়লোক।"

"অস্কার, তুমি আমাদের কোম্পানীতে চলে আসছ না কেন? হোলমানের চেয়ে ভাল কমিশন দেবো। আর আমরাও একেবারে পয়লা

সারির সেলসম্যান পাবো।"

"এইতেই মজা বেশি। আমি একটু বেশি খেয়ালী। আমি যখন বুড়ো হোলমানের ওপর ক্ষেপে যাই, তখন শাসাই তোমাদের কোম্পানীতে চলে যাবো। যদি তোমাদের এখানে ঢুকি তাহলে উল্টোটা বলবো…।"

"তা ঠিক বলেছ।"

"তারমানে তখন তোমাদের অর্ডার চুপি চুপি হোলমানদের দিয়ে দেবো। কবরের পাথর বিক্রির কাজটা ভীষণ এক ঘেয়ে, এই সব করে একটু উত্তেজনা আনি।"

"খারাপ লাগে? প্রত্যেক বছর নিখুঁত শিল্পীর মতো কাজ করেও এ কথা বলছ?"

অস্কার বিজ্ঞের মতো হাসলো। এই অস্কার এক অসাধারণ লোক আমাদের লাইনে। আগে কেউ মরেছে খবর গেলে চোখে কাঁচা পেঁয়াজের রস লাগিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকতো। এখন আর তা করতে হয় না। জাত অভিনেতার মতো কথায় কথায় চোখে জল আনতে পারো। ফলে ওর সাফল্য অবধারিত।

জর্জ ক্রল ঘরে এলো, মুখে হাভানা চুরুট। বেশ সুখী-সুখী ভাব। "এই যে অস্কার…কি খবর? আচ্ছা একটা কথা শুনি তোমার সম্বন্ধে তুমি না কি নিজের ইচ্ছেমতো চোখে জল আনতে পারে। কথাটা কি সত্যি না, লোকে আমাদের ভড়কাবার জন্যে বলে?"

অস্কার কোনো কথা না বলে শুধু তাকিয়ে রইলো জর্জের দিকে। জর্জ বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো, "কি ব্যাপার, তোমার শরীর খারাপ নাকি? অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন?"

তখনো অস্কার উত্তর দেয় না। হঠাৎ ও চোখ বন্ধ করলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে চোখ খুলতেই দেখা গেল সেখানে জল টলটল করছে। রুমাল বের করে চোখ মুছলো।

"কেমন হলো? ঠিক দুমিনিট সময় নিলাম। বাড়িতে মৃতদেহ থাকলে এক মিনিটেও চোখে জল আনতে পারি?"

"অসাধারণ…," জর্জ প্রায় লাফিয়ে উঠেছে।

ভাল খদ্দেরদের জন্যে রাখা দামী মদ বের করে অস্কারকে দেওয়া হলো।

"তোমার তো অভিনেতা হওয়া উচিত ছিল?"

"তা ঠিক। তবে কাঁদার অভিনয় করার ভূমিকা খুবই কম। ওথেলো ছাড়া আর তো কিছু মনে পড়ছে না।"

"শুধু কল্পনা।···তীব্রভাবে কল্পনা করতে পারা চাই।"

"আজ কি কল্পনা করেছিল?" জর্জ জানতে চাইলো।

"বলছি কিছু মনে করবে না তো?···আমি কল্পনা করলাম···হাত পা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় তুমি পড়ে আছো আর একপাল সিংস্র ইঁদুর তোমার মুখ গা কুরে কুরে খাচ্ছে, তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করছো অথচ হাত নেই বলে তাড়াতে পারছো না।"

নিজের মুখে হাত বুলিয়ে জর্জ বলে উঠলো, "কিন্তু এটা তো ঠিকই আছে।" অস্কার আবার হাসলো।

আগের দুটো অর্ডার গোপনে সরবরাহ করায় জন্যে যে কমিশন পাওনা হয়েছিল তার টাকা চুকিয়ে দিলো জর্জ।

"সম্প্রতি কৃত্রিম হেঁচকি তোলা শিখে ফেলেছি," অস্কার বললো, "খুব ভাল ফল দিচ্ছে। পার্টিরা তাড়াতাড়ি ব্যবসার কথা পাকা করে নেয়, ভাবে দুঃখ, সহানুভূতিতে আমার ওই রকম হচ্ছে।"

"অস্কার, চলে এসো আমাদের অফিসে," আমি বেশ আবেগের সঙ্গে বললাম, "আমাদের কাজটা খুব শিল্পী শোভন, শুধু টাকা রোজগার না।"

অস্কারের মুখ ভরে উঠলো প্রসন্ন হাসিতে, "এখুনি পারছি না। একটু ভেবে দেখি, তাছাড়া এই বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্ডার অন্যকে দিয়ে দিতে আমার বেশ রোমাঞ্চ লাগে। মনে হয় বেঁচে আছি। বুঝতে পারছো?"

"পারছি" জর্জ বললো, দারুণ অনুশোচনা হচ্ছে আমাদের, তবে আমরা সত্যিকারের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে জানি।"

নতুন অর্ডার দুটোর ঠিকানা লিখে নিলাম। হাইনরিখ ক্লল সাইকেলের চাকায় পাম্প দিচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকে কাগজটা দেখলো। অস্কারকে ও ঘেন্নার চোখে দেখে।

"এসব আমার পছন্দ হয় না। ভাগ্য ভাল বাবা বেঁচে নেই, নাহলে দেখতে হতো তাঁকে," হাইনরিখ বললো।

"আমি যা শুনেছি তাতে এই কদরের পাথরের কারবারে তোমাদের বাবা ছিলেন পয়লা সারির লোক। প্রতিযোগিতার এ ধরনের ফন্দী আঁটতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হতেন। বেশ লড়াকু লোক ছিলেন নাকি উনি।"

হাইনরিখ বিড় বিড় করতে করতে কাগজটা পকেটে পুরলো। ওকে বেশ কথা শোনাতে পেরে মন খুশি আমার। আগের দিনের ঝড় বৃষ্টিতে ছাদের নর্দমার পাইপটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। মিস্ত্রীরা সেটা সারিয়ে ফেলেছে। পুরনো ভাঙ্গাটা এনে বললো, "এটা নিশ্চয়ই আপনাদের আর দরকার নেই, নিয়ে যেতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই," জর্জ বললো।

হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেলো, বললাম, "নাঃ, পাইপটা থাক। ওটা আমাদের কাজে লাগবে।"

"কি কাজে?"

"আজ সন্ধ্যেবেলায় সেটা দেখতে পাবে।"

হাইনরিখ চলে গেলো সাইকেল চেপে। আমরা ঠাণ্ডা বীয়ার খাচ্ছি। আজ খুব গরম পড়েছে।

"আজ ডলারের দাম কতো? ফোন করেছিলে?"

"আজ সকালের চেয়ে পনের হাজার মার্ক বেশি," জর্জ বললো, "এভাবে যদি বাড়তে থাকে তবে রাইজেনফেল্ডের টাকাটা দিতে অসুবিধে হবে না। একটা ছোট্ট কিছু বিক্রি করলেই সবটা উঠে আসবে।"

"চমৎকার", আমি খুব খুশি।

"দাঁড়াও আর একটু খুব ঠাণ্ডা বীয়ার খাওয়া যাক।"

রান্নাঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বীয়ার আনতে বললো জর্জ। একটু পরে ওর মায়ের পাকা চুল ভরতি মাথাটা দেখা গেলো, "সঙ্গে হেরিং মাছ-ভাজা আর আচার দেবো কি?"

"দাও।"

এই তো জীবন, খাওয়া দাওয়া করো, বাঁচো। তা না, নিজেকে বঞ্চিত

করে লাখ লাখ ডলার রেখে মরে যাও, তারপরে অন্যেরা সেটা লুঠে খাক।

"আরে এটাই তো মানুষ ভুলে যায় যে মৃত্যু অবধারিত," জর্জ দার্শনিক হবার চেষ্টা করে।…

তা ঠিক, "আমি বললাম, "আচ্ছা যদি জানতে পারো তুমি কাল মরে যাবে তাহলে কি করবে?"

"কোনো ধারনা নেই।"

"আচ্ছা, এ তো কম সময় না, ধরো এক সপ্তাহ বাঁচবে।"

"তাও ভাবতে পারছি না।

"এক মাস?"

"সব টাকা-পয়সা নিয়ে বার্লিন চলে যাবো। খুব ফুর্তি করে কাটাবো, বই পড়বো।…আচ্ছা তুমি কি করবে?"

আমি সাবধান হয়ে গেলাম, "আমি?" চারেপাশে তাকালাম—ঐ তো বাগান, সূর্য্যের আলোয় স্নান করে কবোষ্ণ হয়ে আছে, চারপাশে সবুজের সমারোহ। ওপরে সীমাহীন আকাশের নীলিমা, প্রসন্ন উদারতায় ভরা—"ভেবে বলবো।"

"বেশি ভেবো না। তাহলে আবার পাগলা গারদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে," জর্জ হাসলো।

"তা মন্দ বলো নি।"

নোপফের বাড়ী থেকে শব্দ ভেসে এলো। ওদিকে তাকাতেই জর্জ বললো, "ওকে নিয়ে কি তোমার মাথায় কোনো মতলব আছে?"

"সেটা রাতের বেলায় বুঝবে?"

এডুয়ার্ড নবলকের রেস্টুরেণ্টে গেলাম। ঢুকেই হোঁচট খেলাম, মদ খাবার এলাকায় বসে গার্দা একটা বড় মাংসের টুকরো নিয়ে খাচ্ছে। টেবিলে ফুল সাজানো। তবে গার্দা একা।

"এটাকে কি বলবে জর্জ? বিশ্বাসঘাতকতা?"

"বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার ছিল কি?"

"না, কিন্তু এইভাবে ঠকানো?" আমি যেন মানতে পারছি না।

"না ঠকানোর কোন প্রতিশ্রুতি ছিল কি?"

"ছাখো জর্জ, দার্শনিক সাজার চেষ্টা করবে না। তুমি বুঝতে পারছো না ওর পেছনে এডুয়ার্ডের নোংরা হাত কাজ করছে।"

"পাচ্ছি। কিন্তু কে তোমায় ঠকালো ? গার্দা না এডুয়ার্ড ?"

"গার্দা ! তোমার কি মনে হয় ? পুরুষটাকে দায়ী করা ঠিক না।"

"মেয়েটাকেও না", জর্জ ঘোষনা করলো।

"তাহলে কে ?"

"তুমি।"

"ঠিক আছে", আমি বললাম, "তোমার পক্ষে ও কথা বলা সহজ। তুমি ঠকো না। কারণ তুমি নিজেকেই নিজেকে ঠকাও।"

জর্জ বেশ আত্ম-সন্তুষ্টের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিলো আমার কথায়, "প্রেম হলো এক ধরনের উচ্ছ্বাস। এর মধ্যে নৈতিকতার কোনো প্রশ্ন নেই। উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ঠকানোর প্রশ্ন ওঠে না। এই আছে, এই নেই। এসব ব্যাপারে তো কোনো চুক্তি করা চলে না। তুমি কি গার্দাকে এরনার কথা বলেছিলে ?"

"প্রথম দিকে। রেড মিলে প্রথম দিন তো ও সঙ্গে ছিল, সব দেখেছিল।"

"তাহলে আর ঘ্যান ঘ্যান কোরো না। হয় ছেড়ে দাও, নয় কিছু একটা করো।"

একটা খালি টেবিল পেয়ে বসে পড়লাম আমরা। ওয়েটার এলো, "এডুয়ার্ড নবলক কোথায় ?"

"দেখতে পাচ্ছি না, একটু আগে ঐ মহিলার সঙ্গে ঐ টেবিলে ছিলেন ?"

"আমার জীবনটাও মুদ্রাস্ফীতির মতো, একবার এরনা তারপর গার্দা, সবাই ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে আমাকে।"

"লড়ে যাও"; জর্জ বললো, "এখনও আশা আছে। যাও গার্দার কাছে।"

"কী নিয়ে লড়াই করবো ? কবরের পাথর ? এডুয়াড ওকে দামী হোটেলে বসিয়ে ভাল খানা খাওয়াচ্ছে। কবিতার ব্যাপারে হয়ত ওর

আমার পার্থক্য নেই, কিন্তু খাওয়ানোর ব্যাপারে পার্থক্যটা গার্দা ভালই বুঝবে। ভুলটা আমারই, এখানে আমিই ওকে এনেছিলাম।"

"তাহলে ভুলে যাও, লড়াই করে লাভ নেই।"

"লাভ নেই? তবে কেন একটু আগে আমাকে উসকে দিচ্ছিলে?"

"কারণ আজ মঙ্গলবার।—আরে ঐ আসছে এডুয়ার্ড—রবিবারের স্যুট পরে, গোলাপ ফুল পর্যন্ত খুঁজেছে বাটনহোলো। তুমি একেবারে ডুবেছো।"

আমাদের দেখে এডুয়াড´ চমকে উঠলো। আড় চোখে গার্দাকে দেখে নিয়ে আমাদের কাছে এলো। মুখে বিজয়ী হাসি।

"এডুয়াড´ নবলক, আমাদের ফিল্ড মার্শাল বলতেন সততাই সবচেয়ে বড় সম্মান চিহ্ন, কথাটা ঠিক।"

"সবটাই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর", এডুয়ার্ড কথাটা বলেই প্রসঙ্গ পাল্টালো, "আজ আলু আর ঝোলের সঙ্গে কয়নিগ্‌স বার্জার মাংসের গুলি আছে, দারুণ খাবার।"

ওর কথার উত্তর না দিয়ে জর্জ বললো, "একজন সৈনিক কি তার সঙ্গীর পিঠে ছুরি মারে?—ভাই ভাইকে? এক কবি কি অন্য কবিকে আঘাত করে?"

"কবিরা সব সময়েই তা করে। ওই জন্যই তো ওরা বেঁচে থাকতে চায়।"

"তারা বেঁচে থাকতে চায় খোলা ময়দানে লড়াই করার জন্যে, পিছন থেকে ছুরি মারার জন্যে নয়," আমি মাঝপথে বাধা দিলাম ওদের কথায়।

এডুয়াড´ দাঁত বের করে হাসলো, "লুঠের মাল যে লুঠ করে সেই পায় লুডউইগ। যেভাবে পাবে ধরো। তুমি যখন কুপন নিয়ে আসো, তখন কি আমি ঘ্যান ঘ্যান করি?"

"হ্যাঁ করো—কিভাবে করো শুনবে?"

ঠিক সেই মুহূর্তে এডুয়ার্ডকে সরিয়ে গার্দা হাজির হলো, "এই যে তোমরা এসেছো, এসো একসঙ্গে খাওয়া যাক। ভেবেছিলাম তোমরা আমার কাছে আসবে।"

"তুমি তো মদ খাওয়ার এলাকায় বসে ছিলে···আমরা তো বীয়ার খাচ্ছি শুধু।"

"আমারও বীয়ার ভাল লাগে। বসে পড়ি।"

"তোমার অনুমতি নিয়ে এডুয়ার্ড," আমি বললাম, "যেভাবে পারি ধরি।"

"এতে এডুয়ার্ডের অনুমতি নেবার কি দরকার আছে বুঝি না, গার্দা বললো, "আমার বন্ধুদের সঙ্গে যদি খেতে ভাললাগে, তাতে তো এডুয়ার্ডের আনন্দই হবে।"

সাপিনীটা এরই মধ্যে ওকে এডুয়ার্ড বলে ডাকতে শুরু করেছে।

এডুয়ার্ড তোতলায়, "নিশ্চয়ই·· নিশ্চয়ই···কোনো আপত্তি নেই··· এতো আনন্দেরই কথা··· ।"

রাগে মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে ওর, অথচ হাসি ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

"বাঃ সুন্দর গোলাপ কুঁড়িটি তো?" আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে মজা করে বললাম, "তা কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম চালাচ্ছ না কি? না কি, নিছক প্রকৃতি প্রীতি?"

"সুন্দর জিনিষ এডুয়ার্ড ভীষণ ভালবাসে," ওর হয়ে গার্দা জবাব দিলো।

"তা বাসে। তা আজকেও কি ঐ একঘেয়ে মাংসের গুলি খেতে হবে?"

গার্দা আমার কথা শুনে হেসে উঠলো, "এডুয়ার্ড দেখিয়ে দাও তো তুমি কতো উদার আর মহৎ। এই দুই বন্ধুকে নেমন্তন করো। ওরা বলে তুমি নাকি খুব কিপটে। ওরা যে তোমাকে ভুল বোঝে এটা প্রমাণ করো··· ।"

"এরা আমার বন্ধু নয়," ভাঙ্গা ইঞ্জিনের মতো শব্দ করে বলে উঠলো এডুয়ার্ড।

"সে কি বন্ধু, তোমার সঙ্গে তো আমার রক্তের সম্পর্ক আছে। কবিদের ক্লাবে আগের দিন যে কথা হয়েছিল সেটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

এমন কি কোন্ ছন্দে, কি বিষয় নিয়ে তুমি এখন কবিতা লিখছো তাও আমি বলে দিতে পারি।"

"তোমরা কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না," গার্দা বললো।

"কিছুই বলছি না," এডুয়ার্ড বললো, "এরা দুজন কখনো সত্যি কথা বলে না। সব সময়ে জোকারের মতো রসিকতা করে। জীবনের গুরুত্বই বোঝে না।"

"আরে যারা কবর খোঁড়ে আর কফিন বানায় তাদের বাদ দিলে আমাদের চেয়ে বেশি জীবনের গুরুত্ব কেউ বোঝে না," আমি প্রতিবাদ করলাম।

"আবার শুরু হলো, তোমরা খালি মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করো," গার্দা অযাচিতভাবে মন্তব্য করলো, "আর ঠিক এই জন্যেই তোমরা জীবনের সাত্যিকারের মহত্বটা বোঝো না।"

ওর মন্তব্য শুনে আমরা হতভম্ব। একেবারে এডুয়ার্ডের মতো কথা বলছে গার্দা। বুঝলাম আমার আর লড়া উচিত না।

"এই অসাধারণ সত্যটা তুমি জানলে কি করে?" আমি ব্যঙ্গ করলাম।

"কবরখানার কথা চিন্তা করে করে তোমাদের ঐ মনোভাব। তবে অনেকে আছে যারা ওসব মাথাতেই আনে না। যেমন এডুয়ার্ড, ওতো একটা ভোরের পাখি।"

এডুয়ার্ডের মুখ চোখ সুখের লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

"যাও ভাল খাবার পাঠাও," গার্দার হুকুম।

"যাচ্ছি।" এডুয়ার্ড চলে যেতে আমি গার্দাকে লক্ষ্য করে বললাম, "চমৎকার···দারুণ কাজ করলে। তার এর বিনিময়ে আমাদের কি করতে হবে?"

"দ্যাখো··স্বামীদের মতো কর্তৃত্ব ফলাবে না। এই মুহূর্তে যে বেঁচে আছো, জীবন ভোগ করছো, তাতেই আনন্দ পাবার চেষ্টা করো।"

"আন্তরিক ধন্যবাদ গার্দা" জর্জ মাঝখান থেকে বলে উঠলো, "আমরা সত্যিই এডুয়ার্ডকে ভালবাসি। ওই শুধু আমাদের ভুল বোঝে।"

"তুমিও কি ওকে ভালবাস গার্দা," আমি প্রশ্ন করলাম।

গার্দা হাসলো। আমাকে দেখিয়ে জর্জকে লক্ষ্য করে বললো, "একেবারে ছেলেমানুষ তোমার বন্ধুটি। ওর চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছনা কেন? ওর তো জানা উচিত সব কিছুর মালিক ও নয়।"

"চেষ্টা করি। তবে ও কতকগুলো আদর্শ নিয়ে চলে তো। যৌবনে নিজেকে ওরকম অনেকেই ভাবে," জর্জ বললো।

"আমিও ভাবি," গার্দা জানালো, "তবে যখন অর্থের প্রয়োজন হয় বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করি।"

কথার মাঝখানেই খাবার এসে গেলো। বেশ মাতৃসুলভ যত্ন নিয়ে এডুয়ার্ড আমাদের খাবার ভাগ করে দিলো। ওরই মাঝে গার্দার সঙ্গে যেন ওর চোখে চোখে কথা হচ্ছে। আমার মনে হলো বয়েসে গার্দা আমার চেয়ে ছোট হলেও সেই মুহূর্তে সে যেন অভিজ্ঞতায় আমাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেছে।

ভাল খাবারও বিস্বাদ লাগতে লাগলো মুখে। ভেবে দেখলাম এডুয়ার্ডের সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকার কোনো দরকার নেই।

…রাতে জানলার ধারে বসে প্রতীক্ষা করছি নোপফের। ঘরের আলো নেভানো। সেই জলের পাইপটার একটা মুখ আমার জানলায় অন্যটা ঘুরে চলে গেছে নোপফের বাড়িতে ঢোকার পথের কোণ পর্যন্ত। এমনিতে কারুর চোখে চট করে ওটা পড়বে না।

ডলারের দাম, একজনের আত্মহত্যা, দুটো ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়ার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। দৃষ্টিটা কিন্তু গেটের দিকে। একজোড়া যুবক-যুবতী চট করে আমাদের বাগানে ঢুকে পড়লো। পড়ুক। পকেটে রেস্ত কম থাকলে এসব জায়গাই ভাল।

নোপফ আসছে, রাত তখন প্রায় আড়াইটে। পেটপুরে মদ নিশ্চয়ই খেয়েছে। যথারীতি নোপফ সোজা এগিয়ে যাচ্ছে কালো অবিলিস্কের দিকে। জলের পাইপের প্রান্তটায় মুখ লাগিয়ে আমি চাপা গলায় বললাম, 'নোপফ'। পাইপের অন্য প্রান্তে শব্দটা গমগম করে উঠলো। আমি আবার ডাকলাম 'নোপফ…শূয়োর কোথাকার লজ্জা করে না

তোমার ? শুধু মদ গেলা আর কবরের পাথরের গায়ে পেচ্ছাপ করার জন্যেই কি আমি তোমায় সৃষ্টি করেছিলাম ?"

নোপফ সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো, "কে ? কই কাউকে তো দেখছি না ?"

"নোংরা, ছোটলোক···প্রশ্ন করার অধিকার তোমাকে কে দিলো ? ওপরওলা যখন কথা বলে তখন অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে শুনতে হয়, আমার গলার স্বর অপর প্রান্তে ভৌতিক লাগছিল নিশ্চয়ই।'

চারদিকে তাকালো নোপফ। সব ঘর অন্ধকার, কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না, অথচ কে কথা বলছে।

"খাড়া হয়ে দাঁড়াও সার্জেন্ট মেজর, এই জন্যেই কি আমি তোমাকে কলারে আর কাঁধে সম্মানের তারকা চিহ্ন লাগাতে দিয়েছিলাম। আর তুমি এখন কি করে বেড়াচ্ছ ?"

চাঁদের আলোয় নোপফকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। প্যান্টের বোতাম হাত, মুখে চোখে বিহ্বলতা। এতো রাতে ভৌতিক সুরে কে কথা বলছে ?

নোপফ তোমাকে আবার নীচের পোস্টে নামিয়ে দেবো।

যদি ফের কোনোদিন দেখি এখানে পেচ্ছাপ করতে এসেছো। জার্মান সৈনিকের মর্যাদা রাখতে পারো না তুমি।"

নোপফ কান পেতে শুনলো, তারপর ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা কথা, "কাইজার ?"

"প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে ফিরে যাও নিজের ঘরে। আর কক্ষনো এরকম করবে না। ফরোয়ার্ড মার্চ।"

টলতে টলতে নোপফ নিজের ডেরায় ফিরলো।

## ॥ ১৪ ॥

এডুয়ার্ডের ওখানে কাঠদের ক্লাবের মিটিং বসেছে। অটো বামবাস তার কবিতায় নতুন প্রাণসঞ্চার করতে চাইছে। হানস হাঙ্কারমান তার "কাসানোভা" বইটা লেখার জন্যে উৎসাহ চায়। ম্যাথিয়াস গ্রুন্ডও এসেছে যদি কিছু নতুন মালমশলা পাওয়া যায়।

"এডুয়াড´ তুমি আসছ না কেন ?" আমি বললাম।

"দরকার কি ? আমি বেশ আছি।"

"তাই নাকি ?" আমার বিশ্বাস ও মিথ্যে কথা বলছে।

"হোটেলের সব কটা ঝিয়ের সঙ্গে ওর···" হাস্কারমান চোখ টিপে একটা কদর্য ইঙ্গিত করলো, "রাজী না হলে ওদের চাকরী চলে যায়।"

আমরা এডুয়ার্ডের পেছনে লাগতে শুরু করলাম। এমন সময় ভ্যালেনটিন এসে পড়লো। ওর খুব ইচ্ছে এডুয়ার্ডের ঘাড় ভেঙ্গে এক বোতল মদ খায় নানা কাজের অছিলা দেখিয়ে কেটে পড়লো এডুয়ার্ড।

ক্লাব থেকে উঠে পড়লাম। চমৎকার সন্ধ্যা। ১২ নং বাহনস্ট্রাফেতে যাবো আমরা। শহরে দুটো 'খালি কোঠির' মতো বাড়ী আছে, তার মধ্যে এই বারো নম্বরেরটাই বেশি ভাল, অভিমত।

প্রায় শহরের সীমানার বাইরে ছিমছাম একটা বাড়ী, চারপাশে পপলার গাছ। বাড়ীটাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। আমার কৈশোরের অনেক সময় কেটে গেছে এখানে যদিও তখন জানতাম না বাড়ীটা কিসের এবং কেন। পাশে একটা পুকুর, সেখানে মাছ ধরতে আসতাম। বাগানে অজস্র প্রজাপতি থাকতো। মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আমরা গলা ভেজাবার জন্যে সবাই খুজঁতে গিয়ে ঐ ১২ নম্বরে চলে এসেছিলাম। লেমনেড খাবো। সেখানে ছিট কাপড়ের গাউন পরা অনেক মহিলাদের দেখেছিলাম। ওরা আমাদের কাছে এসে আদর করে জানতে চাইতো কোন্ ক্লাশে পড়ি। কোথায় থাকি, কি নাম।

আবার কখনো আমরা যখন ঝরণার ধারে বসে স্কুলের টাস্ক করতাম, তখন ঐ মহিলারা এসে খুব যত্ন করে আমাদের পড়া দেখিয়ে দিতো, ভুল ঠিক করে দিতো। বেশ মায়ের মতো স্নেহ করতো। ফলে জায়গাটা আমাদের ভালো লেগে যায় এবং প্রায়ই যেতাম আমরা। মাঝে মাঝে আমাদের চকোলেটও দিতো। মেয়েমানুষ যে কি জিনিষ তখনো আমরা বুঝিনি। ওদের বয়েস নিয়েও মাথা ঘামাতাম না। সেই সময় আমার মা ছিলেন হাসপাতালে ফলে ওদের কাছ থেকে স্নেহ পেয়ে মনটা ভরে থাকতো। তারপর একসময় আমরা অন্য পাড়ায় চলে যাই, ১২ নম্বরে

যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলো।

এর বহুকাল পর আর একবার ১২নং বাহ্‌নস্ট্রাফেতে গিয়েছিলাম আমি, যুদ্ধের সময়। ফ্রণ্টে যাবার আগের দিন। তখন আমি সবে আঠারোতে পা দিয়েছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাও না। নারী-সঙ্গ বলতে যা বোঝায় তার স্বাদ আমরা পাই নি, এবং সেটা না পেয়ে মরতে চাই না। আমরা পাঁচজন গেলাম বাহ্‌নস্ট্রাফেতে। বেশ মদ খেয়ে সাহস-টাহস করে নিলাম। আমাদের মধ্যে উইলি সবচেয়ে উদ্যোগী। খুব লাস্যময়ী একটা মহিলা, তার নাম ফ্রিৎজি, তাকে ডাকলো উইলি, "ডার্লিং, হবে নাকি?"

"নিশ্চয়ই," সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে ফ্রিৎজি বললো,

"তা পকেটে টাকা-পয়সা আছে তো?"

"অনেক", উইলি পকেট থেকে মাইনের পুরো টাকাটা বের করে দেখালো।

"ঠিক আছে, তাহলে চলো ওপরে," ফ্রিৎজি ওর সঙ্গে কথা বলছিল বটে তবে সব সময়ে নজর দিল বীয়ারের টেবিলের দিকে।

উইলি উঠলো মাথার টুপিটা টেবিলের ওপর রেখে। ফ্রিৎজি অবাক হয়ে উইলির লাল চুলের দিকে তাকিয়ে আছে। সাত বছর পরে ঐ অদ্ভুত সুন্দর লাল চুল চিনতে ভুল হয় নি তার, "এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার নাম উইলি না?"

"হ্যাঁ", বেশ খুশি হয়ে উইলি বললো।

"এখানে এসে তোমরা স্কুলের পড়াশোনা করতে না তখন?"

"ঠিক তাই।"

"আর এখন সেই তুমি আমার ঘরে আসতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। পরিচয় তো আগে থাকতে আছেই।" উইলি দাঁত বের করে হাসলো। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একটা চড় এসে পড়লো উইলির মাথায়, "জানোয়ার কোথাকার, আজ আমার সঙ্গে শুতে চাও। সব জিনিষের একটা সীমা আছে।"

"কি বলতে চাইছ তুমি", উইলি তোতলাচ্ছে, "অন্যরা যে—।"

"অন্যদের নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমি কি ওদের পড়া ধরতাম? আমি কি ওদের বাড়ীর পড়া তৈরী করে দিতাম? নাকে সর্দি পড়া বাচ্ছা ছিলে তখন তুমি।"

"কিন্তু এখন তো আমার সাড়ে সতের বছর—।"

"চুপ। মায়ের বয়সী মেয়েমানুষের সঙ্গে শুতে আসতে চাইছো। দূর হয়ে যাও এখান থেকে—।"

"ও কাল যুদ্ধে যাচ্ছে", আমি বললাম, "তোমার কী দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই?"

ফ্রিৎজি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকালো "তুমিও তো ওর সঙ্গে আসতে না?"

"হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?"

গোলমালে বাড়ীউলি মাসী এসে হাজির।

ফ্রিৎজি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো তাকে।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই তো সেই লাল চুলের ছেলেটা—উইলি—আর তুমি কে?—লুডউইগ না?"

"হ্যাঁ", আমার হয়ে উইলি জবাব দিলো, "এখন আমরা সৈনিক। যৌন ব্যাপারে এখন আমাদের অধিকার আছে।"

"অধিকার আছে?" খুব জোরে হেসে উঠলো মাসী, "মনে আছে ফ্রিৎজি এই ছেলেটা বাইবেল ক্লাশে নোংরা জিনিষ দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল? আর আজ এসে বলে কিনা যৌন ব্যাপারে অধিকার আছে?"

হাসতে হাসতে বাড়ীউলি মাসী কাকে যেন ডেকে বললেন, "এদের লেমনেড দাও।"

"আমরা এখন মদ খাই," আমি বললাম, "সবাই একদিন বড় হয়।"

"বড় হয়?—যাও যাও দূর হও এখান থেকে।"

দরজার কাছে এসে শাসাবার ভঙ্গীতে উইলি বললো, "ঠিক আছে, রোলসস্ট্রাফেতে যাবো।"

বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা, কাঁধে বন্দুক, কানে বিশ্রি অপমানের সুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। রোলসস্ট্রাফেতে যাওয়া সম্ভব না, পাকা দু ঘণ্টার রাস্তা।

আমরা নারী দেহের স্বাদ না নিয়েই যুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। যুদ্ধে আমাদের মধ্যে সতের জন যৌন অভিজ্ঞতা না নিয়েই কৌমার্য বজায় রেখে মরে গেলো। এর প্রায় দেড় বছর পরে ফ্লাণ্ডার্সে আমাদের ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং উইলির যৌন রোগও হয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে সৎলোকেরা যে সব সময়ে পুরস্কৃত হয় তা ঠিক না।

গ্রীষ্মের রাত, তবে গরম ততো বেশি নয়। অটো বামবাস আমার গায়ের সঙ্গে যেন সেঁটে আছে, ওর ধারনা এই ধরনের গনিকালয়ের সব কিছু আমার নখদর্পণে। অন্যেরাও ওখানে গেছে, তবে ভাব দেখাচ্ছে যেন নিষ্পাপ শিশুটি। শুধু হামবড়াই করছে নাট্যকার পল। তবে আমি জানি ও কখনো ওসব জায়গায় যায় নি।

অটোর হাত এখন থেকেই ঘামতে শুরু করে দিয়েছে। ওর ধারনা ওখানে গেলে সাক্ষাৎ রতি দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তবে ফেরার সময় এডুয়ার্ডের গাড়ীতে ফিরবে, কারণ তখন তার কী অবস্থা থাকবে তা সে জানে না। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, "লোকেরা বেশ্যাবাড়ী তো রোজ যায় না। বড় জোর সপ্তাহে দু-তিন দিন। তেমন কিছু ক্ষতি হয় না তাতে। গণ্ডগোলও তেমন হয় না। তবে এই কদিন আগে ফ্রিৎজি একজনের কান ছিঁড়ে দিয়েছে—।"

"কান?" অটো দাঁড়িয়ে পড়লো।

"সকলেই যে করে তা তো নয়। এখানে আমবা আসি আদিম স্বাদ নেবার জন্যে।"

"তাই বলে কান?" অটোর দ্বিধা কাটছে না।

"কান তো সামান্য, অনেক সময় খাসি করে ছেড়ে দেয়," হাস্কারমান গম্ভীর হয়ে বললো।

"বাঃ, ঠাট্টা করছো তোমরা", অটো দেঁতো হাসি হাসলো।

"কেন ঠাট্টা করবো কেন?" আমি বললাম, "মেয়েরা অনেক সময় মর্ষকামী হয়। তখন অনেক রকম অত্যাচার চলে। অবশ্য সাবধান যদি হতে চাও সঙ্গে একটি অস্ত্র রাখবে।"

"অস্ত্র?"

পকেট থেকে লাল চামড়ার একটা কেস বের করলাম, একটা কৃত্রিম হাতীর দাঁতের চিরুনী, আর নখ কাটবার সরু উখো। এরনার উপহার, ছলনাময়ী নারী।

"এইটি রাখো।"

"চিরুনীটাও দাও।"

"চিরুনী দিয়ে কিন্তু মেয়েটাকে কুপোনো যাবে না হে কবি।"

হাস্কারমান ঠাট্টা করতে ছাড়ছে না।

গায়ে না মেখে অটো আবার প্রশ্ন করলো, "আর সিফিলিসের ব্যাপারটা ?"

"আজ শনিবার। বিকেলে সব কটা মেয়েকে ডাক্তার পরীক্ষা করে গেছে অতএব ভয়ের কিছু নেই বন্ধু।"

"তুমি সব কিছু জানো, তাই না?" অটো পরম বিশ্বাসে কথাটা বললো আমাকে, "আমি তো আগে এসব কখনো করি নি। খুব সৎ জীবন যাপন করে এসেছি।"

"তাহলে বিয়ে করছো না কেন ?"

"বিয়ে ? ওরে বাবাঃ, সারা জীবন কেঁদে কেঁদে মা আমার বাবার জীবন নরক করে তুলেছিলেন। ভীষণ ভয় করে বিয়ে করতে।"

পপলার গাছে ঘেরা সুন্দর বাড়ী. লাল আলো জ্বলছে নানা জায়গায়। সঙ্গে আনা মদ আমরা একটু করে খেয়ে নিলাম, কারণ এখানে চারগুণ বেশি দাম। বাইরে এডুয়ার্ডের গাড়ী দাঁড়িয়ে ও আগেই পৌঁছে গেছে।

ঢুকেই বীয়ারের পিপে সাজানো বীয়ার খাবার ঘর দেখে খুব হতাশ হয়ে গেলো অটো। ও ভেবেছিল চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে সাজানো হবে ঘরটা, মাথার ওপর ঝুলবে ঝাড়লণ্ঠন, সুগন্ধে ভরে থাকবে বাতাস। স্বল্পবাস পরা মহিলারা থাকবে। তার বদলে কিনা ঝি ক্লাসের বারমেড। অটো ফিসফিস করে জানতে চাইলো এখানে নিগ্রো মেয়েমানুষ পাওয়া যাবে কিনা। ছিপছিপে, কালো চুলওলা একটা মেয়েকে দেখিয়ে আমি বললাম, "নিগ্রো রক্ত আছে মেয়েটার মধ্যে। সংশোধনী জেলখানা থেকে কয়েকদিন আগে ছাড়া পেয়ে এসেছে। স্বামীকে খুন করেছিল।"

ফিতে বাঁধা উঁচু জুতো, কালো অন্তর্বাস, সার্কাসে সিংহের খেলা দেখাবার মতোন পোষাক পরা, মাথায় আস্ত্রাখান টুপি, দাঁতগুলো সোনা বাঁধানো···আয়রন হর্স নামের মেয়েটা এগিয়ে এলো। বহু কবি, নাট্যকার, গীতিকার ওর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে গেছে, তাই অটোর জন্য একেই আমরা বেছেছি। হয় এ, নয় ফ্রিৎজি। আমরা বলে রেখে-ছিলাম জমকালো পোষাক পরে ও যেন আসে, তাই এসেছে।

অটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, মনে হলো ও বেশ হতাশ হয়েছে, ওর ধারনা ছিল আরও কম বয়সী তরতাজা যুবক পাবে একটা। অটোর মুখ শুকিয়ে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। মাত্র ২৬ বছর বয়স তার। সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসলো আয়রন হর্স, "চলো, আমাদের কনিয়াক খাওয়াও !"

"কনিয়াকের কতো দাম পড়বে ?" অটো একটা মেয়ে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলো।

"ষাট হাজার।"

"কী বললে ?" হাঙ্কারমান যেন চমকে উঠছে, "চল্লিশ হাজার, একটা কানাকড়ি বেশি নয়।"

"ওই দামটা কালকের," আয়রন হর্স বললো।

তারপর কথা কাটাকাটি চললো ডলারের দাম পড়ে যাওয়া নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ও কথাটা বাদ দিলাম।

হাঙ্কারমাণ যেন হঠাৎ খুব শংকিত হয়ে উঠেছে, ও ভ্রূকুঁচকে বললো, "আর খরচা কতো পড়বে ? আমাদের সঙ্গে তো কুড়ি লাখের কথা হয়েছে। পোষাক খোলা আর তারপর আধঘণ্টা কথা বলার জন্যে ঐ টাকাটা দেওয়া হবে তোমাকে। কথা বলাটা আমাদের সঙ্গীর জন্যে বিশেষ দরকারী।

"ত্রিশ লাখ," আয়রন হর্স ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, "তাও সস্তা।"

"বন্ধুগণ, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে", হাঙ্কারমান ঘোষনা করলো।

"এই উঁচু জুতোগুলোর আজকাল কতো দাম হয়েছে জানো ?"

হাঙ্কারমান ওর কথার উত্তর না দিয়ে বলনো, "এক কথা—কুড়ি লাখ

মার্ক। এখানে আজকাল খুব চুক্তির খেলাপ হচ্ছে দেখছি।"

"চুক্তি? এসবের আবার চুক্তি হয় নাকি?" আয়রন হর্স চোখ কপালে তুললো, "অতোই যদি টাকার টান, তাহলে সস্তা দরের কারুর কাছে যাওয়াই তোমাদের ভাল।"

এরপর আর কথা চলে না। হঠাৎ হাঙ্কারমান আবিষ্কার করলো অটো নিজের আর আয়রন হর্সের জন্যে কনিয়াক মদের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

ভাগ্য ভাল ছিল সেই সময় উইলি হাজির। ওর মেজাজ খুব ভাল, আজই ও দুকোটি পঞ্চাশ লাখ মার্ক রোজগার করেছে। অতএব যা খরচ সব দেবে। অটো সাবালক হতে চলেছে দেখে দারুণ খুশি ও।

"যাও হে খোকা," অটোর পিঠ চাপড়ে বললো, "ফিরে এসো মানুষ হয়ে।"

অটো দোতলায় চলে গেলো। আমি ফ্রিৎজির পাশে বসে গল্প করতে লাগলাম। যুদ্ধ শেষ হবার মাত্র তিন দিন আগে ওর ছেলেটা মারা গেছে, তাই এখন আমাদের সঙ্গে ওর বেশ ভাব। আমাদের পাশে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে বাড়িউলি মাসী।

হঠাৎ দোতলা থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো। হুড়মুড় করে আণ্ডারওয়্যার পরা অটোকে নেমে আসতে দেখলাম, পেছনে ক্ষিপ্ত আয়রন হর্স,। একটা টিনের মগ দিয়ে অটোকে মারছে। অটো ঘোড়ার মতো ছুটে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, আমরা তিনজন আয়রন হর্সকে থামালাম।

"ওই শয়তান, খচ্চরটা ছুরী নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল।"

"না, না, ওটা ছুরী নয়," আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আয়রন হর্সকে আসল কথাটা বললাম।

কোমরের কাছে কাটা দাগ দেখিয়ে আয়রন হর্স বললো, "তা হলে এগুলো কি?"

"রক্ত নেই। ওটা নখ কাটার উখো।"

"উখো?" হাঁ হয়ে গেছে আয়রন হর্স, আমি বলে ওকে একটু বেশি

আনন্দ দেবার জন্যে চাবুক দিয়ে সামান্য মেরেছি, আর ওকি না আমাকে··· ।”

দামী মদ খাইয়ে ওকে শান্ত করলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় একটা ঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অটো।

“বিপদ কেটে গেছে, চলে এসো হে,” হাস্কারমান ডাকলো।

শত বোঝানোতেও ভয় কাটছে না অটোর, ও খালি বলতে থাকলো ওর জামাকাপড় ফেরৎ দাও। শেষ পর্যন্ত পোষাক পরে ওকে টেবিলে আনা হলো। কিন্তু আজ আর ওপরে যাবে না। আয়রন হর্সে'র সঙ্গে রফা হলো এক সপ্তাহের মধ্যে ও আবার আসবে, তখন আর টাকা লাগবে না।

আমরা মদ খেতে লাগলাম। এডুয়ার্ড এলো, ও একটু বেড়াচ্ছিল বাইরে। উইলির মেজাজ আজ দরাজ। অটোও ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কাগজ বের করে কি যেন লিখছে। উঁকি মেরে দেখলাম—“বাঘিনী”।

“কবিতা লেখার সময় পরে পাবে হে,” আমি ঠাট্টা করলাম।

“সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফসলের আলাদা দাম আছে,” অটো মাথা নাড়লো।

“কি এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একেবারে বাঘিনী বলে ফেললে?”

“ওটা আমার ব্যাপার, কল্পনা শক্তির ওপর সব কিছু নির্ভর করে।”

“কি আমার কল্পনা রে। তার চেয়ে এসো মদ খাওয়া যাক,” আমি বললাম।

“যাক”, বেশ জোর দিয়ে বললো অটো। দুধ-কফি খাওয়া মানুষটা আজ এতো তেতে উঠলো কেন। আমাদের সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে জোর মদ চালাতে লাগলো অটো।

এক সময়ে ওখান থেকে উঠলাম আমরা। “তোমার গাড়ি কোথায় উইলি? হাঁটতে ভাল লাগছে না।”

“রেণী নিয়ে গেছে।”

“তুমি কি ওকে বিয়ে করবে নাকি?”

"বাগদান করে ফেলেছি," উইলি হাসলো। আমি খুব আশ্চর্য হলাম, এটাও সম্ভব।

রাতটা ভাল করে উপভোগ করতে চাইছিল সবাই। অথচ কি করা যায় তা ঠিক করা যাচ্ছিল না। উইলি প্রস্তাব করলো, "চলো বোদার গানের ক্লাবে যাওয়া যাক।" আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম।

ঝরণার জলে চাঁদের আলো পড়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল এক চুমুকে মদের মতো সেই জল সবটা খেয়ে নিই।

॥ ১৫

কি আশ্চর্য! "আমি বললাম," রোববারের সকাল বেলাতেই যে হাজির?"

আমার ধারনা হয়েছিল ভোরের দিকে বোধহয় চোর-টোর কেউ ঢুকেছে; কিন্তু নীচে নেমে এসে দেখলাম, সকাল ৫টা বাজে, এবং রাইজেনফেল্ড দাঁড়িয়ে।

"ভুল করে চলে এসেছো, আজ তো রবিবার, ছুটির দিন। আজ তো স্টক এক্সচেঞ্জও খোলা থাকবে না।···তবে কি রেড মিল নাইট ক্লাবে যাবার জন্যে টাকা পয়সার দরকার?"

রাইজেনফেল্ড মাথা নাড়লো, "এমনি চলে এলাম। হাতে সময় আছে। ভাবলাম এখানেই চলে আসি, কেন আর হোটেলে গিয়ে কফি খাই। ···রাস্তার ওপাশের সেই সুন্দরী কেমন আছে? ভোরে ওঠে কি?"

"ওঃ," আমি বললাম, "তাহলে রূপের টানেই চলে এসেছো। যৌবন যে তোমার চলে যায় নি, তারজন্যে অভিনন্দন বন্ধু। কিন্তু কপাল খারাপ। রোববারে ওর স্বামী বাড়ি থাকে। দারুণ কুস্তিগীর আর ভাল ছুরী ছুঁড়তে পারে।"

"ও ব্যাপারে আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান," রাইজেনফেল্ড ভ্রূক্ষেপ না করেই বললো, "বিশেষ করে পেটে যদি মাংস আর মদ পড়ে, সঙ্গে কফি।"

"ওপরে এসো। আমার ঘর নোংরা হয়ে আছে, তবুও কফি করে

দিতে পারবো। চাইলে পিয়ানো বাজাতেও পারো।"

"না, আমি নীচেই থাকবো, ভোরের এই আকাশ, কবরের পাথর, সব মিলিয়ে জীবনের স্বাদ নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া এখানেও মদ আছে দেখছি।"

"ওপরে আরও ভাল আছে।"

"আমার এতেই চলবে।"

"ঠিক আছে রাইজেনফেল্ড, তাই হবে।"

"এতো চেঁচিয়ে কথা বলছ কেন," রাইজেনফেল্ড বললো, "এখানে এসে অবধি দেখছি তুমি বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলছো, আমি কি কালা হয়ে গেছি?"

"তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হয়েছে, রাইজেনফেল্ড, তাই," আমি আরও চেঁচিয়ে বললাম।

আমি তো ওকে বলতে পারছি না যে জর্জকে জাগাবার জন্যে চেঁচিয়ে কথা বলছি। আসল ব্যাপারটা এই—কসাই ওয়াটজেক গতরাতে জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের সভায় যোগ দিতে চলে গেছে, আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে লিসা চলে এসেছে জর্জের ঘরে। সারারাত প্রেমিকের বাহুডোরে বাঁধা হয়ে থাকবার জন্যে। এ খবরটা তো আর রাইজেনফেল্ড জানে না। তাই গার্জেনের মতো জর্জের ঘরের দরজার কাছেই বসে আছে। এখন লিসাকে জানলা দিয়ে বেরোতে হবে, অন্য পথ নেই।

"ঠিক আছে কফি আনছি হাতলে," দৌড়ে ওপরে চলে গেলাম আমি, একটা মোটা বই দড়িতে বেঁধে জর্জের জানলার সামনে দোলাতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একটা কাগজে রাইজেনফেল্ড কোথায় বসে আছে লিখে বইটার ফাঁকে গুঁজে দিয়েছি। জর্জের টাক দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ হাত পা নেড়ে ইশারায় কথা বলে সব বোঝাবার চেষ্টা করলাম পুরো ব্যাপারটা। রাইজেনফেল্ডকে সরাতে পারছি না। অভদ্র ব্যবহারও করা চলবে না, কারণ ওর সঙ্গে আমাদের রুটি-রোজগারের সম্পর্ক।

পরে দড়ি বেঁধে এক বোতল মদ পাঠালাম, একটা নিটোল বাহু ওটা নিলো। প্রেমিক-প্রেমিকা নিশ্চয়ই সরারাত জেগে ছিল, ক্ষিদে পাওয়া স্বাভাবিক। কিছু রুটি আর মাখনও পাঠালাম দড়ি বেঁধে। আপাততঃ

রোমিও-জুলিয়েট একটু শান্তিতে থাকবে।

রাইজেনফেল্ডকে কফি দিচ্ছি, দেখি সাইকেলে চড়ে হাইনরিখ আসছে। খুব ভোরে ওঠে ও। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে হাত-মেলালো রাইজেনফেল্ডের হাতে।

"আমি কিন্তু তোমাদের বিরক্ত করছি না। কফি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবো। আর তোমাকে আটকেও রাখবো না।"

"আটকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিজের থেকেই থাকবো," বললো হাইনরিখ, "তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি।"

"কিছু খাবার দাও রাইজেনফেল্ডকে।"

"জার্মানীতে যখন রাজতন্ত্র ছিল, তখন রোববারেও সব পাওয়া যেতো, প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর ওসব পাট চুকে গেছে,"—আমি কথাটা বলতেই হাইনরিখ কটমটিয়ে তাকালো আমার দিকে, "জর্জ কোথায়?"

"আমি কি তোমার ভাইয়ের চাকর নাকি হাইনরিখ", খুব জোরে কথাটা বললাম, যাতে জর্জ জানতে পারে হাইনরিখও হাজির।

"না, তবে কোম্পানীর কর্মচারীতো বটে। তোমার উচিত আমাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলা।"

"আজ রবিবার। রবিবারে আমি কারুর কর্মচারী নই। এসব যা করছি কোম্পানীকে ভালবাসি বলে করছি।"

রাগে কোনো উত্তর না দিয়ে হাইনরিখ এগিয়ে গেলো জর্জের ঘরের দরজার দিকে।

"ওকে ঘুমোতে দাও।" রাইজেনফেল্ড বললো, "এখন কোনো দরকারী আলোচনা করতে পারবো না আমি।"

হাইনরিখকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে আমি বললাম, "যাও না রাইজেনফেল্ডকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো, ততক্ষণে আমি ডিম আর বেকন দিয়ে রোল তৈরী করে রাখছি। আর জর্জও তৈরী হয়ে নেবে।"

রাইজেনফেল্ড যেন আঁৎকে উঠলো, "না, না, কোথাও যাবো না। একটু না ঘুমিয়ে নিলে হবে না।"

আমি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। আর কিছু করার নেই আমার,

এবার জর্জের ভাগ্য।

···সকালের শিশিরে ভেজা শহর, ভজনা সুরু হতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরী, অতএব তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। কাল অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে, ডলারের দাম আড়াই হাজার মার্ক কমেছে।

কাঁধে ভারী হাত পড়তে চমকে ঘুরে তাকালাম। লম্বা রোগা মতন একটা মানুষ, শহরের সবচেয়ে পাজী লোক হারবার্ট সার্জ। নাক কুঁচকে আমি বললাম, "সুপ্রভাত বলবো, না শুভসন্ধ্যা? রাতের বিশ্রাম নিতে যাচ্ছো, না নেওয়া শেষ হয়েছে?"

হারবার্ট হো হো করে হেসে উঠলো। "বুঝতে পেরেছি বিশ্রামের আগেকার অবস্থা। তা ব্যাপারটা কি?" আমি জানতে চাইলাম।

"প্রতিষ্ঠাতা দিবসের উৎসব।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"একটা নতুন ক্লাবে ঢুকেছি। আজ তার কার্যনির্বাহী কমিটিকে ভোজ দেবো। ···'ভেটেরাণ রাইফেলমেনস সমিতি'।···বুঝেছ?"

বুঝেছি। অনেকের যেমন ডাকটিকিট, মুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করার বাতিক থাকে, হারবার্টের তেমন বাতিক হলো নতুন নতুন ক্লাবের সদস্য হওয়া। ইতিমধ্যে প্রায় ডজনখানেক হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য একটাই ও গেলে প্রত্যেকটি ক্লাব থেকে সদস্য হিসেবে ও একটা করে মালা পাবে, দ্বিতীয়তঃ শবযাত্রায় প্রত্যেকটা ক্লাব থেকে অন্ততঃ দু'একজন করে সদস্য হাজির থাকবে। ফুলের মালায় গাড়ী ভরে যাবে—এটা ও কল্পনার চোখে দেখতে পায়। আরও হবে, কারণ এখন সার্জের বয়েস মাত্র ষাট, দু'দশ বছর আরও বাঁচবে, ফলে ক্লাবের সংখ্যাও বাড়বে। বোরোর গানের ক্লাবের সদস্য সার্জ, যদিও জীবনে গানের কলি পর্যন্ত গুণগুণ করে নি। দাবা ক্লাব, সাঁতার ক্লাব···কতো নাম আর করবো।

"তুমি কি কখনো যুদ্ধে গিয়েছিলে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কী দরকার তার? এমনিতেই তো রাইফেলমেনদের ক্লাবে নিয়ে নিলো ওরা আমাকে।···খুব দারুণ কাজ করেছি জানো···শওয়ার্জ কোপফ যখন খবরটা পাবে, বুক ফেটে যাবে হিংসেতে।"

শওয়ার্জকোপফ হারবার্টের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুবছর আগে হারবার্টের এই বাতিকটা দেখে ঠাট্টা করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তারপর থেকে এটা শওয়ার্জকোপফেরও বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"এই সামান্য ব্যাপারে ওর হিংসে হবে না", হারবার্টকে রাগাবার জন্যে বললাম।

"হবেই। দেখে নিও। এতো শুধু মালা আর সদস্যের ব্যাপার নয়, উর্দি পরা…।"

"উর্দি পরা এখন নিষিদ্ধ, জানো না", আমি বাধা দিলাম ওর কথায়, "যদি উর্দি পরা লোক দরকার তবে পুলিশ ক্লাবের সদস্য হও।"

দেখলাম হারবার্ট মনে মনে কথাটা আওড়ে নিলো, তার মানে টোপ গিলেছে। তবুও বিশ্বাস হারাতে রাজী নয় ও, "কিন্তু সভাপতি যে বললো ক্লাবের সদস্যরা উর্দি পরে যাবে।"

"ও বলতে হয় বলেছে।"

"না, না। তা কি করে হয়? এছাড়া সভাপতি কথা দিয়েছে আমায় কবর দেবার সময় সম্মান দেখাবার জন্যে রাইফেল থেকে গুলী দাগা হবে।"

"দাগা হবে ঠিকই, তবে সেটা গোলা-গুলী না, সোডা কিংবা মদের বোতল। জানো না, আজকাল সাধারণ মানুষ রাস্তায় বন্দুক নিয়ে বের হতে পারে না, আইনে মানা আছে।"

হারবার্ট কিছুতেই হারতে রাজী নয়। "ও ভাবতে হবে না, গোপন বন্দোবস্ত থাকবে।…তাছাড়া শওয়ার্জকোপফকে গো হারান হারালাম এটা করে।…সভাপতি বলেছে ওকে কিছুতেই এই ক্লাবে নেওয়া হবে না।"

"ও গোলন্দাজদের ক্লাবে ভর্তি হতে পারে", আমি বললাম নিরীহ মুখ করে, "তাতে রাইফেল না, কামান দাগা হতে পারে?"

চোখ কেঁপে উঠলো হারবার্টের, পরক্ষণেই বলে উঠলো, "যাঃ, ঠাট্টা করছো।…একদিন যাবো তোমাদের ওখানে, কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখবো, এখন থেকে বেছে রাখবো ভাবছি।"

এই কথাটা আমি বেশ কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি। রুটিওলার

বৌ ফ্রাউনাইবুরের মতো এখনো মনস্থির করতে পারছে না। আমি দেখেছি, বিশেষ করে মহিলারা আগে থাকতে তাদের কফিন, কফিনের কাপড়, স্মৃতিস্তম্ভ অর্ডার দিয়ে রাখেন। হারবার্ট কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। ও এসব জিনিষ তো কিনেই ফেলেছে, শুধু তাই না কবর দেবার জায়গাটা পর্যন্ত। একটা পাহাড়ের গায়ে উঁচু মতো জায়গা, সূর্যের আলো পড়ে খুব। মাঝে মাঝে ফোল্ডিং চেয়ার, কফির ফ্লাস্ক আর লজেন্স নিয়ে হারবার্ট ওখানে চলে যায়, বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লক্ষ্য করে আইভি লতার গাছটা কী ভাবে বড় হয়ে উঠছে। অথচ কবরের ওপরে রাখবার স্মৃতিস্তম্ভটা বেছে উঠতে পারলো না।

"তোমাদের নতুন কিছু নেই?" হারবার্ট জানতে চাইলো।

"যা আছে তা তোমার ভাল লাগবে না। তাছাড়া ওটা প্রায় বিক্রিই হয়ে গেছে ধরে নিতে পারো…", আমার মধ্যে সেলসম্যান কাজ করতে শুরু করেছে। টোপটা দিলাম।

"এমন কিছু না তোমার কাছে। তবে জিনিষটা দারুণ। আর বললাম তো বিক্রি হয়েই আছে প্রায়।"

"জিনিষটা কি?"

"সমাধি মন্দির। দারুণ শিল্পকর্ম। শওয়ার্জ কোপফের দারুণ পছন্দ…।"

হারবার্ট হেসে ফেললো, "তোমাদের সেলসম্যানদের এইসব পুরনো কায়দা ছাড়োতো। আমি টোপ গিলছি না।"

"না, যা ভাবছো তা নয় কিন্তু", আমি বললাম, "শওয়ার্জ কোপফ চায় ওটাকে একটা মরণোত্তর ক্লাবঘর হিসেবে ব্যবহার করাতে। ও ঠিক করে রেখেছে উইলে আলাদা করে কিছু টাকা রেখে যাবে যাতে প্রতি বছর ওর মৃত্যু তিথিতে ওখানে একটা উৎসব হয়! তার মানে প্রতি বছর নতুন করে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হওয়া। সমাধি মন্দিরে যে ঘরটা থাকবে তাতে এটা করা সহজ। ঘরটায় বেঞ্চ থাকবে, জানলায় রঙীন কাঁচ লাগানো হবে। উৎসবের পর সামান্য জলযোগের বন্দোবস্ত থাকবে। দারুণ প্ল্যান? একে হারানো শক্ত। অনন্তকাল ধরে স্মৃতিচারণ। অন্য কবরের দিকে কেউ

নজরই দেবে না।"

সার্জ আবার হাসলো আমার কথা শুনে, কিন্তু এবার যেন ও চিন্তায় পড়েছে। একটু পরে বললো, "তাহলে ঐ ধরনের সমাধি মন্দির তোমাদের আছে?"

"ও চিন্তা ছাড়, যেটা আছে সেটা ধরে নাও বিক্রি হয়েই গেছে।—কি সুন্দর হাঁসগুলো দেখ? বাঃ কি রঙের বাহার?" আমি অন্য কথায় আসতে চাইছি যেন।

"আমার হাঁস ভাল লাগে না।···ভাবছি একদিন যাবো তোমাদের ওখানে, সমাধি মন্দিরটা দেখে আসবো।"

"তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। শওয়ার্জ কোপফ ওটার স্থাপনা করুক, তখন দেখতেও ভাল লাগবে।"

সার্জ আবার হাসলো, তবে এবার হাসির ধার কমেছে। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, অথচ দুজনেই টোপ গিলেছি। শওয়ার্জ কোপফের টোপটা সার্জ গিলেছে আর আমি ভাবছি যদি এই তালে ফ্রাউ নাইবুরের অর্ডার দেওয়া সমাধি মন্দিরটা একে গছাতে পারি। মহিলা ওটা আর নিতে চাইছে না। যদি সার্জ ওটা কেনে!"

···আমি হাঁটতে লাগলাম। আলস্টাডটার হফ্ সরাইখানা থেকে তামাক আর বীয়ারের গন্ধ ভেসে আসছে। উঠোন পার হয়ে সরাইখানার পেছন দিকে গেলাম। বেশ শান্ত পরিবেশ। শনিবারের রাতে মদ খেয়ে যারা হুঁস হারিয়েছিল তারা ওখানে পড়ে আছে। ওদের মুখের কাছে মাছি ঘুরছে।

গার্দার জানলার দিকে তাকালাম, এত সকালেও ওটা খোলা। একজন মাতাল নেশার ঘোরেই সাহায্য চাইলো। আমার মনে হলো সারা উন্মত্ত পৃথিবী যেন একে অপরের কাছে সাহায্য চাইছে।

—প্রার্থনা শেষ, মাদার সুপিরিয়ার আমার পাওনা চুকিয়ে দিলেন। এতো সামান্য টাকা না নিলেও পারি, অথচ ওঁরা দুঃখ পাবেন বলে মুখ বুজে নিই।

"জল খাবার তেমন কিছু নেই, এক বোতল ভাল মদ পাঠিয়ে দিচ্ছি",

মাদার সুপিরিয়ার বললেন।

"ধন্যবাদ।—একটা কথা এতো দামী মদ আপনারা পান কোত্থেকে?"

মাদার সুপিরিয়ারের কোঁচকানো-তোবড়ানো মুখে হাসি ফুটলো। "একজন ভক্ত আছেন, তাঁর মদের ব্যবসা। ওঁর স্ত্রী এখানে বহুদিন ছিলেন, ভাল হয়ে যান। তারপর থেকে কয়েক পেটি মদ দিয়ে যান প্রত্যেক বছর।"

"মাদারের কথার ফাঁকে মনে পড়লো সকালের জলখাবারের টেবিলে বোদেনদিয়েকও আছেন। মদের বোতল বোধ হয় সব সাবাড়। তাড়াতাড়ি ছুটলাম। যা ভেবেছি তাই। অর্দ্ধেক শেষ। ডাক্তারও বসে গেছেন। কিছু বলে আর লাভ নেই, তবু বললাম, "এই বোতলটা কিন্তু মাদার সুপিরিয়ার আমার পারিশ্রমিকের অংশ হিসেবে আমার জন্যেই পাঠিয়েছেন।"

"তা জানি," বিশপের প্রতিনিধি এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আরে এও জানি তুমি ক্ষমা আর সহ্যের প্রতিমূর্তি। বন্ধু-বান্ধব যদি দু-এক ফোঁটা খায়ই তোমার না বলার কিছু থাকা উচিত না।"

এঁদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই ভেবে আমি চুপ করে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি গ্রফেনস্ট্রাফেতে রাস্তা দিয়ে চলেছে প্রতিবাদ মিছিল। যুদ্ধে যারা অঙ্গ হারিয়েছে তারা সার বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে—যে পেনসন ওদের দেওয়া হচ্ছে তাতে একেবারেই জীবন ধারণ করা যায় না।

মিছিলের আগে একটা বাক্সর মতো ঠেলা গাড়ী, চার চাকার ওপর বসানো। তাতে একজন বসে আছে, যার দুটো পা, আর দুটো হাতই নেই, শুধু ধড় আর মাথা। তারপর তিনটে হুইল চেয়ার, পা কাটা তিন-জন প্রাক্তন যোদ্ধা। অনেকে আবার ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। কারুর কারুর হাতে পোস্টার—নানারকম দাবী লেখা তাতে। এককালে এরা পেনসন ভালই পেতো, কিন্তু বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে। ডলারের দাম হু হু করে বাড়ছে। গতকাল ছিল বারো লাখ মার্ক, আজ ১৪ লাখ। আগামীকাল হয়তো কুড়ি লাখ হয়ে যাবে।

এখন এখানে কলকারখানায় শ্রমিকদের সকালে বিকেলে মজুরী দেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে কাজের ফাঁকে আধ ঘণ্টা ছুটি, কারণ সামান্য দেরী হলেই জিনিসের দাম বেড়ে যেতে পারে।

মিছিল চলেছে খুব আস্তে আস্তে। ওদের পেছনে আছে পিকনিক করার দল। ছুটির দিন কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে, অনেকে গাড়ী করে বেরিয়ে পড়েছে দূরে কোথায় চলে যাবে। ঘুরবে, নাচবে, খাবে। কি আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য। একদল বিকলাঙ্গ মানুষ বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম মুখর হয়ে উঠেছে, অন্যদল ফুর্তি করার ব্যাপারে উন্মত্ত। সামনে বাধা বলে তাদের কি রাগ!

খুব দামী একটা গাড়ীতে এক ছোকরা বান্ধবী নিয়ে হর্ণ দিয়ে পেছন থেকে এগিয়ে আসছিল। ও যাতে চলে যেতে না পারে তার জন্য মিছিলকারীরা সারা রাস্তা জুড়ে হাঁটতে শুরু করলো। ছোকরা ব্যাজার মুখে গাড়ী থামিয়ে সিগারেট ধরালো। এগোতে এগোতে মিছিল গির্জার কাছে এসে অন্য পথে যেতেই পেছনের লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

…রেডমিল নাইট ক্লাবে বসে আছি। সামনে শ্যাম্পেনের বোতল। আজ এর দাম কুড়ি লাখ মার্ক। এই পরিমাণ টাকা সারা মাসে পেনসন পায় ঐসব বিকলাঙ্গরা। শ্যাম্পেনের দামটা অবশ্য দিচ্ছে রাইজেনফেল্ড। ও এমন ভাবে বসেছে যাতে নাচের জায়গাটা পুরো দেখা যায়।

"ওর কথা আমি বরাবরই জানতাম," রাইজেনফেল্ড আমাকে বলছিল, "আমি শুধু দেখছিলাম তুমি আমাকে নিয়ে কতোটা মজা করতে চাও। ভদ্রবাড়ির মহিলা ঐরকম গলিতে থাকে না।"

"এটা তোমার ভুল ধারণা। তুমি একটা অভিজ্ঞ লোক, তুমি একথা বলো কি করে? মুদ্রাস্ফীতির ফলে আজকাল সকলের অবস্থা অনেক নীচে নেমে গেছে। রাজকুমারী রাণীদের যুগ এখন শেষ… ।"

"দোহাই চুপ করো…আর জ্ঞান দিয়ো না। ওয়াটজেকের বৌ লিসার সম্বন্ধে আমি প্রথম থেকেই সব জেনে গিয়েছিলাম।…আমি শুধু

দেখছিলাম আমাকে ঠকাবার ব্যাপারে কতোদূর এগোতে পারো তুমি।"

ও ঝুঁকে পড়ে লিসাকে দেখলো। লিসা তখন জর্জে'র সঙ্গে ফক্স ট্রট নাচছে। আমার খুব ইচ্ছে করছিল রাইজেনফেল্ডের মুখের ওপর বলি তুমিই একদিন লিসাকে দেখে বলেছিল খাঁটি প্যারিস নন্দিনী, ছিপছিপে চিতাবাঘিনী। কিন্তু তা বললে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, আমাদের ব্যবসা মার খাবে।

"তাতে অবশ্য লিসার সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণায় কোনো ঘাটতি পরে নি," রাইজেনফেল্ড বলতে লাগলো, "বরং আকর্ষন বেড়েছে। …গ্যাখো গ্যাখো কেমন নাচছে…ঠিক যেন…।"

"ছিপছিপে চিতাবাঘিণী।" কথাটা জুগিয়ে দিলাম।

রাইজেনফেল্ড আমার দিকে তাকালো, "মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়ে-মানুষ জাতটাকে বেশ ভালই চিনেছ তুমি।"

"তোমার কাছ থেকেই শেখা।"

আমার কথায় দারুণ খুশি হলো সে। আমি কি জানি কেন ওকে একটা প্রশ্ন করে বসলাম, "একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না… ওডেনওয়াল্ডে নিজের বাড়িতে তুমি থাকো, তখন তোমাকে বেশ সম্মানিত নাগরিক, সুখী গৃহস্থ বলে মনে হয়।—তোমার তিন ছেলে মেয়ের ফটোও দেখেছি আমি। বাড়িও বেশ সাজানো। অথচ সেই তুমি নাইটক্লাবে এসে নেকড়ের মতো লোভী হয়ে পড়ো কেন?"

"সৎ নাগরিক আর গৃহস্থের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে অনেক বেশি আনন্দ পাবার জন্যে," সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো রাইজেনফেল্ড।

"কারণটা মন্দ বলো নি। তবে এত ঘুরিয়ে কাজ করার লাভ কি?"

রাইজেনফেল্ড দাঁত বের করে হাসলো। "আরে ঐটাই তো আমার দোষ। আমার মধ্যে একটা অপদেবতা আছে। দ্বৈত সত্তা। কথাটা এর আগে শোনো নি কখনো?"

"শুনি নি? আমিই তো তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।"

"তুমি?" এমনভাবে ব্যঙ্গ করে হাসলো যে আমি গুটিয়ে গেলাম। ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠাট্টা করে হঠাৎ অর্কেসট্রা বাজনা বদলালো।

লিসা আর জর্জ ফিরে এসেছে টেবিলে। দারুণ সুন্দর একটা গাউন পরেছে লিসা।

উদার হয়ে গিয়ে রাইজেনফেল্ড আমাদের সবাইকে খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলো। তারপর লিসার সামনে গিয়ে কোমর ঝুঁকিয়ে 'বাও' করে বললো, "একটু ট্যাঙ্গো নাচলে কৃতার্থ হবো মাদাম।" লিসা রাইজেনফেল্ডের চেয়ে একটু লম্বা। বয়েস কম। ট্যাঙ্গো নাচে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়। ভাবলাম রাইজেনফেল্ডের অবস্থা সঙ্গীন হবে। কিন্তু আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দুর্দান্ত নাচতে লাগলো সে।

"কেমন লাগছে জর্জ?" আমি প্রশ্ন করলাম, "বেশি মাথা ঘামিয়ো না এটা নিয়ে।...একটা কথা, সকালে লিসা তোমার ঘর থেকে পালালো কি করে?"

"খুব অসুবিধের মধ্যে পড়ে ছিলাম। রাইজেনফেল্ড তো নড়বে না। ও আমার ঘরটাকে ঘাঁটি করে লিসার জানলায় নজর রাখতে চায়। শেষ পর্যন্ত কোনরকমে ওকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে রান্না ঘরে নিয়ে যাই। সেই ফাঁকে লিসা পালায়। রাইজেনফেল্ড যখন আমার ঘরে এলো তখন লিসা নিজের জানলায়।...রাইজেনফেল্ড ওকে নেমন্তন্ন করে বসলো ওখান থেকেই।"

"ওর এটা উচিত হয় নি।"

"না, বেশ ভদ্রভাবেই করেছিল। তাছাড়া লিসা দেখলো এতে আমাদের ব্যবসার সুবিধে হতে পারে।"

"আর সে কথা তুমি বিশ্বাস করলে?"

"হ্যাঁ," জর্জ খুশি মনে উত্তর দিলো।

লিসা আর রাইজেনফেল্ড ফিরে এলো। রাইজেনফেল্ড বেশ ঘামছে, লিসা শসার মতো ঠাণ্ডা। আমাকে চমকে দিয়ে ওখানে ঢুকলো অটো; তারপরেই উইলি। রেণীও বাদ গেল না।

আড্ডা জমে উঠলো। অটো কয়েকটা কবিতা লিখে ফেলেছে আয়রন হর্সকে নিয়ে। ও এবার সার্কাসের মহিলাকে নিয়ে লিখবে। অর্থাৎ গার্দার কথা শুনে ফেলেছে। আমি একটু রাগত ভাবে বললাম,

"তুমি এক নম্বরের হাঁদা। মাথায় কিচ্ছু নেই। একটা কথা বলে রাখি অপরের মেয়েমানুষের ওপর নজর দিতে নেই।"

"যত্তোসব বুর্জোয়া কুসংস্কার," অটো কাসতে কাসতে বললো "আমি তো কারুর বৌয়ের কথা বলছি না।"

"আমিও বলছি না। বৌদের ব্যাপারে অন্য নিয়ম, অতো কড়াকড়ি না করলেও চলে।···কিন্তু তুমি কি করে জানলে সার্কাসের মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে? বলেইছি তো ও সার্কাসে টিকিট বেচতো।"

"উইলি বলেছে তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। মেয়েটা সার্কাসে কসরৎ দেখাতো।"

"তাই নাকি। আসলে উইলি যে মেয়েটাকে নিয়ে নাচছে, ওই মেয়েটাই সার্কাসের মেয়ে।"

অটো আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করলো না। ওদিকে রাইজেনফল্ড আবার নাচতে শুরু করেছে লিসাকে নিয়ে।

"আজ সব উল্টোপাল্টা হচ্ছে কেন জর্জ?" আমি বললাম। ভ্রূ-কুঁচকালা জর্জ।

"তোমার বান্ধবীকে নিয়ে রাইজেনফেল্ড নাচছে, আমার বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে অন্য একজন। আমাদের বান্ধবীদের আকর্ষণ কি লোকেদের কাছে এতে বেড়ে গেছে রাতারাতি?"

"জানোই তো, অন্যের মেয়েমানুষের আকর্ষণ পাঁচগুণ বেশি হয় সব সময়। তবে মজা দেখো···একটু পরে লিসা আসবে, মাথা ব্যথার নাম করে চলে যাবে এখান থেকে।"

"রাইজেনফেল্ড তাহলে কিন্তু মনে খুব আঘাত পাবে।"

"থাক, ক্ষতি হবে না। আমাদের ব্যবসা আরও বাড়বে। গার্দা কোথায়?" জর্জ প্রশ্ন করলো।

"নিশ্চয়ই ওয়াল হাল্লায় এডুয়ার্ডের সঙ্গে।" আমার কথা শেষ হবার আগেই অটো মুখ বাড়িয়ে বলতে শুরু করলো, "সার্কাস নিয়ে কবিতা কেমন হবে?"

আমি ওকে একগ্লাস মদ বাড়িয়ে দিয়ে বেশ মাতব্বরের মতো বললাম,

"খাও হে খোকা, মদ দাও।" লিসা রাইজেনফেল্ড টেবিলে ফিরে এসেছে। একটু পরে লিসা বলে উঠলো, "হঠাৎ ভীষণ মাথা ব্যথা করছে, যাই একটু অ্যাসপিরিন খেয়ে আসি···।"

রাইজেনফেল্ড চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। খুব নিশ্চিন্ত মনে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো জর্জ, ঠোঁটে আত্মতৃপ্তির হাসি।

॥ ১৬ ॥

"কি স্নিগ্ধ আলো" ইসাবেল বললো, কেন যে এই আলো মলিন হয়ে আসে? আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই বলে কি? প্রত্যেক রাতেই আলো হারিয়ে যায়। আমরা যখন ঘুমোই পৃথিবী চলে যায়। তাহলে আমরাই বা থেকে কি করবো? পৃথিবী কি রোজই আবার ফিরে আসে রুডলফ?"

বাগানের শেষ প্রান্তে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলাম মাঠে পাকা ফসলের ওপর অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা কিভাবে তার মায়া-জাল ছড়াচ্ছে।

"সব সময়েই ফিরে আসে," খুব সাবধানে জবাব দিলাম আমি।

"আমরা? আমরাও কি ফিরে আসি?"

আমরা? মনে হয়। তবে সঠিক ভাবে তো বলা যাচ্ছে না। প্রতিটি মুহূর্ত দেয় আর নেয়, পরিবর্তন ঘটিয়ে চলে। কিন্তু সেটা আমরা মুখে বলি না। আমি চাইছিলাম না ইসাবেলের সঙ্গে এরকম আলোচনার ফাঁদে পড়তে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখানকার পাগল-আশ্রমের যে-সব রোগীরা মাঠে গিয়ে কাজ করে তারা ফিরে আসছে একে একে।

"ফিরে আসি ইসাবেল। যার অস্তিত্ব আছে তা কখনও চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে পারে না।"

"কথাটা তুমি বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না করে উপায় কি বলো?"

ইসাবেল মুখ ফেরালো, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভারী অপরূপ লাগছিল

তাকে। "তা না করলে কি আমরা হারিয়ে যাবো?" ইসাবেল ফিসফিস করে বললো, "তাহলে কি তুমি আমিও হারিয়ে যাবো? চিরকাল থাকবো না?"

"না, আমরাও থাকবো না।"

"দুজনে দুজনকে ভালবাসলেও না?" ইসাবেলের গলায় দৃঢ়তা।

"তাতেও না। অথচ মানুষ ঐটাই বিশ্বাস করে পরস্পরকে ভালবাসে।"

মাঠ থেকে যারা ফিরছিল তাদের জন্যে দারোয়ান গেট খুলে রেখেছে, হঠাৎ ভেতর থেকে একজন ছুটে বেরিয়ে গেলো মাঠের দিকে। অন্য দারোয়ান তাকে তাড়া করলো। কিন্তু না পাগলাটাকে ধরতে পারছে না।

দারোয়ানটার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"তোমার সঙ্গী কী ওকে ধরতে পারবে?"

"ঠিক ধরে নিয়ে আসবে।"

"মনে তো হচ্ছে না।"

দারোয়ান হেসে বললো, যে পালাচ্ছে তার নাম গুইদো তিম্পে। প্রতি মাসেই একবার করে পালায়। কাছেই একটা রেস্টুরণ্ট আছে সেখানে গিয়ে বীয়ার খায়। ওকে ওই রেস্টুরেণ্টে পাওয়া যাবেই জেনে আমার সঙ্গী তাড়াহুড়ো করছে না। দু-তিন বোতল খাবার পর ও নিজেই বাধ্য ভেড়ার মতো ফিরে আসবে এখানে।

ইসাবেল আমাদের কথায় কান দেয় নি। ও জিজ্ঞেস করলো, "ওই লোকটা কোথায় যেতে চায়?"

"বীয়ার খেতে। প্রত্যেকেরই তো জীবনের একটা লক্ষ্য আছে।"

অন্যমনস্ক ভাবে ইসাবেল আবার বললো, "তুমিও কি পালাতে চাও?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"পালিয়ে যাবার কিছু নেই রুডলফ, যাবারও কোনো জায়গা নেই। সব দরজাগুলোই সমান। বাইরে···"

ইসাবেল ইতস্ততঃ করছে দেখে প্রশ্ন করলাম, "দরজার বাইরে কি

আছে?"

"শূন্যতা। ওগুলো নিছক দরজা। বাইরে কিছুই নেই।"

ধীরে ধীরে পার্কে আলো জ্বলে উঠলো। আর কথা না বাড়িয়ে ইসাবেল আমার হাত ধরে বললো, "এসো।"

"তুমি আমায় কখনো ছেড়ে যেও না রুডলফ।"

"যাবো না।"

"কখনোই না।" ইসাবেল বললো দূরের দিকে তাকিয়ে।

রূপোর ধূপদানী থেকে ধূপের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সর্বত্র পবিত্র ভাব। বোদেনদিয়েক টুকিটাকি কাজ করছেন। কালো পোষাক পরা সন্ন্যাসিনীরা গম্ভীর ভাবে হাঁটু মুড়ে বসে। মোমের স্তিমিত আলো ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ এক মহিলা উঠে গিয়ে বেদীর সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। অন্যান্য রোগীরা হাঁ করে তাঁকে দেখতে লাগলো। ইসাবেল আগে উপাসনায় আসতো, আজকাল আর আসতে চায় না।

দুজন সন্ন্যাসিনী মেঝে থেকে মহিলাকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। তখনও কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

...ইসাবেল বাগানে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে কেউ থাকলে সন্ধ্যের সময় ওকে বাগানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন ডাক্তার।

"ওখানে কী করছিলে?" বেশ রাগ হয়েছে ইসাবেলের।

"অর্গান বাজাচ্ছিলাম।"

"কী হয় ওসব বাজিয়ে?"

আমি ইসাবেলকে সংগীতের ভাব গম্ভীর রূপটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। ইসাবেলের মনে সে-সব যে খুব একটা দাগ কাটলো মনে হলো না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি একটা ফোয়ারার কাছে। হাতে করে খানিকটা জল অকারণে ছিটিয়ে দিয়ে ইসাবেল বলে উঠলো, "দিনের বেলায় স্বপ্নগুলোর কী হয় রুডলফ?"

"হয়তো ঘুমিয়ে থাকে," খুব সাবধানে উত্তর দিলাম, কারণ এ প্রশ্নের

পরিণতি কি হবে তা বলা মুস্কিল।

"কী করে ঘুমোবে? ওরা তো আসলে জীবন্ত ঘুম। একমাত্র ঘুমের মধ্যেই তো স্বপ্ন দেখা যায়। তবে দিনের বেলায় ওদের কি হয়?"

"হয়তো ওরা সমুদ্রের তলায় কোনো গুহার মধ্যে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে কিংবা পেঁচার মতো গাছের কোটরে ঘুমোয়। রাতের জন্যে অপেক্ষা করে।"

"আর রাত যদি না আসে?" ইসাবেলের প্রশ্ন।

"রাত আসবেই।"

"তুমি এতো জোর দিয়ে বলছ কেন রুডলফ।

"তুমি বাচ্চাদের মতো কথা বলছো ইসাবেল।"

"বাচ্চারা কি ভাবে কথা বলে?"

"তোমার মতো করে। প্রশ্ন করেই চলে, থামে না। এক সময়ে বয়স্করা আর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, এবং রেগে যায়।"

"কেন রেগে যায়?"

"ওরা যে ভুল করছে এটা বুঝতে পেরে রাগ করে।"

"তুমি ভুল করো রুডলফ?"

"করি। তবে ঠিকমতো বুঝতে পারি না বলে রেগে যাই।"

"আহ্, রুডলফ, কিছুই ভুল নয়, অন্যায় নয়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ন্যায় অন্যায়, বা কোনটা ভুল কোনটা ঠিক এটা বুঝতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের কাছে ন্যায় অন্যায় নেই। সব কিছুই তো ঈশ্বর। তাঁর বাইরে কিছু থাকতে পারে না। ফলে সব কিছুই ন্যায়সঙ্গত, তা না হলে ঈশ্বরকে মানা যায় না।"

ইসাবেলের ব্যাখা শুনে চমকে উঠলাম আমি। ও যা বলছে তা যদি ঠিক হয় তবে নরক বা শয়তান কিছুই নেই। কিংবা যদি থাকে তাহলে ঈশ্বর থাকতে পারে না।

আমার কথা শুনে ইসাবেল ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। "তা ঠিক রুডলফ। আমাদের যতো শব্দ আছে। কিন্তু কে ওঁদের আবিষ্কার করলো বলো

তো।"

"বিভ্রান্ত মানুষ," আমার উত্তর।

গির্জার ছুঁচলো চূড়োর দিকে মাথা হেলিয়ে ইসাবেল বললো, "ওখানে যারা থাকে তারা। ওরা তাঁকে ওখানে বন্দী করে রেখেছে। তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন না। চান নিশ্চয়ই, কিন্তু ওরা তো ওঁকে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে।"

"কারা?"

"পুরোহিতেরা।"

"ওরা কিন্তু অন্য লোক ছিল," আমি বললাম, "সেই দুহাজার বছর আগে।"

"এরা সব সময়েই এক লোক হয় রুডলফ। তুমি কি জানো না?" ইসাবেল ফিস ফিস করে বললো, "ওরা তাঁকে বন্দী করে রেখে ধূপধুনো দিয়ে পূজো করে। কারণটা জানো কি?"

"না।"

"উনি ভীষণ বড়লোক। ওঁর প্রচুর ধনসম্পদ। সেই জন্যে ওরা ওঁকে আটকে রেখেছে। ছেড়ে দিলে তো উনি তাঁর সম্পত্তি নিয়ে চলে যাবেন। ওই লোকগুলোর তাতে তো ভীষণ অসুবিধে হয়ে যাবে, বড়লোকী চালে চলতে পারবে না। আমার ব্যাপারেও তো তাই।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "কি বলছো তুমি?" ইসাবেল হাসতে লাগলো, "তুমি তো জানো রুডলফ ওরা আমাকে এখানে এনে রেখেছে ওদের পথের বাধা সরাবার জন্যে। ওরা আমার সম্পত্তি নিয়ে ভোগ করছে। আমি এখান থেকে ফিরে গেলে ওদের অসুবিধে হবে। যাকগে, আমি ওসব চাই না।"

"তুমি যে সম্পত্তি চাওনা একথা জানিয়ে দিলে তো ওরা তোমাকে এখানে রাখবে না।"

"আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তাই এটাই বা খারাপ কি। অন্ততঃ ওরা তো এখানে নেই। ওরা মশার মতো, সব সময় আমায় কামড়াতে চায়। তাই তো এখানে আমি ছদ্মপরিচয়ে থাকি।"

"তুমি আত্মগোপন করে থাকো ?"

"হ্যাঁ। তা নাহলে এরা আমায় ধরে পেরেক পুঁতে রেখে দেবে। তবে ওরা বোকা, ওদের ঠকানো খুব সহজ।"

"তুমি কি ওয়েরনিককেও ঠকাও ?"

"সে কে ?"

"ডাক্তার।"

"ওহ্ কে ? ও তো সব সময়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। ডাক্তারও আর পাঁচজনের মতো। এখানে কতো বন্দী রুডলফ। তবে এখানকার লোকেরা একমাত্র ঐ পেরেক বেঁধা লোকটিকে সব চেয়ে বেশি ভয় পায়।"

"কারা।"

"যারা তাঁকে কাজে লাগাচ্ছে, যাঁর সম্পদ ভোগ করছে। এরা যে সংখ্যায় কতো তার হিসেব নেই। এরা অবশ্য নিজেদের খুব সৎ বলে। কিন্তু তা না। যারা সৎ তাদের রক্ত ঝরে।"

"তা ঠিক", আমি মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যে উঠছি তা বুঝতে পারলাম। "যারা নিজেদের সৎ বলে, ধার্মিক বলে তারা ভীষণ নিষ্ঠুর।··· ওদের কাছে যেও না রুডলফ। ওদের উচিত ওঁকে ছেড়ে দেওয়া। যাতে উনি আবার হাসতে পারেন, খেলতে পারেন, গান গাইতে পারেন।"

"তোমার কী ধারণা ?"

"সবারই তাই। তবে ওঁকে ছেড়ে দিলে এদের খুব বিপদ হবে, কারণ তিনি যে পরম করুণাময়।"

"তাই কি ওরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে ?"

"হ্যাঁ", ইসাবেল বললো, "অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তা না হলে আবার তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করতে হবে।"

"হ্যাঁ। আমারও তাই ধারণা। সততা আর ভালবাসার নামে ওরা আবার তাঁকে হত্যা করবে।"

ইসাবেল কেঁপে উঠলো, "তাই তো আমি ওখানে যাই না।" গির্জাটা দেখালো কে। "ওরা সব সময় বলে কাউকে না কাউকে কষ্ট পেতেই হবে। কেন রুডলফ ?"

আমি উত্তর দিলাম না।

আমার বুকে মাথা রেখে ইসাবেল বললো, "কে আমাদের কষ্ট দেয় রুডলফ?"

"ঈশ্বর। যদি অবশ্য ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন। যিনি আমাদের স্রষ্টা।"

"এর জন্যে তবে ঈশ্বরকে শাস্তি দেবে?"

"কী বললে?"

"আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্যে কে ঈশ্বরকে জেলে পাঠাবে ফাঁসী, দেবে?"

"ও কথা আমি ভেবে দেখি নি। বিশপের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করবো।"

কথা না বাড়িয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ইসাবেল প্রশ্ন করলো, "শুনতে পাচ্ছো?"

"কি?"

"পৃথিবীটা কেমন যেন ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠলো। ছোটবেলায় আমার ভয় হতো পৃথিবী লাফিয়ে উঠলে আমি পড়ে যাবো, তাই বলে রাখতাম আমাকে যেন খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।...মধ্যাকর্ষণ বিশ্বাস করো?"

"হ্যাঁ। মৃত্যুর মতোই সত্যি।"

"তা জানি না," ইসাবেল হাসছে,...হঠাৎ যেন ও খুব বাচ্চা হয়ে উঠেছে। চাঁদের আলোয় ওর মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে। আমার কি হলো বলে ফেললাম, "তোমাকে ডাইনীর মতো লাগছে।"

"ডাইনী?", ইসাবেলের ঠোঁটে রহস্যময়ীর হাসি," এতোদিনে চিনতে পারলে আমায়?" তারপর কোনো কথা না বলে একটানে স্কার্টটা খুলে ফেললো, তলায় কোনো অন্তর্বাস নেই। চটপট সাদা ব্লাউজটাও খুলে দিলো। দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকলো, "এসো।"

ভয় পেয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম আমি, আঃ...এই সময় যদি বোদেনদিয়েক চলে আসেন, কি ডাক্তার?...নিজের ওপরে খুব রাগ হতে লাগলো আমার।

"ইসাবেল পোষাক পরে নাও।"

"পরতেই হবে ? কেন রুডলফ ?" হাসতে হাসতে ও এগিয়ে এসে আমার জামার বোতামে হাত রাখলো। খুলে ফেলেছে। ওর ঠাণ্ডা হাত আমার বুকে। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। হঠাৎ ওর মধ্যে থেকে আর একটা সত্তা বেরিয়ে এসেছে যেন। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর দিয়ে ও যেন আমাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। আমি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম, হঠাৎ মনে হলো ইসাবেল অসুস্থ, এখন কিছু করা মানেই বলাৎকার করা হবে। আমি ওকে ঠেলে দিলাম আলতো ভাবে।

"ভয় পাচ্ছ ? কীসের ভয় ?" ইসাবেল ভীষণ ভাবে ঘনিষ্ট হয়ে উঠছে আমার সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে জোরে ধাক্কা দিলাম। ও ছিটকে পড়ে গেলো মাটিতে। তারপর আমাকে চমকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল। ওযে এতো খিস্তি খেউড় জানতো তা আমি ভাবতে পারি নি।

"চুপ করো", গর্জন করে উঠলাম আমি, "তা নাহলে···"

"তা নাহলে কী করবে ?"···ইসাবেল যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে, শরীরটাকে বেঁকিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্রী ভঙ্গি করে বললো, "তা নাহলে কী করবে করো ?"

এই মেয়েকে ভালবাসা যায় কি যায় না বুঝতে পারছি না, অথচ আমার সর্বসত্তা মোমের মতো গলে গলে পড়ছে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ইসাবেল মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো, তার পরে ফিসফিস করে বললো, "চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে।" আর কোনো কথা না বলে স্কার্টটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে পতাকার মতো দোলাতে দোলাতে ইসাবেল চলে গেল ভেতরের দিকে। আমার মনে সান্ত্বনা একটাই, এর আগেও অনেক মহিলা পাগল নগ্ন হয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জামাটা ঠিক করে নিয়ে আমিও ফিরলাম।

···মাঝ রাতে এলোমেলো পায়ের আওয়াজে বুঝতে পারলাম নোপফ ফিরছে মাতাল অবস্থায়। আজকে যেন ও বেশ সাবধানী। চারপাশে তাকালো কেউ জেগে নেই। সব দরজা জানলা বন্ধ। ধীরে ধীরে ও গেল

সেই কালো অবিলিস্কটার কাছে। ধূর্তের মতো ভান করলো যেন প্যাণ্টের বোতাম খুলছে। আমিও চুপচাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছি। ও নিশ্চিন্ত হবার পর যেই সত্যিকারের কাজটা শুরু করতে যাবে পাইপে মুখ লাগিয়ে চাপা গলায় আমি বলতে শুরু করলাম, "নোপফ, এই শূয়োর, আবার ঐ কাজ, তোকে আমি মানা করি নি আগে ?"

সঙ্গে সঙ্গে নোপফ চমকে উঠলো, ভীষণ ভয় পেয়েছে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে শেষে আমি বললাম, "তোকে সার্জেন্ট মেজরের পদ থেকে বরখাস্ত করে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈনিকে নামিয়ে দিলাম।"

"না, না, তা করবেন", আর্তনাদ করে উঠলো। "ঠিক আছে সারা সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যদি সংযত থাকিস তাহলে ভেবে দেখবো। এখন ভালমানুষের মতো বোতাম লাগিয়ে ঘরে ফিরে যা।"

হুড়মুড় করে পাললো নোপফ। জর্জের ঘর থেকে চাপা হাসির শব্দ শুনলাম, লিসার।

আমার অকারণ উত্তেজনা চাপবার জন্যে রাইজেনফেল্ডের উপহার দেওয়া মদের বোতল খুলে বসলাম। বেশ কড়া মদ।

॥ ১৭ ॥

কফিন-মিস্ত্রী উইলকি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মহিলাটির দিকে, "ছোট ছোট দুটো নিচ্ছেন না কেন ? দাম তো বেশি পড়বে না।" মহিলা ঘাড় নাড়লেন, "ওরা এক সঙ্গেই থাকবে।"

"দেখুন, শেষ পর্যন্ত তো একই কবরে থাকবে দুজনে, তাহলেই তো একই সঙ্গে থাকা হয়ে যাবে", বোঝাবার চেষ্টা করি। "না, তাতে কাজ হবে না।"

মাথা চুলকে উইলকি আমার দিকে তাকালো—"তুমি কি বলো ?

মহিলাটির দুটি বাচ্চা মারা গেছে একই দিনে। এখন ওঁর ইচ্ছে দুজনে এক কবরে তো থাকবেই। কফিনও একটা হবে। তার মানে জোড়া কফিন চান। উইলকিকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি কথা বলার জন্যে।

"ব্যাপারটা তো সহজই—কবরের ফলকে দুজনের নাম থাকবে। এতো

হামেসাই হচ্ছে", আমি বললাম। "সেতো হলো", মহিলা ঘাড় লাড়লেন, কিন্তু কফিনে ওরা পাশাপাশি শোবে। ওরা তুজনে সব সময় এক সঙ্গে থাকতো।" "দেখতে ভাল হবে না কিন্তু। কেমন যেন চৌকো মতোন হয়ে যাবে কফিনটা", উইলকি পেন্সিল বের করলো পকেট থেকে, "ওরা তো বাচ্চা? কতো বয়েস ছিল?"

"সাড়ে চার।"

"একে বারে চৌকা হয়ে যাচ্ছে", উইলকি কাগজে নক্‌শা এঁকে দেখালো, "তার চেয়ে বরং···।"

"না।" মহিলা মাঝ পথে বাধা দিলেন, "ওরা তুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকবে। ওরা যমজ ছিল। কফিন দেখতে খারাপ হলেও কিছু যাবে-আসবে না ওদের জোড়া দোলনা ছিল, জোড়া গাড়ী ছিল। অতএব জোড়া কফিনও হবে।"

বাচ্চা তুটো তো ছোট, ফলে যতোবারই আঁকে ততোবারই উইলকি দেখে নক্‌শাটা বেঢপ চৌকো হয়ে যাচ্ছে। শেষে মরীয়া হয়ে বলে উঠলো, "এরকম করতে দেবে কিনা জানি না।"

"দেবে না কেন?"

"একটু অস্বাভাবিক না?"

"তুজনে একদিনে মারা যাওয়াটাও তো অস্বাভাবিক", মহিলা বেশ জেদী হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ।

"তা ঠিক, বিশেষ করে ওরা যখন যমজ ছিল", উইলকি হঠাৎ বেশি আগ্রহ দেখাতে শুরু করলো, "তুজনের কি একই অসুখ করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"একই অসুখে···তাই না। যমজদের নাকি এমনিই হয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও···", উইলকি বাধা পেলো আমার কাছ থেকে, "কফিনটার কি করবে? যা হয় একটা ঠিক করো।" আমি বুঝতে পারছিলাম মহিলার সঙ্গে অকারণ কথা বড়িয়ে লাভ হবে না, উনি যা চান তাই করতে হবে।

"ঠিক আছে······কিন্তু একটা কথা ওদের ব্যাপটাইজ করা হয়েছিল কী ভাবে?"

মহিলা যেন এবার একটু চুপসে গেলেন। "একজন কাথলিক, অন্যজন ইভান জেলিক্যাল।...আমার দুজনেই রাজী ছিলাম এ ব্যাপারে। আমার স্বামী ক্যাথলিক, আর আমি ইভান জেলিক্যাল, তাই একজন ক্যাথলিক অন্যজন ইভান জেলিক্যাল মতে দীক্ষিত হয়েছিল।"

"নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা গীর্জায়?" উইলকির উৎসাহ বাড়ছে।

"হ্যাঁ।"

"দুজনে কি একই রকম দেখতে?"

"হ্যাঁ"

"তাহলে কফিনে পাশাপাশি রেখে ক্যাথলিক আর কে ইভান জেলিক্যাল ধরবেন কি করে?" উইলকি যেন মহিলাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

মহিলার মুখে কথা নেই। উইলকি মহা উৎসাহে বলে যাচ্ছে, "শুধু কি তাই দুই মতের গির্জা থেকে দুজন পুরোহিত একই সঙ্গে আসবেন তো কবর দেবার সময়? তাঁরা রাজী হবেন তো?"

"আমার স্বামী গেছেন কথাবার্তা বলার জন্যে।"

"আমার সত্যি জানতে ইচ্ছে করে..."

"আপনি কফিনটা করে দেবেন কি না বলুন", মহিলার সেই এক কথা।

"দেবো নিশ্চয়ই...।"

"কতো দাম পড়বে?" মহিলা যেন কথা বাড়াতে চান না।

উইলি মাথা চুলকে বললো, "কবে দরকার?"

"যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

"তাহলে তো রাত জেগে কাজ করতে হবে দেখছি, খরচ বাড়বে।"

"দামটা বলুন।"

"তৈরী হয়ে গেলে বলবো কত খরচ পড়েছে। তবে তখন যেন বলবেন না যে দরকার নেই।"

"আমি আগাম কিছু নিয়ে যাচ্ছি।" মহিলা কালো চামড়ার একটা টাকার ব্যাগ বের করলেন।

"দশ লাখ দিয়ে যান", বেশ বিব্রত ভাবে বললো উইলি।

গুণেগুণে নোট দিলেন মহিলা, "আর নাম ঠিকানা গুলোর কী হবে? আজই দিয়ে যাই…।"

"আমি তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, কফিনের মাপের সঙ্গে ওগুলোও আনবো।"

এবার মহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন, "মাথার দিকে যে পাথর বসানো হবে তার কত দাম পড়বে?"

"তাড়া হুড়ো করবেন না", আমি জানালাম, "কবরের মাটি একটু বসে যায় তো। তাই উচিত কয়েকদিন অপেক্ষা করা। তা নাহলে আবার পাথরের ভিত বসাতে হয়।"

তাই করুন। আমি চাই প্রথম থেকেই কবরের পাথরে নাম খোদাই করা থাকবে ওদের দুজনের", মহিলার মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমিও উইলির মতো ইতস্ততঃ করে একটা দাম বললাম। মহিলা কালো চামড়ার মনিব্যাগ থেকে নোটগুলো বের করে পাট করে রাখতে লাগলেন টেবিলের ওপর।

"ওদের লেখা-পড়ার খরচের জন্যে এগুলো জমাচ্ছিলাম।…সবটা না কুলোলেও কিছুটা তো হবে।" মহিলা বললেন নিস্পৃহ স্বরে।

"…প্রশ্নই ওঠে না", রাইজেনফেল্ড ঘোষণা করলো, "কালো সুইডিশ গ্রানাইট পাথরের এখন কতো দাম যাচ্ছে জানো? পাথরগুলো আসে সুইডেন থেকে। ওরা জার্মান মার্কে দাম নেয় না। সুইডিশ ক্রোনেনে দাম নেয়। ঐ পাথরগুলোর দাম এখন নীল হীরের মতো। লিসার সঙ্গে একটা সন্ধ্যে কাটাতে পাবার জন্যে তোমাদের একটা পাথর দিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে দুটো? এ যেন ফন হিণ্ডেনবুর্গকে কম্যুনিস্ট হতে অনুরোধ করা।"

"মাথায় চিন্তাও আসে বটে!" আমি বললাম।

"ছাড়ো ওসব কথা, তুমি তো এদের কর্মচারী মাত্র", গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললো রাইজেনফেল্ড।

"ভাবছি এ চাকরটা ছেড়ে দেবো", অকারণে কথাটা বলে ফেললাম আমি।

"স্কুলে ফিরে যাবে ?"

"না। অন্য কিছু একটা করবো ভাবছি।"

"তুমি এখানেই থেকে যাও হে ছোকরা। এ কাজটা ভালই রপ্ত করে নিয়েছ তুমি। তবে যদি সত্যিই গভীর ভাবে চিন্তা করে থাকো, তবে অন্য কথা..."

কথার মাঝখানে শক্ খাওয়ার মতো করে লাফ দিয়ে জানলায় গেলো রাইজেনফেল্ড। আলো জ্বেলে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজ খুলছে লিসা। তলায় আর কিছু নেই।

রাইজেনফেল্ড মেতে উঠেছে, "আহা কি বুক!...ও কি এরকম প্রায়ই করে?"

"তা করে।...তবে শুধু এখান থেকেই ওর জানলা দেখা যায়।"

"আর তবুও তুমি এখানকার চাকরী ছাড়তে চাইছো?"

"হ্যাঁ, তার কারণ লিসা ওইটুকুই দেখাবে, তারপর লোভ জাগিয়া তুলে নিজে উদাসীন হয়ে অন্য কাজে মেতে যাবে। এভাবে তো নিজেকে নষ্ট হতে দিতে রাজী নই আমি।"

লিসা অন্য ঘরে চলে গেছে। রাইজেনফেল্ড হঠাৎ আমাকে বললো, "একটা চিঠি পৌঁছে দেবে ওকে?"

"এসব কাজ চিঠিতে হয় না", আমি জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলাম।

লিসা দরজা ঠেলে বের হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইজেনফেল্ড টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, "এই সুযোগ।"

দেখলাম লিসা হাঁটছে আর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। আরে ঐ তো রাইজেনফেল্ড, এবার দুজনে পাশাপাশি। জর্জ ক্রল কী মনে করবে জানি না, তবে আমরা আরো একটা সুইডিশ পাথর পাবো।

কফিন মিস্ত্রি উইলকি আসছিল, "আজ রাতে আসছো তো? কুর্টবাকও আসছে।" আমি ঘাড় নাড়লাম।

...উইলকির কারখানা ঘরে বসে আমরা। চারদিকে কাজের জিনিসপত্র ছড়ানো। সেই যমজ বাচ্চা দুটোর জোড়া কফিন প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে।

দারুণ দেখতে লাগছে। মেজাজ ভাল থাকলে দাম নিয়ে মাথা ঘামায় না উইলকি।

কুর্টবাক বসে আছে ওক কাঠের তৈরি করা একটা বেঢপ রকমের বড়ো কফিন বাক্সের ওপর। অনেককাল আগে এখানে একটা সার্কাস এসেছিল। তাতে দৈত্যের মতো একটা লোক ছিল। তার সঙ্গে ভীষণ দোস্তি হয়ে যায় উইলকির। একদিন উইলকির সঙ্গে বসে মদ-টদ খাবার সময় লোকটা অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার এলো, দেখে রায় দিলো মারা গেছে। প্রিয় বন্ধু বলে তাড়াতাড়ি উইলকি এই বিরাট কফিনটা তৈরি করে ফেলে। কিন্তু কী আশ্চর্য কয়েক ঘণ্টা পরে মরা লোকটা উঠে বসলো, আসলে সে মরেই নি। সেই থেকে কফিনটা ওর কাছে পড়ে আছে।

উইলকি এই পরিবেশে থাকলেও রাতের অন্ধকার, মৃত্যু এগুলোকে ভয় খায়। কুর্ট বাকের ওসব নেই। "যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে"—এই ধরনের নীতি প্রচার করে এমন একটা সমিতির সদস্য ও। অথচ এই অদ্ভুত পেশায় জড়িয়ে পড়েছে ও।

উইলকির ক্যানারী পাখিটা গান গাইছে। সেই সঙ্গে খস খস করে চলছে উইলকির হাতের র‍্যাঁদা। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন লাগছে হে? ওপারের ডাক শুনতে-টুনতে পাচ্ছ কি?"

"চলছে মোটামুটি। এখন তো মাত্র সাড়ে-এগারেটা। ইচ্ছে করছে কাঁধ খোলা একটা গার্ডন, আর মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে রাস্তায় হাঁটি। অসহ্য।"

"অদ্বৈতবাদী হয়ে যাও হে, "কুর্টবাক বেশ মেজাজের মাথায় উপদেশ দিতে শুরু করলো, "যখন কোনো কিছুতেই বিশ্বাস থাকে না, তখন বেশ থাকা যায়।"

"তাতে কোনো লাভ হয় না।"

"হয়তো হয় না। তবে যখন জানলা দিয়ে আকাশ দেখি, লক্ষ লক্ষ তারা, লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে আমাদের যেন ডাকছে, তখন স্পষ্ট অনুভব করি সব কিছুর ওপরে একজন অতি মানবের মতো কেউ আছেন, যিনি আমার মধ্যেও আছেন", কথাটা বলে কিন্তু কুর্ট বাক বড় একটা মাংসের টুকরো কেটে মুখে পুরলো।

ঘড়ির কাঁটা যতো রাত বারোটার দিকে এগোচ্ছে উইলকির ভয় ততো বাড়ছে। এই সময় রহস্যময় জগতের কোনো কথা শুনতে ও পছন্দ করে না। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে ও বললো, "বেশ ঠাণ্ডা, না?···শরৎ এলো বলে।"

"জানলাটা খোলা রাখো", আমি বললাম, "বন্ধ করে লাভ নেই। ভূতপ্রেত কাঁচ ভেদ করেও আসতে পারে। তার চেয়ে লাইলাক ফুলের গন্ধ শোঁকা অনেক ভাল। বাবলা গাছের কাঁটাগুলোর মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে সিল্কের সায়া পরা মেয়েরা নাচছে। একদিন তুমিও বাবলা গাছ কেটে কফিন তৈরি করবে।"

"বাবলা কাঠে কফিন হয় না।" উইলকি জানালো।

আমি কুর্টবাকের দিকে হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা চাইলাম। মুখে ঢালছি এমন সময় চমকে উঠলো উইলকি—"কে যেন বাইরে?"

"নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা। ওরা যতোক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ভূতের ভয় নেই।" আমরা মহোৎসাহে নানারকম খাবার সাজিয়ে বসলাম। হঠাৎ বীয়ারের গ্লাসটা হাতে নিয়ে কুর্টবাক বলে উঠলো, "এতে তারার গন্ধ আছে।"

"কী বললে?" চমকে উঠেছে উইলকি, "তোমার কথাটার মানে ধরতে পারছি না।"

"মধ্যরাতে পৃথিবী তারার গন্ধে ভরে যায়।"

"দেখো, এসব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। তুমি কিছুই বিশ্বাস করো না অথচ উল্টোপাল্টা কথা বলো।" উইলকির কথায় কুর্ট বাক ঠাট্টা করে বললো, "তুমি কি আমায় বদলে দিতে চাইছো?"

"না, না, মানে হ্যাঁ···কিন্তু বাইরে কিসের যেন খসখসে শব্দ?"

"হ্যাঁ···প্রেমের···", কুর্ট জবাব দিলো।

এক জোড়া যুবক-যুবতী চলে গেলো বাগানের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে ওদের চাপা কথাবার্তা শোনা যেতে লাগলো।

"জানো, এখানে অনেক রকম কাণ্ড ঘটে।···এই তো সপ্তাহ দুয়েক আগে একটা তালাওলা এসেছিল মেয়েমানুষ নিয়ে। কী হয়েছিল ওদের মধ্যে কে জানে লোকটা হঠাৎ একটা গুণ ছুঁচ দিয়ে মেয়েটার পাছায় খোঁচা মারে,

আর মেয়েটাও হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একটা কবরের পাথরের গা থেকে ব্রোঞ্জের তৈরি গোল মালাটা খুলে নিয়ে প্রাণপণে কষিয়ে দেয় লোকটার মাথায়। তারপর সে এক দৃশ্য, লোকটা ছুটছে পাগলের মতো, মাথায় রোমান দেবতাদের মতো ফুলের মালা।···আমি তো গিয়ে মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এলাম। আইডিন লাগালাম। তেমন কিছু অবশ্য কাটে নি।···তারপর ও রাতটা আমার সঙ্গেই কাটিয়ে গেল, এই ঘরে।"

"বাঃ বাঃ, দারুণ ব্যাপার তো। তা তুমি এতো রমণীমোহন হয়ে উঠলে কবে থেকে?"

"ও সব চেষ্টা করে হতে হয় না, বিধিদত্ত ব্যাপার।"

কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে চলে এসেছি। চাঁদ মেঘের আড়ালে ছিল, হঠাৎ বেরিয়ে আসতেই দেখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিন-চার জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। ভেবেছিলাম ওরা হয়তো আমাদের সাড়া পেয়ে ছুটে পালাবে। কিন্তু না···সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গিয়ে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেলো। বরং আমরাই ফিরে আসতে চাইছি এমন সময় চাঁদ আবার মেঘের আড়ালে চলে গিয়ে সকলকেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচালো।

"আরে···আরে···একি···?" যা ভেবেছি তাই, সার্জেন্ট-মেজর নোপফ সেই কালো পাথরটার সামনে দাঁড়িয়ে, প্যান্টের বোতাম খোলা। কিন্তু কি জানি কেন আজকে আর কিছু করতে মন চাইলো না। ইচ্ছে হচ্ছিল বীয়ারের একটা খালি বোতল ছুঁড়ে মারি···কিন্তু না।

ঢং করে ঘণ্টা বাজলো গির্জার ঘড়িতে তের মানে একটা। অর্থাৎ ভূতের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে; এবার উইলকি প্রাণ খুলে কথা বলবে আমাদের সঙ্গে।

## ॥ ১৮ ॥

নিজের ঘরে জানলার ধারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ইসাবেল। আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। ও সাড়া দিলো না। "ইসাবেল, আমি এসেছি তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে।"

ইসাবেল যেন দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে যেতে চাইছে। "তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না।"

ও যেন আমায় খুঁটিয়ে দেখতে চায়; অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো, "যে লোকটা নিজেকে ডাক্তার বলে চালায় সেই কি তোমাকে পাঠিয়েছে?"

কথাটা সত্যি তবুও মুখে বললাম, "না কেউ তো আমায় পাঠায় নি। আমি লুকিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। কেউ জানে না আমি এখানে।"

ইসাবেল দেওয়াল থেকে পিঠ সরালো, "তুমিও আমাকে ঠকিয়েছো।" ৬

"না, ঠকাই নি। আমি তো তোমার কাছে আসতে পারি নি। তুমি বাইরে যাও নি কেন?"

"পারি নি", ফিসফিস করে বলছে ইসাবেল, "ওরা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে ধরতে চায়। ওরা জানতে পেরে গেছে যে আমি এখানে।"

"কারা?"

ইসাবেল উত্তর দিলো না। এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগলো। শরপাতার মতো তিরতির করে কাঁপছে ওর সারা দেহ। "কেউ তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।"

"হ্যাঁ আছে।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"কথায়। তুমি ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছো-না?"

"না। ও তো হাওয়ার শব্দ।"

"হতে পারে, তবে আঘাত দেয় কেন। শব্দগুলো আমাকে করাতের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে চায় অহরহ।"

"কী সব আজে বাজে বলছো। শব্দ কখনো কাউকে কাটতে পারে না।"

"পারে।" ইসাবেলের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত হয়।

"কী কাটে?"

ইসাবেল যেন কঠোর যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠলো, তারপর হাত দুটো উরুর মধ্যে গুঁজে বললো "ওরা এটা কেটে বাদ দিতে চায়, যাতে কোনোদিনও

আমার বাচ্চা না হয়।"

"কারা?"

"ঐ মহিলাটি। যে বলে ও নাকি আমার জন্ম দিয়েছে। এখন ও আবার আমাকে জোর করে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে চাইছে। মহিলাটি কেটেই চলেছে করাত দিয়ে আর ছেলেটা আমাকে চেপে ধরে আছে।"

"কে ধরে আছে?"

"সে, যে ওই মহিলার জঠরের মধ্যে আছে।"···কথাটা বলতে বলতে কেঁদে উঠলো ইসাবেল, "এ কথা কিন্তু কাউকে বোলো না, তা হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওই মহিলার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাবো না।···তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে যাও?" আমার ঘাড় নাড়াতে ও খুশী নয়, জোর দিয়ে বললো, "হ্যাঁ যাও। তোমাকে ওরা ঘুষ খাইয়েছে। তা নাহলে তুমি আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।"

আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যেও এক পরিবর্তন ঘটে চলেছে—অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। সব কিছু তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পাবার জন্যে আমি আস্তে আস্তে ইসাবেলকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। দুটি অচেনা অজানা প্রাণ দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে, অথচ কী দুরন্ত ব্যবধান।

"তুমি আমায় ভালবাসো না কেন?"

"বাসি ইসাবেল, আমার সব কিছু তোমাকে ভালোবাসে।"

"ততোটা ভাল নিশ্চয়ই বাসো না, বাসলে তুমি ওদের মেরে ফেলতে।"

আমি কোনো কথা না বলে আলিঙ্গন গাঢ়তর করলাম। "আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে নাও, তাহলেই আমি বাঁচবো।···জানো তো প্রতিরাতে সব কিছু মরে যায়। আবার সকাল হলে বেঁচে ওঠে।"

আমার কোনো প্রতিবাদই ও কানে নিতে চায় না। একবার রেগে গিয়ে বললো "তুমি ওদের গুপ্তচর। তোমায় আমি আর কিছু বলবো না। ওরা আমায় খুন করবে।"

"ভুল করছো ইসাবেল। আমাকে না মেরে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অন্ততঃ একজনেরও জানা উচিত।"

কথাটা বোধ হয় ওর মনে ধরলো। চোখের তারায় ভেসে উঠলো

নির্ভরতায় মৃদু আভাস। "যদি তুমি আমাকে সবকথা বলো, তবে আমি আমি তোমায় সব রকম সাহায্য করবো। পুলিশ, খবরের কাগজে জানিয়ে দেবো। তখন আর ভয় খাবার কিছু থাকবে না তোমার।"

"এটা ঠিক তা নয়।" ইসাবেলের মুখ আবার দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠছে। হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলো, "বাদ দাও এ প্রসঙ্গ।"

"ঠিক আছে দিলাম।"

শ্লেষের হাসি হেসে ইসাবেল বললো, "খুব জানবার ইচ্ছে তাই না? কিন্তু এবারে আর গুপ্তচর বৃত্তি সফল হলে না তুমি।"

কেন যে মেজাজ গরম হয়ে গেলো জানি না। বিশ্রী রেগে গিয়ে বললাম, "নরকে যাও তুমি। তোমার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।" কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই চলে এলাম ঘর থেকে। ওর কি হলো দেখার দরকার মনে করলাম না।

"কী হলো?" ডাক্তার প্রশ্ন করলো।

"যা হবার। কেন আমাকে পাঠিয়েছিলে ওকে দেখবার জন্যে? কোনো ফল হয় নি। ঠিক যখন খুব নরম ব্যবহার করা উচিত ছিল ওর সঙ্গে তখনই বকাবকি করে সব নষ্ট করে দিলাম।"

"তুমি যা ভাবছো তার থেকে ভাল ফল হয়েছে", ডাক্তার একটা বোতল গ্লাস দুটো আর বের করলো, "একটা কথা ওর সম্বন্ধে শুধু জানতে চাই। ও কী করে বুঝতে পেরেছে ওর মা এখানে এসেছেন।"

"ওর মা এখানে?" আমি চমকে উঠলাম।

"হ্যাঁ। গতকাল এসেছেন। অবশ্য এখনও দেখা করেন নি। আমি ধীরে ধীরে ওদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করছি।"

"কিন্তু কেন?" আমি বললাম "ওকি আগের চেয়েও বেশি অসুস্থ?"

"না।"

"তবে ওর অবস্থা দেখলে ভীষণ কষ্ট হয়।"

"এখানে যারা থাকে তাদের সবাইকে দেখলেই কষ্ট হবে। তা যাবে

নাকি দেখতে ?"

"না", আমি মাথা নাড়লাম, "একবার দেখেছি আর দরকার নেই।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমি চললাম", হুক থেকে টুপিটা নামিয়ে ডাক্তার চলে যাচ্ছে।

"জেনেভিয়েভকে কিছু ঘুমের বড়ি দিতে পারেন না ?"

"পারি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।"

"আজকে অন্ততঃ ও একটু শান্তিতে থাকুক", আমি জোর দিচ্ছি ডাক্তারের ওপর।

"দেবো। ঠিক আছে এখুনি গিয়ে দিয়ে আসছি, তাহলে হবে তো," মৃদু হেসে ডাক্তার বলে গেলো।

কবিদের ক্লাব ঘরে বসে আছি। ইসাবেলের চিন্তা ভুলবো বলে এখানে এসেছি। অথচ অটো সঙ্গে আছে।

"কি চাও অটো ? এখন কবিতা আলোচনা করতে ভাল লাগছে না। যাও এডুয়ার্ডকে ধরে নিয়ে এসো।"

অটো কোনো কথার উত্তর দিলো না। একটু পরে আস্তে আস্তে বললো, "আমি ওখানে গিয়েছিলাম।"

"কোথায় ?"

"বাহানস্ট্রাফেতে, পতিতালয়ে।"

"এটা তো আর নতুন খবর নয়। আমরা তোমার সঙ্গে নিয়ে যাই, তোমার হয়ে টাকা-পয়সা দিয়েছি। আর তুমি ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে।"

"আমি আবার গিয়েছিলাম। একা। আমার কথাটা শুনবে ?"

"কবে গিয়েছিলে ?"

"রেড মিলে সেদিন সন্ধ্যের পর।"

"আবার কি পালিয়ে এসেছো নাকি ?"

"না, এবার আর তা করি নি।"

"ভাল কথা, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। তা সেই আয়রন হর্স তো ?"

"লজ্জায় লাল হয়ে গেলো অটো, "ঐ একই ব্যাপার। তবে পরিণামটা ভাল ঠেকছে না।"

"সে কি কথা হে। যতোদূর জানি আয়রন হর্কের কোনো খারাপ অসুখ-বিসুখ নেই।"

"না, না, আমি তা বলছি না।···কী হয়েছে জানো ওখান থেকে ঘুরে আসার পর একটা লাইনও আর লিখতে পারছি না। ভেবেছিলাম নতুন অভিজ্ঞতা হবে, নতুন উৎসাহে কবিতা লিখবো। কিন্তু একেবারে উল্টো ফল।"

"ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে", আমি বললাম হাসতে হাসতে হাসতে। যদিও হাসার মতো মেজাজ আমার ছিল না।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকার পর অটো ঐভাবে বসে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, "ধরো যদি রোগটা হয়, তবে কতো দিনে বুঝতে পারবো।"

"তিন দিন থেকে চার সপ্তাহ। তবে তোমার ওসব কোনো চিন্তা নেই, নিজের কাজ করে যাও।···মানুষের লালসা আর পাপের কথা নিয়ে ভাল একটা কবিতা লিখে ফেলো।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অটোর মুখ। ও যেন প্রায় উড়তে উড়তে চলে গেলো। ওকে সেই মুহূর্তে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমার।

অফিস ঘরটা অন্ধকার ছিল। সুইচ টিপতেই আলো। দেখি টেবিলে একটা চিরকুট: "রাইজেনফেল্ড চলে গেছে। আজ রাতে তোমার ছুটি। জামার বোতাম পালিশ করা, মনকে শক্ত করা এবং নোখ কাটার কাজে সময়টার সদ্ব্যবহার করো। কাইজার এবং রাইসের জন্যে প্রার্থনা করো। স্বঃ ক্রল, সার্জেন্ট-মেজর এবং মানুষ। পুনঃ-যে শুধু ঘুমোয় সেও পাপ করে।"

নিজের ঘরে গেলাম। পিয়ানোটা সাদা দাঁত বের করে আছে। তাকের বইগুলো যেন হ্যাঁ করে তাকাচ্ছে। কিছুই ভাল লাগছে না। পিয়ানো বাজাতে বসলাম। একটু পরে লিসার জানলা খুললো। হাতে বিরাট একটা ফুলের সাজি। ও চেঁচিয়ে বললো, "ফুলগুলো পাঠিয়েছে রাইজেনফেল্ড।

রাম হাঁদা।…তা এগুলো কি তোমার দরকার?"

"না", আর কাউকে ফুল পাঠাবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই। আরও কিছুক্ষণ বাজাবার পর গেলাম উইলকির ঘরে।

"সেই যমজ ভাইয়ের কফিনের সমস্যাটা মিটেছে?"

"হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক মতে কবর দেওয়া হয়েছে। খরচ পত্রও ভাল করেছে ওরা। তবে দিনকাল যা হয়ে উঠছে কিচ্ছু করার নেই মানুষের। দাম যেন হু হু করে বাড়ছে।…এই দেখো না ব্যাংক মালিক ওয়ারনার মারা গেছে। খবরটা অবশ্য অনেকেই এখনো পায় নি। তোমায় আগাম জানিয়ে রাখলাম। দামী কফিনের অর্ডারটা অবশ্য আমিই পেয়েছি।"

ও আমাকে ওয়ারনারের ঠিকানাটা লিখিয়ে নিলো।

"রাতে কি করছো?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কী আর করবো, হোটেলে যাবো।…তুমি যাবে নাকি? চলো না, ভালই লাগবে।"

ওর নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলাম। মনটা ভীষণ চঞ্চল। নেমে নিজের ঘরের দিকে আসছি, দেখি সেই কালো অধিলিঙ্কের পায়ের কাছে ফুল ভর্তি সাজিটা রেখে গেছে লিসা। ওটা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। সুগন্ধে ভরে গেলো ঘর।

রাত যতো গভীর হতে লাগলো গন্ধটা ততোই আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। শেষ কালে ওগুলো নিয়ে চলে গেলাম উইলকির কারখানা ঘরে। সেই বিশাল কফিনটার ওপর এক বোতল জিন। খানিকটা খেলাম। তারপর একটা জানলা খুলে কফিন থেকে জানলা পর্যন্ত ফুল বিছিয়ে দিলাম। যেন এই পথ বেয়ে রাতের গভীরে অশরীরী কেউ এসেছিল। তারপর বেশ প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরে এলাম।

## ॥ ১৯ ॥

"রেমব্রাঁর আঁকা ছবির মতো সুন্দর একটা জিনিস তোমায় দেখাবো," জর্জ বললো। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে খুব সযত্নে পাট

খুলতেই টুং করে টেবিলের ওপর কী যেন পড়লো। তুলে দেখি সোনার কুড়ি মার্কের মুদ্রা। শেষ দেখেছিলাম যুদ্ধের আগে।

"সে একটা সময় ছিল, তাই না? শান্তি আর নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। সম্রাটকে অপমান করলে শাস্তি পেতে হতো। লোহার শিরস্ত্রাণের কথা ভাবাই যেতো না। আমাদের মায়েরা আঁটো পোষাক পরতেন। সে ছিল এক স্বর্গসুখের রাজত্ব। তোমাকে একটা চুমো খাই।" বলে সযত্নে মুদ্রাটা ঠোঁটে ঠেকালাম আমি।

"কোথায় পেলে এটা?"

"এক বিধবা উত্তরাধিকার সূত্রে এক বাক্স এই ধরণের মুদ্রা পেয়েছে।"

"ওরে বাবা—তা কতো দাম হবে মোট", আমি জানতে চাইলাম।

"চারশো কোটি মার্কের নোটের সমান। একটা ছোট বাড়ী···বা এক ডজন সুন্দর মহিলা। রেডমিলে পুরো এক সপ্তাহ কাটানো। যুদ্ধে গুরুতর ভাবে আহত সৈনিকের আট মাসের পেনসন···" জর্জ হাসতে লাগলো।

হাইনরিখ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। বড় বড় চোখ করে টেবিলের ওপর রাখা মুদ্রাটাকে দেখছে ও। "হিজ ম্যাজেষ্টি···সে একদিন ছিল বটে।" অনেক ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও এ বিষয়ে আমি ওর সঙ্গে একমত হলাম।

যুগ পাল্টে গেছে···সেটা ভাল না মন্দ এ নিয়ে মৃদু বিতর্ক শুরু হয়েছে এমন সময় ঘরে ঢুকলো কুর্ট বাক, "হের ক্রল, পরী ডান ধারে বসবো না বাঁ ধারে?"

জর্জ বেশ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, "পরী সব সময়ে ডান ধারে বসে।"

কথাটা 'সর্ব শাস্ত্রবিশারদ' হাইনরিখের পছন্দ হলো না, ও মুদ্রাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে কুর্টকে বললো, "চলো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

কুর্টবাক কুড়ি মার্কের মুদ্রাটা দেখে অবাক, হাতে তুলে নিলো, "সেই ঈগলের ছবি···আহা কী দিনই ছিল তখন।"

"তাহলে তুমিও?···কেমন দিন ছিল তখন?" রহস্য করে প্রশ্ন করলো জর্জ।

"অবাধে শিল্প চর্চা করে যাও। তামার পয়সায় রুটি পাওয়া যেতো। পাঁচটা দিলে এক বোতল জিন। তাছাড়া তখন মানুষের সামনে আদর্শ ছিল। সুখ ছিল।"

আমরা সবাই যেন কেমন হয়ে গেলাম। অতীতের স্মৃতি খুব পীড়া দিচ্ছিলো আমাদের। একটা চাপা যন্ত্রনা। অথচ করার কিছুই নেই। কে যেন বললো, "চলো জিনিসটা এডুয়ার্ড নবলককে দেখাই।" আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

…"ইসাবেল", খুব গাঢ়স্বরে ডাকলাম আমি। আজ ইসাবেলের মুখ চোখ প্রসন্নতায় ভরা। সুন্দর করে সেজেছে, হাতে পান্নার একটা ব্রেসলেট। একটু নড়লেই ঝিকমিক করছে। গতকাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাছপালারাও যেন স্নানসেরে পবিত্র। হঠাৎ ইসাবেল বলে উঠলো, "তুমি এতো গোলমাল করো কেন বলোতো?"

"আমি কখনো গোলমাল করি না", সরব প্রতিবাদ জানালাম আমি।

চট্ করে আমাকে একটা চুমো খেয়ে নিয়ে ইসাবেল বললো। "করো। এমনিতে তুমি শান্ত, সব কথার প্রতিবাদ করো না। এই দেখো না তোমার নাম রুডলফ নয়। তাই তো?…তোমার আসল নামটা কি?"

"লুডউইগ", আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম।

"আচ্ছা…লুডউইগ? একটা কথা বলোতো নিজের নামটা তোমার কাছে মাঝে মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে না?"

"সত্যি কথা বলতে কি নিজেকেই একঘেয়ে লাগে।"

"তাহলে নামটা পাল্টে নাও। অন্য কোনো দেশে চলে যাও। প্রত্যেকটি নামই এক একটা স্বতন্ত্র দেশ।"

"কিন্তু নাম কী করে পাল্টাবো। সবাই তো জানে আমার নাম।"

ইসাবেল যেন আমার কথা শুনতে পায়নি এমনভাবে বলতে লাগলো, "আমি শিগ্‌গীর চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমি ভীষণ ক্লান্ত…ভীষণ ক্লান্ত রুডলফ।"

"আমি তোমাকে ভালবাসি ইসাবেল", অন্য কোনো কথা না পেয়ে আমি এই কথাটা বলে উঠলাম। আমার সমগ্র সত্তা যেন ইসাবেলকে কেন্দ্র করে

আবর্তিত হচ্ছে। ওকে হারাবার ভয়ে আমি কেমন যেন হয়ে উঠলাম, "না ইসাবেল, তুমি জানো না তুমি আমার কতোটা জুড়ে আছো। তুমি আমার যৌবন, আমার সুখ।···তোমার মতো আর কাউকে ভালবাসতে পারবো না আমি; তোমার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে, এমন কি মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত আমি···।"

"এতোদিনে···এতোদিনে তুমি সত্যিটা বুঝতে পেরেছো নামহীন গোত্রহীন সুখ আর বিষাদ কাকে বলে।···রামধনুর ওপর হাঁটতে পারবে রুডলফ? পারবে যদি মনে অবিশ্বাস না থাকে।"

"হ্যাঁ", অস্ফুট গলায় আমি স্বীকার করলাম। ক্রমশঃ যেন আমার সব কিছু ইসাবেলের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ওকে যেন আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি। আমি একটা পাখি হয়ে গেছি, মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইসাবেলের অদৃশ্য খাঁচায় বন্দী হয়ে গেছি।

সূর্যের আলোর রঙ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। একটা কিছু তার আগে করে নিতে হবে আমাকে।

"ইসাবেল, এতোদিন পরে আমি ভালবাসার মর্ম বুঝতে পেরেছি। ভালবাসাই জীবন। এর মধ্যে দিয়েই নশ্বর মানুষ অমরতার দিকে চলে যেতে পারে।···" হঠাৎ আমি কথা বলা বন্ধ করলাম···কী সব আজে বাজে বকে চলেছি।

"মুহূর্তগুলোকে যখন হাতের কাছে পাও রুডলফ, সেগুলোকে নষ্ট হতে দিয়ো না তখন। বুঝেছো?", ইসাবেল খুব মমতা দিয়ে কথা গুলো বললো।

"হ্যাঁ, কিন্তু কী ভাবে?···তুমি চলে যেতে চাইছো···কিন্তু কেন?" আমার কথার উত্তর না দিয়ে ইসাবেল আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখলো। একটু পরেই বুঝতে পারলাম ও কাঁদছে।

"কেন কাঁদছো ইসাবেল? আমরা সুখী হবো।"

"হবো", ইসাবেল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমায় চুমো খেলো, "বিদায়"।

"না, না, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছো? ইসাবেল তোমাকে আমি ভালবাসি।"

কোনো কথা না বলে ইসাবেল উঠে দাঁড়ালো···"এসো আমার সঙ্গে।"

একটু ইতঃস্ততঃ করে আমি ওর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এলাম ওর ঘরে। সোনালী জুতোটা একটানে খুলে ফেলে ও বিছানায় শুয়ে পড়লো, "এসো রুডলফ।"

আমি ওর পাশে বসলাম। যে কোনো কেউ এখানে চলে আসতে পারে, কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না। ইসাবেল আবার ডাকলো, "এসো।"

আমি আর কিছু ভাবতে না পেরে গা এলিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাহুলতা দিয়ে ইসাবেল জড়িয়ে ধরলো আমাকে। অস্ফুট গলায় ও বলে, উঠলো "শেষ পর্যন্ত এলে তাহলে রুডলফ।"··· কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ও ঘুমিয়ে পড়লো।

ঐ ভাবে কতক্ষণ শুয়ে আছি জানি না। এক সময়ে চমকে উঠলো ইসাবেল। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ওর সারা শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে··· "কে···কে?"

"আমি···আমি রুডলফ।"

"তুমি আমার সঙ্গে শুয়েছিলে?" ওর গলার স্বর পাল্টে গেছে। বেশ রুক্ষ।

"চলে যাও···চলে যাও এখুনি।"

ও যেন আমাকে চিনতে পারছে না। আমি জানতে চাইলাম সুইচটা কোথায়।

"আলো জ্বালতে হবে না, চলে যাও···যাও।"

"যাচ্ছি······তুমি অযথা ভয় পেও না"

কম্বলটা তুলে সারা শরীরটা ঢেকে নিয়ে ইসাবেল বললো, "চলে যাও ···তা নাহলে ও তোমাকে দেখে ফেলবে রালফ্। দেরী কোরো না, যাও।"

নীচে নেমে আসছি, সিঁড়ির পাশে একজন নার্স বসে। ও জানে ইসাবেলের কাছে যাবার অনুমতি আমার আছে। "শান্ত হয়েছে কি?" নার্স প্রশ্ন করলেন।

মাথা নেড়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রালফ্?···কে এই রালফ্? আমার মাথায় চিন্তা পেঁচিয়ে উঠতে লাগলো। এর আগে তো ও আমায় কখনো ডাকেনি ঐ নামে। ওর ঘরে তো বহুবার গেছি আমি, তবে কেন

বলছে কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে?

শহরের দিকে পা বাড়ালাম আমি। চিন্তা করছিলাম ভালবাসার কথা। একটা কিছু পাবার জন্যে মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। চাওয়া আর পাওয়ার দ্বন্দে অস্থির হয়ে আমি আরো জোর কদমে আলোয় ভরা শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি, সেখানে আলো ছাড়াও আছে দুঃখ, হতাশা, জীবনের প্রাত্যহিকতা আর স্থূলতা।...

রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো লোকের কথাবার্তায়। জানলা খুলে দেখি সার্জেন্ট-মেজর নোপফকে কারা যেন ধরাধরি করে আনছে। এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। নোপফ গোঙাচ্ছিল। দেখতে দেখতে অনেক বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠলো, জানলা খুলে গেলো।

"যতো সব মাতলামী কাণ্ড", একটা জানলা থেকে সব কিছু ছাপিয়ে একটা কর্কশ গলার মন্তব্য ভেসে এলো। বিধবা কোনরস্মান, পরের পেছনে লাগাই মহিলার কাজ। আমার ধারণা জর্জ আর লিসার ওপর উনি কড়া নজর রাখছেন।

"চুপ কর", রাস্তা থেকে কে যেন চেঁচালো লোকটা কি কোনরস্মানকে চেনে? তা না হলে, বকলো কেন? কোনরস্মানকে কিন্তু দমানো যাচ্ছে না, নোপফকে দিয়ে শুরু, শেষ হলো হিণ্ডেনবুর্গ, বিশপ, পুলিশের শ্রাদ্ধ করে। রাস্তায় লোকটি শেষে খুব জোর ধমকে উঠলো, "চুপ কর বুড়ী, হের নোপফ মাতাল হয়ে আসেন নি, উনি খুব অসুস্থ।"

বুড়ি একটা টর্চ বের করে পথচারীটিকে চেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু টর্চের আলো অতদূর পৌঁছচ্ছে না। "তোকে আমি চিনতে পেরেছি, তুই হাইনরিখ ব্রাগমান। অসহায় বিধবাকে অপমান করার জন্যে তোর জেল হওয়া উচিত। আর তোর মা...।"

বেশ কিছু লোক ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে জমে গেছে। দু'দল হয়ে গিয়ে দুপক্ষকে উৎসাহ দিচ্ছে। আমি নিচে নেমে এলাম।

নোপফের মুখ চোখ ফ্যাকাশে, ভীষণ ঘামছে। হঠাৎ সকলের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে অবিলিস্কটাকে জড়িয়ে ধরলো গাছে ওঠার মতো করে।

পাশে তখন যে জর্জ এসে দাঁড়িয়েছে জানি না।

"ব্যাপারটা কি? সেই পুরনো ভুল বকার রোগ?" জর্জ জানতে চাইলো।

এর আগেও দু-একবার নোপফকে এমন অবস্থায় দেখা গেছে যখন ও দেওয়াল থেকে সাদা হাতী বেরিয়ে আসতে দেখেছে, কিংবা তালার ফুটো দিয়ে এরোপ্লেন গলে যাচ্ছে। "...না: তার চেয়েও খারাপ...এবার ওঁর ধারণা লিভার কিডনীটা ফেটে গেছে", যে বললো সে একটু আগে বুড়ি কোনরস্মানকে বকছিল। আর বুড়িও ঠিক চিনেছে কল মিস্ত্রী হাইনরিখ ব্রাগমানকে।

"তা এখানে আনলেন কেন, হাসপাতালে নিয়ে যান!"

"উনি হাসপাতালে যাবেন না।"

ইতিমধ্যে নোপফের স্ত্রী আর তিন মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঘুম-ঘুম ফোলা মুখ। নোপফের চিৎকার শুনে ওরা ভয়ে গুটিয়ে গেছে যেন।

"ডাক্তারকে টেলিফোন করেছেন?" জর্জ শুধোলো।

"এবার করছি। এতোক্ষণ তো ওঁকে ধরে রেখেছিলাম।"

নোপফের স্ত্রী আর মেয়েরা গিয়ে অনেক করে নোপফকে বোঝাচ্ছে অবিলিস্কটা ছেড়ে ওদের সঙ্গে চলে আসতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর আমরা ভাবছি ওটা যদি পড়ে ভেঙ্গে যায় তাহলে আমাদের সমূহ লোকসান।

জর্জ গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলো, উঠোনে বেশ ভীড় জমেছে। হঠাৎ দেখি লিসা, সাটিনের জামাটায় অসংখ্য কোঁচকানো দাগ, মুখে মিষ্টি মদের ভুরভুরে গন্ধ। ও আমাকে বললো, "গার্দার সাদর নিমন্ত্রণ। কাল যে কোনো সময়ে ওর সঙ্গে দেখা কোরো।"

গুটিগুটি উইলফি আর কুর্ট বাকও এসে হাজির। ভাগ্য ভাল, কাছের হাসপাতাল থেকে ডাক্তার চলে এলেন। তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশান দিলেন নোপফকে। একটু পরে ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামান হলো অবিলিস্কের গা থেকে। তারপর ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলো।

জর্জ ব্রাগমানকে জিজ্ঞেস করলো, "মুনস্টের থেকে একজন এসেছিল

দু বোতল জিন নিয়ে, দুটো দু জায়গায়। নোপফের সঙ্গে মোটা টাকার বাজী হয়, দেখা যাক ধরতে পারে কিনা। আমি ছিলাম বিচারক। নোপফ ঠিক বলে দেন কোন্‌টা কোন্‌ জায়গার। তারপর যখন লোকটা ব্যাগ থেকে টাকা বের করে গুণছিল তখন নোপফ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে ঘামতে শুরু করেন। বমি করে চেঁচিয়ে সে এক দৃশ্য আর কি! সেই ফাঁকে লোকটা টাকা না দিয়ে পালিয়ে গেছে। ওকে আমরা চিনিও না।"

"ব্যাপারটা ভয়ংকর নিঃসন্দেহে", জর্জ বললো।

"ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন।"

"ভাগ্য? এবার যদি নিজের ভাগ্যটার কথা চিন্তা করেন হের ব্রাগমান তবে বলবো সাবধান হোন। কোনরস্‌মান বুড়ী অন্য একটা জোরালো টর্চ আর বীয়ারের বোতল নিয়ে গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে আপনার মাথা ফাটাবে বলে। অতএব বাঁচতে যদি চান এই পাশ দিয়ে পালান।"

বাগানের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলে গেল সে।

"বুড়ো কি মরবে নাকি?" লিসা প্রশ্ন করলো।

"বোধ হয়", জর্জ বললো, "এতোদিন যে কেমন করে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য।"

ডাক্তার বেরিয়ে এসেছেন। জর্জ জানতে চাইলো নোপফের খবর।

"লিভারটা গেছে। আগেই গেছে। এবার দেখছি একসঙ্গে সব কটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসে আছেন। দু-একদিনেই···", ডাক্তারের কথায় মাঝখানে নোপফের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন, ডাক্তার তাঁকে দেখে প্রায় ধমকে উঠলেন, "মদের ব্যাপারটা কিছুই বোঝেন না আপনি। একটা ফোঁটাও পেটে যাওয়া উচিত নয়। ভাল করে সারা বাড়ি আবার খুঁজে দেখুন।"

"খুঁজছে ডাক্তার। এই দু বোতল পেলাম।" ছিপি খুলে মহিলা মদটা ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত একটা বোতল আমরা, অন্যটা ডাক্তার নিলেন।

"ডাক্তার বলছেন হের নোপফ নাকি দু-একদিনের বেশি বাঁচবেন না?" লিসা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলো।

জর্জ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই লিসার সারা শরীর যেন কেঁপে উঠলো।

তারপর এক এক করে আমরা নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দোতলা থেকে দেখি শ্রীমতী কোনরস্‌মান তখনও টর্চ নিয়ে ব্রাগমানকে খুঁজে চলেছেন। এঁর ধারণা ব্রাগমান এখনও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে নি। উনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছেন কালো অবিলিস্কের কাছে, আমার ইচ্ছে না থাকলেও সেই পাইপটার মধ্য দিয়ে বললাম—"কে আমায় বিরক্ত করছে।" তারপর জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম।

বিধবা প্রথমে একেবারে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন, তারপর পাগলের মতো চারদিকে দেখতে লাগলেন। আমি আবার বললাম, "তোমার আত্মা শান্তি পাক।" মহিলা আর দাঁড়ালেন না, প্রাণ ভয়ে ছুটতে লাগলেন নিজের ফ্ল্যাটের দিকে। আবার চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো।

॥ ২০ ॥

খুব ভদ্রভাবে আমি রথের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। রথ ছিল এখানকার ডাক পিওন। যুদ্ধের সময় আমাদের শহরে চিঠি বিলি করতো এবং তখন যে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ির জন্যে কিছু না কিছু দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসতে হতো তাকে তার জন্যে মরমে মরে থাকতো কে। যুদ্ধের সময় ওকে সবাই ওকে পরম বন্ধু হিসাবে স্বাগত জানাতো চিঠি হাতে আসতে দেখলে। কিন্তু যুদ্ধ লাগাতেই ও হয়ে উঠলো সবার কাছে এক পরম বিভীষিকা। হয় যুদ্ধে যাবার সরকারী হুকুমনামা বা "সম্মানের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করেছেন" এই ধরনের খবর পৌঁছে দেওয়া ছিল তার একমাত্র কাজ। ওকে আসতে দেখলেই মানুষ কেঁদে ফেলতো।···কিন্তু একদিন রথ নিজেই একটা খাম পেলো। সপ্তাহ পরে আর একটা। এবং হঠাৎ ও খুব শান্ত হয়ে গেলো এবং ঐ অবস্থাতেই ও পাগল হয়ে গেলো। অফিস ওকে পেনসন দিয়ে কাজ ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলো। পেনসনের সামন্য টাকায় ওর চলে না। প্রায় না খেয়েই থাকতো। কয়েকজন বন্ধু ওকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতো।

যুদ্ধ শেষ হলো। আস্তে আস্তে রথের পাগলামি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। ডাক পিওনের উর্দি পরে লোকের বাড়ি বাড়ি চিঠি দিয়ে তাকে, এবার কিন্তু সব ভাল ভাল খবর। পুরানো খাম পোষ্টকার্ড জোগাড় করে, তারপর কারুর বড়িতে গিয়ে চিঠি দিয়ে বলে রাশিয়ার বন্দী শিবির থেকে এসেছে। যারা মারা গেছে, তাদের বাড়ি চিঠি দিয়ে বলে,"খবর আছে ও বেঁচে আছে।...শিগ্‌গীরই ফিরবে।"

ও আমার হাতে যে চিঠি দিয়া বলে গুঁজে দিলো সেবা একটা প্রুশীয়ার লটারী টিকিটের নোটিশ। কোন এক নামধারী কসাইকে লেখা। কসাই বহুকাল আগে মারা গেছে। আমি বেশ খুশি-খুশি ভাব দেখিয়ে বললাম, "অশেষ ধন্যবাদ। দারুণ ভাল খবর এনেছো।" রথ বললো, "ওরা... মানে আমাদের সৈন্যরা শিগ্‌গীর রাশিয়া থেকে ফিরে আসছে।"

"নিশ্চয়ই।"

"সবাই ফিরবে তবে সময় তো লাগবেই, রাশিয়া দেশটা ভীষণ বড়ো কি না।"

"তোমার ছেলেরাও ফিরছে আশা করি।"

রথের উদাস চোখ সহসা উজ্বল হয়ে উঠলো", হ্যাঁ আমার ছেলেরাও। আমি খবর আগেই পেয়েছি।"

"বাঃ বেশ ভাল খবর। ধন্যবাদ রথ।"

রথ আসতে আসতে চলে গেলো। ওর এই রকম চিঠি দেওয়া নিয়ে পোস্ট অফিস আপত্তি তুলেছিল, এমন কি ওকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিল, কিন্তু শহরের লোক আপত্তি জানাতে অতোদূর আর গড়ায় নি। রথও ঐটুকু পাগলামীর মধ্যে শান্ত থাকে। তবে ইদানিং রাজনীতির লোকেরা আর বদ লোকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ওর মারফতে চিঠি পাঠায়।

একবার কেউ ওর মারফৎ কুপ্রস্তাব দিয়ে লিসাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে ছিল। রথ ভুল করে চিঠিটা দিয়ে আসে বিশপের প্রতিনিধি বোদেনদিয়েকের হাতে। চিঠিতে প্রস্তাব ছিল সেণ্ট মেরী গির্জার পেছন দিকে রাত একটার সময় যেন লিসা আসে। এসেছিল। তারপর লিসা আর তার প্রেমিক যখন

প্রেমে উন্মত্ত তখন যমদূতের মতো ওখানে পৌঁছেছিলেন বোদেনদিয়েক। খুব কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের।

…নোপফের বাড়ির দরজা খোলা। ঘর্ঘর করে প্রায় সবকটা সেলাই মেশিন চলছে। শোকের কালো পোষাক তৈরী হচ্ছে কারণ নোপফ না কি যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন।

অফিস ঘরে জর্জ আর কাঁদুনে-অস্কার।

"ডলারের দাম কত যাচ্ছে?" আমি শুধোলাম।

"দুপুর বারোটার সময় ছিল দশলক্ষ মার্ক!…একটা উৎসব করবে না কি?" জর্জ বললো।

"আর দেউলে হবো কবে?"

"যে দিন সব মাল বিক্রী হয়ে যাবে।"

"যাক নিশ্চিন্ত তাহলে" আমি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "এবার কিছুটা মদ্য পান করা যাক।"

ওদের সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করে আমি চলে এলাম পাগলদের আশ্রমে।

আজ প্রথম ইসাবেল ভজনের সময় হাজির ছিল। কিন্তু কই ওকে তো বাগানে দেখা যাচ্ছে না? ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বোদনদিয়েকের সঙ্গে দেখা। উনি দু-একটা ঠাট্টা করার পর বললেন, "তোমাকে ডাক্তার খুঁজছে, যাও দেখা করে এসো।"

কাগজপত্র সরিয়ে রেখে ডাক্তার বললেন, "ফ্রাউলিন তার হেভেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? না হয়ে থাকলে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। আপাততঃ।"

"বেশ। আর কিছু হুকুম আছে?"

"এভাবে কথা বলবেন না। মেয়েটাকে চিকিৎসা আমি করছি। ওর ভালমন্দ তো দেখা আমার কর্তব্য।…একটা কথা মেয়েটিকে আপনি ভালবেসে ফেলেন নি তো?"

"ইসাবেল কে?…না, ও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু একথা কেন উঠছে?"

"যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম", ডাক্তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, "তবে করলেও খারাপ হতো না।"

"ইসাবেলের মা এসেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সব কথা স্বীকার করেছেন। স্বামী মারা যাবার সময় মহিলার বয়েস বেশ অল্প ছিল। দেখতেও ভারী সুন্দরী। এক পরিবারিক বন্ধু ছিল। ইসাবেল তাকে মনে মনে ভালবাসতে শুরু করে দেয়। কিন্তু একদিন দুম্ করে ওর মা সেই পারিবারিক বন্ধুটিকে বিয়ে করে বসলেন। লোকটির নাম রলফ্ কিংবা রুডলফ।...তারপর থেকেই ইসাবেলের মাথার গণ্ডগোল।...তবে এই কিছুদিন আগে মোটর দুর্ঘটনায় ভদ্রলোক মারা গেছেন। এবার তো মূল কারণটা সরে গেছে, তাই আশা করা যাচ্ছে একটা ভাল কিছু ঘটবে।...এইবার আপনাকে চেষ্টা করতে হবে।"

ডাক্তারের কথা শুনে ভীষণ রাগ হয়ে গেলো, তবে মুখে শুধু বললাম, "তাই নাকি।"

"হ্যাঁ, আমি খুব চেষ্টা করে মেয়েটাকে স্বাভাবিক করে এনে ফেলেছি। দেখলেন না আজ গির্জায় গেছে?...এবার ও ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। তাই বলছিলাম এখন ক'দিন ওর সঙ্গে দেখা করবেন না, ওর মনটা স্থির হতে দিন।"

"ঠিক আছে। বুঝেছি।" মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনের ভেতরে যেন ঝড় উঠেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আসছি দেখি গেট ঠেলে এক ভদ্রমহিলা আসছেন। সুন্দর আর দামী ফারের কোট গায়ে। মুখটা ফ্যাকাশে, দারুণ গন্ধওলা সেন্ট মেখেছেন মহিলা। আগে তো এঁকে দেখি নি?

দারোয়ান বললো, "আগে দু-একবার এসেছেন। এখানে ওর কোন রোগী আছে। দেখা করতে যাচ্ছেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।"

তাহলে এই কি ইসাবেলের মা? আমার মন চলে গেলো সুদূর অতীতে। মা, মেয়ের-প্রেমিক, আকাশের চাঁদ...গাড়ীর অ্যাকসিডেন্ট...ঘটনা গুলো যেন চোখের সামনে ঘটছে।

প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছে যেন। রাস্তায় ধারে একটা সস্তা হোটেলে বসে পাগলের মতো খেলাম।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, টিমটিম করে জ্বলছে আলো। রাস্তায় ভিখিরীর ভীড়, বেশির ভাগই যুদ্ধের শিকার, হাত নেই, পা নেই। নিজেকে খুব ধিক্কার দিলাম, অতো খাওয়ার কি দরকার ছিল? কিছু সাহায্য তো এদের আমি করতে পারতাম।

অফিসে ঢুকতে যাচ্ছি জর্জ ডাকলো। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে, চারপাশে নানা ধরণের ছবিওলা ম্যাগাজিন। কিছুদিন আগে এক বিধবা তার স্বামীর কেনা প্রায়-নতুন একটা কোট বিক্রি করতে এসেছিল। সস্তায় পাওয়া সত্ত্বেও জর্জ ওটা নেয় নি, অথচ বিধবার ভীষণ টাকার দরকার। বিধবা ওটাকে খুব কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় এক দর্জির কাছে। এখন জর্জ ওই কোটটাকেই অনেক দামে কিনে এনেছে, পাল্টে গেছে শুধু লাইনিংটা। আমি ওকে একটু ঠাট্টা করলাম এই নিয়ে।
জর্জের কাছে দুবাক্স স্প্র্যাট মাছ ভাজা ছিল। আর সামান্য পাউরুটি। তাই খেলাম ভাগ করে। লিসাকে একবার দেখা গেল জানলার সামনে গাউন পাল্টাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে চলে এলাম আমি।

## ২১

সার্জেন্ট মেজর নোপফের শোবার ঘরের জানলায় হঠাৎ একটা ভূতের ছায়া দেখা গেলো। প্রথমটা বুঝতে পারি নি। তার মানে সার্জেন্ট মেজর এখনো মরে নি। জানলার কাঁচে ছায়া পড়েছে।

"দ্যাখো বুড়োটা বিছানায় শুয়ে মরতে চায় না", আমি জর্জকে বললাম, "ও যেন আবার শহরের ভাটিখানা না দেখে মরতে চাইছে না।"

জানলা খুললো, এবার আমরা পরিষ্কার নোপফের মুখটা দেখতে পেলাম। খুব ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা।

"শেষবারের মতো পৃথিবী দেখে নিচ্ছে", জর্জ ঠাণ্ডা করে বললো। আমি হাতের কাজ বন্ধ করে চলে এলাম জানলায়, ভালভাবে দেখতে চাই। সার্জেন্ট

মেজর নোপফ তখন ওষুধ খাচ্ছে, একটা বোতল তুলে মুখে ধরেছে। আমি জর্জকে বললাম, "দেখছো মানুষ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে চায়। নোপফ ওষুধ খাচ্ছে।"

"পাগল হয়েছো, ওটা জিঙ্কের বোতল। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বের করে খাচ্ছে।"

নাঃ, জর্জ ভুল করে নি, সত্যিই তাই।

"ওর স্ত্রীকে ডেকে জানিয়ে দেবো না কি?"

"তোমার কী ধারণা, বোতলটা উনি কেড়ে নিতে পারবেন?", জর্জ হেসে বললো, "তাছাড়া যাক না, মরবার আগে মনের সাধ মিটিয়ে নিক। ডাক্তার তো বলে গেছেই আর কটা দিন বাঁচবে ও।"

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে আমরা ডাক্তারকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম নোপফের ব্যাপারটা। ডাক্তারও প্রায় জর্জের সঙ্গে একমত: মরে যাবে তো বটেই, অতএব আমরা যেন নোপফের কবরে কী পাথর বসাবো সেটা ঠিক করে রাখি। ডাক্তারের কথা শুনে মনে হলো মানুষটা ভীষণ নিষ্ঠুর। কত সহজে একজনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে সদর্পে।

"নাঃ, জর্জ, এ চাকরী করা আমার পোষাচ্ছে না আর। জীবনের সুন্দর অনুভূতিগুলো যেন নষ্ট হয় নি, সামান্য ভোঁতা হয়েছে মাত্র," জর্জ বিজ্ঞের মতো হেসে কথাটা বললো, "এখন ওসব কথা না ভেবে চলো এডুয়ার্ডের হোটেলে কিছু খেয়ে আসি।"

দুপুরের পর ফিরে দেখি নোপফদের বাড়ি থেকে ভীষণ চিৎকার চেঁচামিচির শব্দ। "আহা ওর আত্মা শান্তি পাক", জর্জ বললো, "চলো এসময়ে গিয়ে একবার দাঁড়াতে তো হয়ই, দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে আসি।"

দরজা খোলাই ছিল, ঘণ্টা না বাজিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম। অবিশ্বাস্য ঘটনাঃ নোপফ বাইরে বেরোবার পোষাক পরে ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে, হাতে বেড়াবার ছড়ি। স্ত্রী আর তিন মেয়ে সেলাই কল গুলোর আড়ালে গুটি সুটি মেরে বসে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। নোপফের মুখে গালাগাল, মাঝে মাঝে ছড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে মেয়ে-বৌকে। মেঝের ওপর ছড়ানো শোকের আধ-তৈরী কালো পোষাক গুলো।

কারণটা বুঝতে একটু সময় নিলো, নোপফের গালাগালের ফাঁকে যে সব কটূক্তি বের হচ্ছিল তা থেকে বুঝতে পারা গেলো কেন বৌ-মেয়েরা আগে থাকতে শোকের পোষাক তৈরী করেছে। ওরা নিশ্চয়ই নোপফের মৃত্যু কামনা করছে, তাছাড়া এতো গুলো পয়সা নষ্ট করার কী দরকার ছিল ?

"শয়তানের দল···তোরা মোচ্ছব করতে বসেছিলি, ভেবে ছিলি বুড়ো এবার টেঁসেছে···তাই না, দাঁড়া এমন শিক্ষা তোদের দেবো···", গলায় জোর নেই, নোপফের, তবুও ছাড়ছে না, ছড়ি চালালেন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে। মহিলা ওর ছড়িটা ধরে ফেললো।

"ছাড়, ছাড় আমার ছড়ি জানোয়ার কোথাকার···" নোপফের লাফানি কমছে না।

"আমরা কি করবো ডাক্তার বলেছিল, তাই তো ওগুলো তৈরী করেছিলাম আমরা···।"

"ডাক্তারটা হাঁদা, তোরাও তাই···।"

দু-চারটে ছড়ি মেয়ে আর স্ত্রীর ঘাড়ে যে পড়ছিল না তা নয়। বড় মেয়েটা হঠাৎ কেঁদে উঠলো, "বাবা, আপনি এতো উত্তেজিত হবেন না, ওতে শরীরের ক্ষতি হবে আপনার। ···শান্ত হোন··আপনি সুস্থ হয়ে ওঠাতে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি।···আপনাকে কি একট কফি করে দেবো···।"

"কফি ?" হাঁক পাড়লেন নোপফ, "আমি তাদের পিটিয়ে কফির মতো গুঁড়ো করে ছাড়বো···এভাবে টাকা নয় ছয় করা··শয়তান কোথাকার···।"

"বাবা···ওগুলো তো বিক্রি করে দিতে পারি", অন্য একটা মেয়ে ক্ষীণ গলায় জানালো।

"আমি তোদের বিক্রি করে ছাড়বো।···"

আমরা স্থির থাকতে না পেরে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললাম, "হের নোপফ···অভিনন্দন···।"

"কে আবার জ্বালাতন করছো, দেখছো না আমি ব্যস্ত।"

"আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন···।"

"তাতে তোমাদের কি ! এরা আমার সর্বনাশ করছে।"

এই ফাঁকে স্ত্রী বলে উঠলো, "আমরা কিন্তু এখনো এগুলোর দাম দিই নি।" কথাটা ম্যাজিকের মতো কাজ করলো। তার মানে এটাতে লাভের মুখ দেখা যাবে ; বিশেষ করে যে ভাবে ডলারের দাম কমছে।

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ হের নোপফ, তাহলে দেখছেন এতে লোকসানের বদলে লাভই হচ্ছে আপনার।"

"দাঁড়াও···দাঁড়াও", নোপফের যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে, "এরা তোমার কাছ থেকে কবরের পাথর কেনে নি ?"

"না···", মুখে তীব্র প্রতিবাদ করলেও স্ত্রী আমাদের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকালো।

"কেন কেনো নি···কিনলে তো তাতেও কিছু লাভ হতো।"···বেশ যখন কেনো নি, তখন টাকাপয়সা গুলো নিশ্চয়ই খরচ হয় নি, বের করো কোথায় কী আছে।"

বুড়ো যখন টাকা পয়সার কথায় এসে গেছে তখন আর মারধোর হবে না···আমরা ফিরে এলাম নিজের অফিসে।

মিনিট পনেরো পরে নোপফ আমাদের অফিসে এসে হাজির। মুখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে, "সব খবর আমি ওদের পেট থেকে বের করেছি। মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমার স্ত্রী স্বীকার করেছে ও তোমাদের কাছ থেকে একটা কবরের পাথর কিনেছে।

"কিন্তু দাম দেন নি। অতএব নিতেই যে হবে তেমন কোনো কথা নেই", জর্জ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো।

নোপফ ধমকে উঠলো, "ও কিনেছে। এবং তার সাক্ষীও আছে। এখন তোমরা কথাটা স্বীকার করছো কি করো না ?

"মানে আপনার স্ত্রী শুধু কেনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে ছিলেন", জর্জ আমতা-আমতা করে বললো।

"হ্যাঁ-কি না ? জবাব দাও", গর্জে উঠলো নোপফ।

"দেখুন এতোদিনের পরিচয়···আপনি যখন বলছেন···"

"লিখে দাও···।"

"লেখালিখির কি আছে। দাম দিন। জিনিস নিন," আমি ফোড়ন কাটলাম।

"চুপ করো···লিখে দাও··আশি লাখ···সামান্য পাথরের এতো দাম···।"

আমরাও জেদ ধরলাম দাম চুকিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত আশি লাখ মার্কের দলা পাকানো নোট ছুঁড়ে দিলো আমাদের মুখে। বৌ-মেয়েদের কাছ থেকে কেড়ে আনা নোট।

"ঠিক আছে।···আচ্ছা এবার যদি আবার তোমাদের কাছে ওটা বিক্রি করে দিই, কতো দেবে তোমরা," নোপফ বেশ মেজাজের মাথায় জানতে চাইলো।

"ঐ আশি লাখ।"

"জোচ্চুরীর জায়গা পাও নি। একদিনে ডলারের দাম পড়ে নি?"

"পড়েছে। তবে এটা তো এখন হাত-ফেরতা মাল, দাম তো কমবেই।"

আমরা কিছুতেই নোপফকে বোঝাতে পারছি না, একবার বিক্রি হওয়া মাল আর নতুনের দামে বিক্রি হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ওটা এখন আমাদের জিম্মাতেই থাকবে। পরে দাম বাড়লে বিক্রি করে দেবো আমরা।

রান্নাঘরে বাঁধাকপি রাঁধছিল গার্দা। "এসেছো ভালই লাগছে। আমি কাল এখান থেকে চলে যা।" চ্ছি

"কোথায়?"

"ওয়ালহাল্লা হোটেলে।"

"এডুয়ার্ডের কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন, তোমার কি এতে কোনো আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তির কি থাকতে পারে?—তবে তুমি কি রেড মিল রেষ্টুরেন্টের চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ?"

"বেশ কয়েক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন এডুয়ার্ডের হোটেলে বারমেডের চাকরি নিচ্ছি।"

"তাহলে ওয়ালহাল্লাতেই থাকবে।"

"হ্যাঁ। ওপর তলায় চিলেকোঠার পাশে।"

"তাহলে কি তুমি এই কথাই বলতে চাইছো তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের এইখানেই ইতি?"

"হ্যাঁ। আমি এডুয়ার্ডকে ঠকাতে চাই না।—নাও একটু বাঁধাকপি খাও।..."

খেতে খেতে গার্দা বললো, "আর একটা কথা মনে রেখো কখনো নতুন প্রেমিকাকে পুরনো প্রেমিকার কথা বলতে নেই।" একটু থেমে আবার বললো,—"জীবনে অনেক দুঃখ আর আঘাত পেয়েছি আমি। তাই বিশেষ কিছু চাহিদাও নেই আমার। এবার একটু স্থিতি চাইছে মন।"

"এডুয়ার্ড কিন্তু ভীষণ অহংকারী আর কৃপন," কথাটা বলে ফেলেই নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো আমার।

"আগোছালো আর বাজে খরচে লোকের চেয়ে অনেক ভাল, বিশেষ করে যদি বিয়ে করার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে।"

"তুমি ওকে বিয়ে করবে?" আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম।

"সেরকম কোনো কথা ও আমাকে দেয়নি ঠিকই, তবে এই তিন বছরের চুক্তির মধ্যে ও বুঝে যাবে যে আমাকে ছাড়া ওর চলবে না।"

"অনেক বদলে গেছো তুমি।" দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম আমি, "তবে আর কোনো দিন আমি ওয়ালহাল্লায় যাবো না।"

"কেন?" ঠোঁটে হাসি থাকলেও, চোখে হাসি ছিল না গার্দার, "কেন আসবে না?"

"তা জানি না। তবে যাবো না।"

গার্দা কি যেন ভাবলো, "কেন আসবে না। নিশ্চয়ই আসবে।—তবে এবার তুমি যাও—মেয়েদের মন তুমি কিছুই বোঝো না।" তারপর একটা মেডেল বের করে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, "এটা সব

সময়ে সঙ্গে রেখো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।—যাও।"

কার্ল ব্রিলের কারখানা ঘরে চাপা উত্তেজনা। আজ কয়েক কোটি মার্কের বাজি ধরেছে একজন। লোকটার মাথা সিন্ধুঘোটকের মতো ছুঁচলো।

কার্ল ব্রিল বেশ ঘামছে। আজ জিততে পারলে দারুণ, তা নাহলে একেবারে পথের ভিখিরী।

আমাকে দেখে যেন ও হাতে চাঁদ পেলো। "আজ খুব মন দিয়ে বাজাবে বুঝেছো।"

খেলা শুরু হবে। ক্লারা এসেছে। সেই জাপানী কিমানো গায়ে। সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে পরিচয় হলো, সে বেঞ্চের ওপর রাখা স্তূপীকৃত নোট আর ক্লারার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালো।

পেরেকের ওপর তুলো জড়ানো। পাছা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ক্লারা। একবার · দুবার—সারা শরীরটাকে টানটান করে চেষ্টা করলো সে।

"দুঃখিত, পারলাম না" দেওয়াল থেকে সরে এসে ক্লারা সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো কার্লের মুখ থেকে—"ক্লারা।"

সারা কারখানা ঘর উর্ত্তেজিত দর্শকের হাসিতে ভরে উঠেছে। সিন্ধু-ঘোটক আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে নোটের তাড়াগুলোর দিকে।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান—কথা ছিল তিনবার চেষ্টা করবে ক্লারা, ও মাত্র দুবার করেছে।'

"তিনবারই চেষ্টা করেছে," সিন্ধুঘোটক নির্লিপ্ত ভাবে বললো।

শেষ পর্যন্ত দর্শকরা চাপাচাপি করাতে প্রমাণ হলো ক্লারা সত্যিই দুবার চেষ্টা করেছে। অতএব আর একবার সুযোগ পাবে ক্লারা।

আমাকে ডেকে নিয়ে দোতলায় গেলো কার্ল। একটা ডিভানে উত্তেজক ভঙ্গীতে আধশোয়া অবস্থায় ক্লারা যেন কার্লেরই অপেক্ষা করছিল।

"ক্লারা—এটা কি হলো ?—তুমি ইচ্ছে করে করেছো ?"

"যদি করেই থাকি ?"

কি একটা বলতে যাচ্ছিল কার্ল, তার আগেই ধমকে উঠলো ক্লারা, "চুপ করো, জানোয়ার কোথাকার। হোয়েন জোলের্ণ হোটেলের মেয়ে ক্যাশিয়ারটার সঙ্গে তুমি শোও নি ?"

"আমি ? ডাহা মিথ্যে কথা। তুমি জানলে কী করে ?"

"এই তো স্বীকার করে ফেললে। আমি জানলাম কি করে।"

কার্ল ব্রিলের জন্যে আমার দুঃখ হলো। কোণঠাসা হয়ে কার্ল অন্য একজন পুরুষকে জড়িয়ে ক্লারাকে অপমান করার চেষ্টা করতেই এক চড় খেলো কার্ল।

তারপর আমার উপস্থিতি ভুলে দুজনে কুকুর-বেড়ালের মতো ঝগড়া করতে শুরু করলো। একটা সুযোগ পেতেই কার্লকে পেছনে সরিয়ে আমি এগিয়ে এলাম, "ফ্রাউ বেকমান, ও নির্দোষ। আমার জন্যে ও কেন শাস্তি পাবে ?"

"কি বললেন ?"

"দোষটা আমার। ঐ মহিলা ক্যাশিয়ারটার সঙ্গে কার্ল আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।"

কটমটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ক্লারা বলে উঠলো, "মিথ্যে কথা। আপনার মতো কম বয়েসী ছোকরা ওরকম বুড়ীকে সঙ্গীনি চাইবে কেন ?"

"আমার মতো গরীব লোকের পক্ষে যুবতী সঙ্গিনীর খরচা চালানো মুস্কিল। আজকালকার মেয়েরা পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না।...তাছাড়া এই শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলা আপনি, আপনাকে ছেড়ে কাল ব্রিল অন্য দিকে নজর দেবে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

কথাটায় কাজ হলো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তবুও রাগ যায় না। অনেক সাধ্য সাধনার পর ক্লারার মন গললো। আমরা নিচে নেমে আসছি ক্লারা বললো, "কার্ল হের বোদমারকে মোটা টাকার ভাগ দেবে এ থেকে। মনে থাকে যেন।"

ক্লারা এসে দাঁড়ালো দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। এবা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টুং করে শব্দ। পেরেক মেঝেতে। দারুণ হৈ হৈ শুরু হয়ে গেলো জনতার

মধ্যে। কার্লের মুখে বিজয়ীর হাসি। আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো: "অসময়ের বন্ধুই বন্ধু। কি চাও বলো। টাকা তো দেবই, এক জোড়া জুতো নাও। কীসের নেবে?"

"পেটেণ্ট লেদারের।"

বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি কালো পাথরটার কাছে একটা অন্ধকার ছায়া। নিশ্চয়ই সার্জেণ্ট মেজর নোপফ। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম, "এই যে এইখানে সেই পাথরটা আছে, যেটা আপনি কিনেছেন। পেচ্ছাপ করতে হলে এটার ওপর করুন।"

"পাগল হয়ে গেছো না কি হে ছোকরা। নিজের কবরের পাথরে কেউ ওসব করে কি?" কথাটা বলে কি যেন ভাবল নোপফ, তারপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। আমিও ফিরলাম।

॥ ২২ ॥

পাগল-আশ্রমের বাগানে বসে আছি। সুন্দর ছাঁটের পোষাক পরা এক মহিলা এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। আমি চিনি—জেনেভিয়েভ তার হোভেন। কিন্তু আজ সে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। ভারী সুন্দর লাগছে ওকে, আমি উঠে দাঁড়ালাম, "ইসাবেল।"

ও দাঁড়ালো ভ্রূতে সামান্য খাঁজ, "বলুন?"

"ইসাবেল। তুমি আমায় চিনতে পারছো না? আমি রুডলফ।"

"রুডলফ?…রুডলফ…ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে কত গল্প করেছি…।"

"হতে পারে," মাথা নাড়লো ইসাবেল, "এখানে তো আমি বহুদিন ছিলাম। তবে এখন কিছুই মনে পড়ছে না। আপনিও কি এখানে অনেকদিন আছেন?"

"আমি?…না, আমি এখানে মাঝে মাঝে অর্গান বাজাতে আসি।"

"ও হ্যাঁ—গির্জাতে?—হ্যাঁ এবার মনে পড়ছে। বেশ বাজান।

অনেক ধন্যবাদ।"

এরপর কি বলতে হয় ভেবে পাচ্ছি না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। "অনেক কাজ পড়ে আছে—এখন তাহলে আসি, কিছু মনে করবেন না যেন," ইসাবেল এক পা বাড়িয়ে বললো, আমি শিগ্‌গীরই চলে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ।"

"অথচ তোমার কিছু মনে পড়ছে না। রাতে যে সব নাম ঝরে পড়তো, সে সব ফুল কথা বলতো, তার কিচ্ছু মনে পড়ছে না?"

"কাব্য?" ইসাবেল ঘাড় নাচালো, "কবিতা আমার খুব প্রিয়। তবে সবগুলো সব সময়ে মনে পড়ে না।"

আমি আশা ছেড়ে দিলাম। এই মুহূর্তে ওকে এক অসাধারণ নিষ্ঠুর নারী মনে হচ্ছে। ইসাবেল যেন মরে গেছে, সেখানে জেগে উঠছে এক নারী নতুন সত্তা নিয়ে। এরপরে সে জনস্রোতে হারিয়ে যাবে। বিয়ে করবে সন্তান ধারণ করবে, সুখী হবে। আর আমি! ও বিদায় নিয়ে চলে গেলো, "এবার যাই। অর্গানের জন্য ধন্যবাদ।"

'কিছু বলবেন না?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

"কি ব্যাপারে?"

"এতো চাপা হয়ে তো কোনো লাভ হয় না? ফ্রাউলিন তারহোভেন? এটা আপনি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই তিন সপ্তাহে ও একেবারে পাল্টে গেছে। ওর ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছি।"

"এটাকে কি আপনি সাফল্য বলেন ডাক্তার?"

"তাছাড়া আর কি? সুস্থ হয়ে আবার সমাজ জীবনে ফিরে যাচ্ছে মানুষের মতো—ওটা কম বড় কথা নয়। তা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি?"

"হ্যাঁ—কিন্তু···"

"কিছু না—এমনি বলছিলাম। ওর কেসটা একেবারে ভূমিকম্পের মতো। হঠাৎ যেন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। ইসাবেলের এখন

যে মানসিক পরিবর্তনটা ঘটলো আশা করা যায় আর কখনও ও অসুস্থ হবে না। মা আর মেয়ে দুজনেই মনে করছে তারা কোনো না কোনো ভাবে প্রতারিত হয়েছে, তাই সমদুঃখে দুঃখী দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছে এতো সহজে। একটু পরেই দুজনে আসছে, একটু দেখে যান ওদের।"

দোটানায় পড়ে থেকে গেলাম। ইসাবেলের মায়ের বয়েস প্রায় প'য়তাল্লিশ, দোহারা চেহারা, ভারী সুন্দর। দারুণ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। ভদ্রমহিলা অনর্গল বলে গেলেন তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের কথা। ওর কথার ফাঁকে ফাঁকে আমি ইসাবেলকে লক্ষ্য করছিলাম। ও যেন অন্য কোনো চিন্তার জগতে ডুবে আছে।

বিকেলের প্রার্থনা সভাতে, জেনেভিয়েভ আর তার মা এলেন। বাজাবার পর আমি এক ফাঁকে চলে এলাম গির্জার বাগানে, সঙ্গে জেনেভিয়েভ। কোটটা ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে ও বললো, "বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"হ্যাঁ, তাহলে এই সপ্তাহেই তোমরা চলে যাচ্ছ?"

"সেই রকমই ঠিক করেছি। কতো দিন বাড়ী যাই নি।"

"তুমি খুশি তো?"

"নিশ্চয়ই।"

এরপর আর বলার কিছু থাকে না। অথচ আমি খুব অসহায়—সেই একই ভাবে হাঁটছে, আধো অন্ধকারে ঢাকা তার মুখ, আমি বলে উঠলাম —"ইসাবেল।"

"মাফ করবেন, কি বললেন যেন?", খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে ও।

"ও কিছু না—একটা নাম মাত্র।"

এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠলো, "আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন কোথাও? আমার নাম জেনেভিয়েভ।"

"তাতো বটেই। ইসাবেল অন্য জনের নাম। ওর সম্বন্ধে আগে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।"

"হতে পারে। কতো কথাই না বলি আমরা—তারপর কতো কথা

ভুলে বসে থাকি," ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললো জেনেভিয়েভ।

"তা ঠিক।"

"ওকে কি আপনি চিনতেন?"

"হ্যাঁ।"

হালকা হাসির রেশ দেখা গেলো জেনেভিয়েভের মুখে।

"কি অদ্ভুত রোমান্টিক ব্যাপার না। সঙ্গে সঙ্গে মনে না পড়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এখন মনে পড়েছে।"

এবার আমার অবাক হবার পালা। ও যে ভদ্রতা দেখাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, "গত সপ্তাহটা যে ভাবে কেটেছে না—সব গুলিয়ে ফেলছি।" তারপর আবার ভদ্রতা দেখিয়ে বললো, "এখনকার খবর বলুন।"

"কার?···ওই···ইসাবেল মারা গেছে।"

জেনেভিয়েভ ভীষণ চমকে উঠলো, "ভীষণ দুঃখিত আমি। মাফ করবেন, জানতাম না আমি···।"

"তাতে কি হয়েছে। আমিও ওর সব পরিচয়টা পাই নি।"

"হঠাৎ মারা গেলেন?" জেনেভিয়েভ জানতে চায়।

"হ্যাঁ," আমি ধীরে ধীরে বললাম, "ইসাবেল এমনভাবে মারা গেলো যে সে বুঝতেই পারে নি। অদ্ভুত না?"

"হ্যাঁ," জেনেভিয়েভ হাতটা বাড়িয়ে আমার হাত ধরে গাঢ় স্বরে বললো, "সত্যিই আমি দুঃখ পাচ্ছি ইসাবেলের জন্যে। কি মিষ্টি নাম। আমাকে কেউ নাম দিলে আগে আমি ভীষণ রাগ করতাম।"

"এখন করো না।"

"না," হাসতে হাসতে বললো জেনেভিয়েভ।



আমরা আবার ফিরে এলাম বাগান থেকে। ডাক্তার আর জেনেভিয়েভের মা এগিয়ে এলেন। কথায় কথায় বললেন এখান থেকে ওঁরা বার্লিনে যাবেন নাটক দেখবেন, গান-বাজনা শুনবেন। কেনাকাটা তো আছেই, রাজধানীতে কিছুদিন হৈ হৈ করে কাটাবেন।

মেয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো, মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরা। ডাক্তারও খুশি। এরা ইসাবেলকে সুস্থ করে তুলেছে, সেই আনন্দে মশগুল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এরা ওর কোন্ সত্তাটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে,—অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিমচ্ছটায় উদ্ভাসিত ইসাবেলের যে-সত্তাটাকে আমি দিনের পর দিন দেখেছি পরম মমতায় সে তো আজ হারিয়ে গেছে। আমি কি তবে সত্যিই ওকে ভালবেসে ফেলেছিলাম? নাঃ, আর এখানে থাকা নয়। ডাক্তার কি যেন একটা বললেন, তাও ঠিকমতো কানে গেলো না, শুধু মনে আছে আসার আগে আমি শুধু ইসাবেলকে বলেছিলাম, "সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ।" জেনেভিয়েভও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, "কিন্তু কিসের জন্যে?"

পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নামছি। বিদায় ইসাবেল, শুভরাত্রি··· আমার জীবন থেকে মিষ্টি সুখ স্বপ্নের মতো আজ থেকে তুমি চিরকালের মতো মিলিয়ে গেলে। তুমি আছ অথচ তুমি নেই। হাত বাড়িয়েও আমি তোমার নাগাল পাবো না। পৃথিবীতে সব কিছুই থাকে, কিছু নষ্ট হয়ে যায় না; শুধু জন্ম আর মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই পরিবর্তিত রূপটি যখন জীবনের যাদুস্পর্শে নতুন ব রে ঝলমলিয়ে ওঠে তখন আর তাকে আগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।

আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে আমার হাঁটা যে খুব দ্রুত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম যখন দেখি পিঠের জামাটা পর্যন্ত ভিজে গেছে।

হঠাৎ দেখি সামনে বোদেনদিয়েক। "কোথায় ছিলে হে? ঈশ্বরের সন্ধানে?"

"না। আমি তাঁকে পেয়ে গেছি।"

ভ্রূ কুঁচকে বোদেনদিয়েক বললেন, "কোথায়? প্রকৃতিতে?"

"জানি না। তবে ওঁকে কি কোনো বিশেষ জায়গায় পাওয়া যায়?"

"পবিত্র বেদীর সামনে," গির্জার দিকটা দেখিয়ে বললেন, বোদেনদিয়েক, "ঐটাই আমার পথ। তোমার?"

"সবাই ঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।"

"আজ খুব বেশি মদ খেয়ে ফেলো নিতো?" বোদেনদিয়েক যেন

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

…গেট ঠেলে ভেতরে যেই ঢুকেছি কে যেন পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো আমার ঘাড়ে, "এইবার তোকে পেয়েছিরে কুত্তা।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমি সরে দাঁড়ালাম, নিশ্চয়ই কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। কিন্তু না লোকটা আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথা দিয়ে খুব জোরে আমার পেটে গুঁতো মারলো। মাটিতে পড়তে পড়তে ওকে চিনতে পারলাম আমি। ঘোড়ার কসাই ওয়াটজেক।

"মাথা খারাপ হলো নাকি আপনার? দেখতে পাচ্ছেন আমি কে?"

"খুব ভালভাবে পাচ্ছিরে বেজন্মা। আজ তোকে শেষ করে ছাড়বো।" মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে ওয়াটজেকের, এলোপাথাড়ি আমাকে মেরে চলেছে। মরীয়া হয়ে আমিও এবার আত্মরক্ষা করার চেষ্টা চাললাম। ওয়াটজেক আমার চেয়ে মাথায় খাটো, তবে শক্তসামর্থ্য চেহারা। কিন্তু বয়সের তুলনায় আমি অনেক ছোট, ও পারবে কেন আমার সঙ্গে। বোধ হয় তাই ও বুটের খাপ থেকে লম্বা ছুরীটা তুলে নিয়েছে হাতে।

"কি হচ্ছে এসব? খুনের দায়ে ফাঁসী যাবেন না কি?" হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম।

"আমার বৌয়ের সঙ্গে রাত কাটানোর জন্যে চরম শাস্তি দেব তোকে। রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেবো।"

এবার ব্যাপারটা সহজ হলো। কিন্তু যতো বোঝাবার চেষ্টা করি ওয়াটজেক ততোই ক্ষেপে যায়। হয়তো এই মুহূর্তে লিসা জর্জের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আর ওদের বদলে আমায় প্রাণ দিতে হচ্ছে।

দৌড়োদৌড়ি করতে করতে আমি বাগানে চলে এসেছি সেই কালো অবিলিস্কের কাছে। ওটাকে মাঝে রেখে কানামাছি খেলার মতো দৌড়চ্ছি দুজনে। এক ফাঁকে বুকপকেট থেকে গার্দার ছবিটা বের করলাম, তাতে লেখা ছিল "প্রিয় বোদমারকে—গার্দা"।

"এই আমার বান্ধবী, লিসার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" ফটোটা পাথরের ওপর রেখে সরে এলাম। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ওয়াটজেক ফটোটা দেখলো।

"বুঝতে পারছেন তো এবার ? আমি এরকম বান্ধবী ছেড়ে কেন যাবো আপনার স্ত্রীর কাছে।"

"কিন্তু কেউ একজন আমার বৌয়ে সঙ্গে রাত কাটায়," ওয়াটজেকের গলায় দ্বিধা।

"বাজে কথা। আপনার স্ত্রী আপনাকে ঠকান না।"

"তাহলে এখানে সব সময়ে আসে কেন ?"

"কোথায় ?"

"আপনাদের এই অফিসে ?" ওয়াটজেকের মধ্যে ভদ্রতা এবং সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে ধীরে ধীরে।

"এখানে আসেন কিনা জানি না। যদি বা আসেন তো ফোন করতে এসে থাকতে পারেন।"

"রাতেও লিসা এখানে আসে।"

"আসেন না, একদিন এসেছিলেন, যেদিন সার্জেণ্ট-মেজর নোপফকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়িতে আনা হয়। তাছাড়া উনি তো রেডিমিলে কাজটাজও করেন।"

"ওতো সব সময়ে তাই বলে···" ছুরীটা হাত থেকে খসে পড়েছে। গার্দার ফটোটা পকেটে পুরে আমি এলাম ওয়াটজেকের সামনে। "নিন এবার যতো খুশি ছুরী মারুন আমাকে।···কী যে করেন না··· ?"

"না, মানে···," ওয়াটজেক তোতলাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সব ব্যাপারটা জানা গেলো। বিধবা বুড়ী কোনরস্‌মান গোপনে লাগিয়েছে ওয়াটজেককে, লিসা রাতে এবাড়ীতে আসে। আর আমি ছাড়া আর কার কাছে আসবে ?

গার্দার ফটোটা ভাল করে দেখালাম ওকে। লিসা আর গার্দা প্রায় এক মাপের সবদিক দিয়ে। তাই বুড়ী গার্দাকে লিসা বলে ভুল করে মিথ্যে অভিযোগ জানিয়েছে ওয়াটজেকের কাছে।

এবারে বেশ নরম হয়ে উঠেছে ওয়াটজেক। তারপর কি করে বৌয়ের মনোরঞ্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। পোষাক ভাল করতে হয়, স্নান করে ফিটফাট থাকতে হয়, দরাজ হাতে খরচ করতে হয়—এইসব

আর কি ?

"আর একটু হলে তুমি ভুল করে আমার মেরে ফেলতে…", আমি হেসে বললাম। এতোক্ষণে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছে ওয়াটজেকের সঙ্গে। ও বললো কাল ঘোড়ার মাংসের সসেজ পাঠিয়ে দেবে বড় এক প্লেট নতুন বন্ধুত্বের খাতিরে।

॥ ২৩ ॥

"অসতী বৌয়ের স্বামীরা এক একটা গৃহপালিত পশু। অনেকটা মুরগীর ছানা, বা খরগোশের মতো খাদ্যবস্তু," জর্জ বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলছিল কথাগুলো, "আগে বেশ নাড়োচাড়ো, খেলো, তারপর প্রয়োজন মাফিক জবাই করে ভোগে লাগিয়ে দাও। অথচ মুহূর্ত আগেও প্রাণীগুলো বুঝতে পারে না তাদের পরিণতি কি হবে। অসতীদের স্ত্রৈন স্বামীগুলোরও ওই অবস্থা।"

ওর কথার ফাঁকে আঙুলে তুলে আমি দেখালাম টেবিলের ওপর ওয়াটজেকের পাঠানো ঘোড়ার মাংসের সসেজ রাখা আছে।

"তুমি ওটা খাবে ?" ঠাট্টার সুরে জর্জ বললো। আমি খুব ধন্দের মধ্যে পড়েছি।"

"ও তোমার বিবেকে বাধছে ? ওয়াটজেক তো এখন তোমার দরদী বন্ধু।"…তবে তোমায় জানিয়ে রাখি লিসা আমার সঙ্গেও ছলনা করছে।"

"তাই নাকি ?" এবার আমার চমকাবার পালা।"

"হ্যাঁ, অতো দামী পোষাক, গয়না আঁসে কি করে ? ওয়াটজেক হাঁদা হতে পারে, আমি না।…তবে একটা ব্যাপারে সমস্যা নেই, লিসার মতো বহুবল্লভারা স্বামীদের মোটামুটি সুখে রাখার চেষ্টা করে।…ওসব কথা ছাড়ো, এখন খাওয়া যাক।"

আমাদের দেখে এডুয়ার্ডের অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা। ডলারের দাম

বেড়ে হয়েছে এক কোটি মার্ক। আর আমাদের কুপন যেন ফুরোবে না মনে হচ্ছে।

"তোমরা নিশ্চয়ই কুপন জাল করছো।"

গত শীতকালে কেনা কুপনগুলোয় দু'হাজার মার্কে পেট ভরে খাওয়া যেতো, এখন সস্তায় বাজে মদও আধ বোতল পাওয়া যাবে না ঐ দামে। এডুয়ার্ডের রাগের সঙ্গত কারণ আছে বৈকি। হঠাৎ নজরে পড়লো রাইজেনফেল্ড বসে আছে।

"ঠিক সময়ে এসে গেছেন আপনি। এই ছোকরার একটা ভাল খাওয়া পাওনা হয়ে আছে আপনার কাছে। গতকাল লিসার ব্যাপারে দারুণ ডুয়েল লড়েছে ওয়াটজেকের সঙ্গে। ছুরীর সঙ্গে পাথরের টুকরো।"

রাইজেনফেল্ডকে সব কথা বলতেই ও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। "তোমাদের দু জনেরই এখানে আর থাকা উচিত হবে না। কারণ ওয়াটজেক অতো সহজে ছেড়ে দেবে মনে হয় না।"

"আমার টাকমাথা, আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না।" জর্জ জানালো, "তবে ভয় এই বোদমার ছোকরাকে নিয়ে।"

একটু চিন্তা করে নিয়ে রাইজেনফেল্ড আমাকে বললো, "বার্লিনে একটা খবরের কাগজে চাকরী করবে? প্রথমে হয়তো বেশি দেবে না। পরে···।"

"কি বললেন?" আমার দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।"

"হ্যাঁ, তুমি তো আগে কয়েকবার আমাকে বলেছিলে চাকরী খুঁজে দিতে। তা কথা হয়েছে। চব্বিশ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কাজে লেগে যাও। ঠিক আছে?"

"দাঁড়াও, আমাকে পাঁচ বছরের নোটিশ দিয়ে তবে চাকরী ছাড়বে," জর্জ বললো।

"না বলে চলে যাবে ও।"

"কতো মাইনে পাবে?"

"দুশো মার্ক," খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলে রাইজেনফেল্ড।"

"আমি জানতাম এটা এক ধরণের রসিকতা," আমার রাগ হয়ে গেছে,

অনুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই।

চেকের টাকা দিয়ে দামী স্যুট কিনবো। কার্ল ব্রিলতো পেটেণ্ট লেদারের জুতো দেবে বলেছে। আচ্ছা তাই পরে যদি ইসাবেলের সামনে দাঁড়াই? নাঃ এসব ভেবে লাভ নেই।

বোতলের মদ শেষ। ছুঁড়ে মাঠের দিকে ফেলে দিলাম। এবার যেতে হবে রেডমিল রেস্টুরেণ্টে। রাইজেনফেল্ড আমাদের জন্যে একটা বিদায় সম্বর্ধনার পার্টি দিচ্ছে। আমি তো সবকিছুকেই বিদায় জানাতে তৈরী। বছরটাও তো শেষ হচ্ছে।

……রাত তখন অনেক, মাতালদের শবযাত্রার মতো আমরা হেঁটে ফিরছি। গ্রোফেন স্ট্রিট ধরে। রাস্তায় বাতিগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। উইলি আর রেণী আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাইজেনফেল্ডের সঙ্গে জোর তর্ক বেঁধেছিল উইলির। উইলি রাই মার্কের কথা মানতে রাজী নয়, তাহলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শীতের রাত। দূর থেকে দেখি একটা দল এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

"জর্জ, মনে হচ্ছে একটা মারদাঙ্গা হবে, মেয়েদের সরিয়ে দিলে ভাল হয় না?"

আমরা তখন নিউ মার্কেটের কাছে। জর্জ লিসাকে লক্ষ্য করে বললো, "যদি দেখো গণ্ডগোল খারাপের দিকে যাচ্ছে, তোমরা মেয়েরা ঐ কাফে মাৎজ রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পড়বে। আর বোদোর গানের ক্লাবে খবর দেবে আমাদের সাহায্যের দরকার। রাইজেনফেল্ডের দিকে ফিরে বললো, "আপনি এমন ভান করবেন যেন আমাদের দলের নন।"

"রেণী পালাও," উইলি চাপা স্বরে বলে উঠলো।

ততক্ষণে দলটা কাছে এসে গেছে। এরা সেই জাতীয় সঙ্গীতের একমাত্র ভক্তের দল। কারুরই বয়স কুড়ির বেশি নয়। সংখ্যায় আমাদের দ্বিগুণ।

"সেই লালকুত্তাটা আছে…টেকোটাও আছে…চল মার লাগা…।" অন্ধকারেও ওরা উইলিকে চিনতে পেরেছে।

আমরা রাইজেনফেল্ডকে নিয়ে পাঁচ জন, ঠিকভাবে বলতে গেলে সাড়ে

চারজন, কারণ হেরমান লোৎজের বাঁ হাতটা নেই, গত যুদ্ধে খুইয়ে এসেছে।

আমরা দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম, যাতে পেছন থেকে ওরা আক্রমণ করতে না পারে। তারপর শুরু হয়ে গেলো ধুন্দুমার কাণ্ড। এলোপাথারি ঘুসোঘুসি চলতে লাগলো। ক্রমশঃ আমরা কোণ ঠাসা হয়ে পড়ছি। যতো মারছি তার চেয়ে বেশি মার খাচ্ছি।

হঠাৎ দেখি হেরমান তার লোহার তৈরী কৃত্রিম বাঁ হাতটা খুলে নিয়েছে, আর লাঠির মতো করে ঘোরাতে ঘোরাতে কুপোকাৎ করছে ছোকরাদের দলের চাঁইগুলোকে। এবার ওরা পিছোচ্ছে। আমরাও নতুন উৎসাহে রক্তাক্ত মুখ চোখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ছোকরাগুলোর ওপর। একটু পরে দেখি বোদোর ক্লাবের দলটা এগিয়ে আসছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে।

এবার আর ভাবনা নেই। ওরাই সামাল দিলো পরিস্থিতির। ছোকরাগুলো পালালো।

বোদোর কথায় আমরা কাছাকাছি একটা হোটেলে ঢুকলাম। এক কোণে মাথা নীচু করে বসে ওয়াটজেক মদ খাচ্ছিল। লিসা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘিনীর মতো, "ওঃ, এই তোমার ঘর-সংসার দেখা? …দেখো…দেখো…সবাই, আমার স্বামীটিকে…।" ওয়াটজেক লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না।

আমি এগিয়ে এসে ওয়াটজেককে বললাম লিসাকে নিয়ে বাড়ী চলে যেতে। ওরা বেশ খুশি মনে বেরিয়ে গেলো।

…ভোরের দিকে বাড়ী ফিরছি, একটা খবরের কাগজ কিনলাম; প্রথম পাতাতেই দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা "মুদ্রাস্ফীতির অবসান। এক কোটির বদলে এক মার্ক।"

"কি বলেছিলাম?" রাইজেনফেল্ড মুরুব্বীর ভঙ্গীতে বললো।

"বৎসগণ…আমার কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেলো", উইলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালো রেণী দ্ব লা তুরের দিকে।

পথে হাঁটতে হাঁটতে জর্জ বলে উঠলো, "খুব অন্যায় করেছি আমি

আর রাইজেনফেল্ড…ওয়াটজেকের সংসারে ভাঙ্গন ধরানোটা ঠিক হয়নি।"

"ভুলে যাও ওসব কথা…সব কিছুকে সরলভাবে মেনে নাও জর্জ।"

গেট ঠেলে বাড়ীতে ঢুকছি নোপফের ছোট মেয়েটা এগিয়ে এলো, "বাবা বলছিলেন বারো কোটিতে ঐ পাথরটা আবার আপনারা কিনে নিতে পারেন।"

"ওঁকে বলো বড় জোর আট মার্ক দিতে পারবো।"

জানলা দিয়ে নোপফ মুখ বাড়ালো, "কেন হে ছোকরা ওরকম বলছো কেন?"

"কাগজে পড়বেন, মুদ্রাস্ফীতির যুগ শেষ।"

"ঠিক আছে…ঠিক আছে…ওটা এখনই বিক্রি করবো না। ধরে রাখবো, দামতো আবার চড়বেই," বুড়ো দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিলো।

॥ ২৪ ॥

ওয়ারদেনব্রুক কবি সমিতি আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছে ওয়াল-হাল্লার ক্লাবঘরে। কবিরা বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে, বিচ্ছেদ ব্যথার মুখোস এঁটে রাখতে হচ্ছে সব সময়ে।

হাঙ্কারমান এগিয়ে এলো আমার কাছে, "তুমি তো আমার কবিতা পড়েছ। তুমিই একদিন বলেছিলে, আমার কবিতায় কাব্যানুভূতি প্রায় স্তেফান জর্জের মতোই প্রগাঢ়।"

কথাটা আমি বলি নি, বলেছিল অটো বামবাস। তার উত্তরে হাঙ্কারমান বলেছিল অটোর কবিতা রিলকের চেয়েও কোনো কোনো অংশে ভাল। কিন্তু সেকথা আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম না। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিব্রত হয়ে হাঙ্কারমান অন্য কথায় চলে গেলো, "স্যুটটা নতুন করালে?"

"সুইজারল্যাণ্ড থেকে কবিতা লেখার টাকা পেয়েছি, তাই দিয়ে করিয়েছি। যুদ্ধের পর এই প্রথম অসামরিক স্যুট করাতে পারলাম।

মুদ্রাস্ফীতি শেষ হয়েছে।”

“সুইজারল্যাণ্ড থেকে পাওয়া কবিতার জন্যে দক্ষিণা? ··তার মানে তোমার এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি? কারা দিলো? খবরের কাগজ?”

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালো হাঙ্কারমান, “আমারও তাই মনে হয়েছিল। আমি কিন্তু কবিতা লিখি পয়লা সারির সাহিত্য পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। খবরের কাগজে লিখবো না। এই ছাখো না আর্থার বাউয়ার জোর করে আমার একটা কবিতার বই ছেপেছে। প্রচুর বিজ্ঞাপন দেবার আশ্বাস দিয়েছিল। দেয় নি। ফলে মাত্র পাঁচশো কপি বিক্রি হয়েছে।”

ভেতরের ব্যাপারটা আমি জানি, হাঙ্কারমান একটা স্কুলে পড়ায়। আর্থারের দোকানের বই স্কুলে চালু করবে না এমন ভয় দেখিয়ে নিজের কবিতার বই ছাপিয়েছে। তাও মোট ছাপা হয়েছিল আড়াই শো, বিক্রি হয়েছে আঠাশটা, তার মধ্যে নাকি হাঙ্কারমান নিজেই গোপনে উনিশ কপি কিনেছে।

“যাইহোক, তুমি তো এখন বার্লিনে যাচ্ছ, আমার বই সম্বন্ধে তোমার কাগজে লিখবে। কবি বন্ধুদের মধ্যে এটুকু উপকার নিশ্চয়ই করা উচিত তোমার।”

আমি বললাম, “করবো।”

“জানতাম তুমি না বলবে না,” হাঙ্কারমান উচ্ছ্বসিত, “তা তুমি এখন কি লিখছো-টিখছো?”

“কিচ্ছু না। লিখবোও না। জগৎটাকে ঘুরে ঘুরে দেখবো। তারপর তো লেখা।”

“এই সত্যি কথাটা বেশির ভাগ লোকই বোঝে না। সত্যিই তো আগে অভিজ্ঞতা, পরে লেখা অনেকে তাড়াহুড়ো করে বাজে লিখে ছাপিয়ে কবিতার সর্বনাশ করছে।”

আমি মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হাসলাম। হাঙ্কারমান গলা নামিয়ে বললো, “তোমার সঙ্গে এই যে কথা হলো এটা যেন আর কেউ না জানে।”

আবার সায় দিলাম, কিন্তু চোখে পড়লো অটো বামবাস আমার দিকে

এগিয়ে আসছে।

একঘণ্টা পরে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উপহার-বাণী লেখা অটো বামবাসের কবিতার বই আমার পকেটস্থ হয়েছে। বার্লিনের পত্র-পত্রিকায় তার সম্বন্ধেও লিখতে হবে।

সহসা সমস্ত পরিবেশটা যেন আমার কাছে খুব দূরের কিছু একটা হয়ে উঠলো। আমার শৈশব, মুদ্রাস্ফীতি, ইসাবেল কেউ যেন আমার নয়। পরিচিত মুখগুলোও যেন অপরিচিত জগতের। পৃথিবীর সব কিছু অসার আর অবাস্তব মনে হতে লাগলো। আমি যান্ত্রিক ভাবে বলে উঠলাম, "বন্ধুগণ, আমি তোমাদের কবি সমিতির সদস্যপদ ছাড়ছি।"

"অসম্ভব," হাঙ্কারমান চেঁচিয়ে উঠলো, "তুমি আমাদের পত্রালাপী সদস্য হয়ে থাকবে।"

"না, পদত্যাগই করছি।"

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটিতে ঠিক হলো আমি সমিতির সম্মানিত সদস্য হয়ে থাকবো।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম, "কিন্তু ওটাও আমি চাই না। সব বন্ধন ছিন্ন করেই আমি যেতে চাই।"

"ঠিক আছে ওকে ছেড়ে দাও," হাঙ্কারমান বললো, "কিন্তু কোথায় যাবে? কিভাবে যাবে?"

আমি হাসলাম, "স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে যাবো, চরম পরিণতিকে এড়াবার জন্যে।"

...উইলি একটা ছোট্ট ঘরে বসে আছে। রাতারাতি বড় ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে চলে এসেছে সে। এতবড় সর্বনাশটাকে ও কিন্তু বেশ শান্ত ভাবে মেনে নিয়েছে। কিছু জামা কাপড় আর সোনা দানা বাঁচাতে পেরেছে, তাতে আপাততঃ চলবে। লাল গাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেছে। এই ঘরের দেওয়ালে রঙীন কাগজের বদলে দামী অঙ্কের নোট আঁটা। উইলি জানালো এতে খরচ কম পড়েছে।

"এবার কি করবে?"

"দেখি, এখানকার ব্যাংকে একটা চাকরি নেবো ভাবছি।"

উইলি দেঁতো হাসি হাসলো, "রেণী চিঠি লিখেছে মাগদেবুর্গ থেকে। ওখানে ও দি গ্রীন কোকাতু রেস্টুরেন্টে দারুণ নাম করেছে গান গেয়ে।"

"রেণীকে ভাল বলতে হবে, সে তোমার সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ রাখছে অন্ততঃ," আমি বললাম।

"এসবের কোনো অর্থ নেই লুডউইগ। চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়ালে চলে যায় মানুষ।...যাক ওসব কথা...কি নেবে বলো, এখানে লক্ষ লক্ষ মার্কের নোট আছে, যা খুশি নিয়ে যাও...সবটাই যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

উইলি চলো তোমায় পৌছে দিই, "বলে এগিয়ে আসতে চাইছিল, আমি বাধা দিয়ে একাই বেরিয়ে এলাম।

...অফিস ঘরে বসে আছি। এটাই এখানে আমার শেষ দিন। আজ রাতের গাড়ীতে আমি চলে যাবো। হঠাৎ টেলিফোন বাজলো।

"তুমিই কি সেই লুডউইগ, যে ছোটবেলায় ব্যাঙ ধরতো," একটা খসখসে গলা প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ...তুমি কে?"

"ফ্রিৎজি।"

"বলো...বলো ফ্রিৎজি কি ব্যাপার? অটো বামবাস কি কোনো গণ্ডগোল করেছে?"

"আয়রন হর্স মারা গেছে।"

"কি বললে?"

"হ্যাঁ। গত সন্ধ্যায়, হার্ট আটাক। তখন খদ্দের ছিল।"

"চমৎকার মৃত্যু...তবে বড় অসময়ে।"

"শোনো কাজের কথা বলি। একবার তুমি বলেছিলে না কবরের পাথরের ব্যবসা-ট্যাবসা করো? তাই যদি হয়, তবে আয়রন হর্সের ব্যাপারে যেহেতু তোমার দুর্বলতা ছিল তাই বাড়িউলী মাসীর ইচ্ছে তোমরা ওই ভারটা নাও।—তাড়াতাড়ি করো। একজন ইতিমধ্যে পৌছে গেছে, কেঁদে কেঁদে বলছে ও নাকি আয়রন হর্সকে—"

"বুঝেছি—কাঁহুনে অস্কার—চিন্তা কোনো না আমি আসছি।"

…শবযানে শোয়ানো আছে আয়রন হর্সের মৃতদেহ। কিছু ফুলও ছড়ানো চারপাশে। ওর মুখটা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, শুধু বাঁধানো দাঁতটা দেখলে জোর করে বলা যায় যে এই হলো আয়রন হর্স। ওর সঙ্গে আমার কৈশরের অনেক স্মৃতি জড়ানো। ও না থাকলে' কবি না হয়ে আমি হয়তো ডাক্তার হতুম। প্রায়ই ওকে কবিতা শোনাতে হতো, স্বরচিত কবিতা।

"তা কি করা যায় ওর জন্যে বলো," বাড়িউলী মাসী আমাকে নিয়ে পড়লেন।

কি করবো ভাবছি। এমন সময় মাসী নিজের থেকেই বলে উঠলেন, "টাকা পয়সার জন্যে ভাববে না। আয়রণ হর্সের এক বাঁধা ওলন্দাজী খদ্দের ছিল, তার কাছ থেকে পাওয়া বিদেশী নোট আছে অনেক, এবং তার দামও খুব ভাল।"

ক্যাটলগটা খুলে পছন্দ করানোর কাজ শুরু করলাম। মাসী কফি চড়িয়েছেন হিটারে।

"বলুন কি ইচ্ছে আপনাদের মার্বেল না গ্রানাইট?"

"গ্রানাইটই হোক, ওর নামের আর চরিত্রের সঙ্গে মিলবে ভাল।"

এই পুরনো পরিবেশে আবার আমি অতীতের কোলে ডুব দিলাম। মেয়েগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে ক্যাটলগের পাতায়, যেমন তারা দেখতো আমাদের স্কুলের বইগুলোকে।

"কালো সুইডিশ পাথরের, ছুটো বেদী থাকবে, মাথার ক্রুশ চিহ্ন," আমি ছবিটা দেখালাম, "এরকম দামী জিনিষ এ শহরে কয়েকটি মাত্র আছে।"

"না, নতুন ধরনের এক পাথরের কিছু নেই," ফ্রিৎজি জানতে চাইলো।

হঠাৎ আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো। "আছে—ঐ ধরনের একটাই আছে—অবিলিস্ক।"

নক্শাটা দেখাতেই সবাই লাফিয়ে উঠলো, "এটাই আয়রন হর্সকে ভাল মানাবে। তা দাম কতো পড়বে?"

আমাদের কারবারের সব জিনিসের দাম মোটামুটি ঠিক করা আছে, শুধু অবিলিস্কটা বাদে। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "এমনিতে দাম হাজার মার্ক। তবে আপনাদের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের খাতিরে ছশো। আর আয়রন হর্স আমার শিক্ষা গুরু বলে মাত্র তিনশো।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। ওলন্দাজী মুদ্রায় কতো হবে হিসেব করতে বললো ওরা।

টাকাটা পকেটে পুরতে পুরতে ভাবলাম জর্জরা যা মনে করার করুক, আজই তো আমার শেষ দিন ওদের অফিসে।

কাল আয়রন হর্সের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আমি থাকতে পারবো না, সব কিছুকে পেছনে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। ফ্রিৎজিরা সবাই দুঃখিত। বিদায় মুহূর্তে আমাদের সকলের চোখের কোনে চিকচিকে জল।

"—অসম্ভব," জর্জ মানতে রাজী না। আমি নোটগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম। "কি বিক্রি করে এতো টাকা পেলে তুমি?" জর্জ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

"এক মিনিট—", বাইরে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি নোটগুলো ঢাকা দিয়ে রাখলাম। হাইনরিখ ঘরে ঢুকলো!

"কি? কিছু বিক্রিটিক্রি করতে পারলে?"

ফোঁস করে উঠলো হাইনরিখ, "নিজে গিয়ে একবার ঘুরে এসো না, বাজার বুঝতে পারবে তাহলে। কারুর হাতে পয়সা নেই। সব দেউলে হয়ে গেছে। যার সামান্য কিছু আছে, সে খরচ করবে না।"

"আমি গিয়েছিলাম, এবং কিছু বিক্রিও করেছি।"

"বাজে কথা।"

"শুধু যাই নি। অবিলিস্কটা বিক্রিও করেছি।"

"এসব ঠাট্টা বার্লিনে গিয়ে চালিয়ো," হাইনরিখ ক্ষেপেছে।

"না। ঠাট্টা নয়। লুডউইগ সত্যিই বিক্রি করেছে, এই ছাখো টাকা—তাও আবার বিদেশী মুদ্রায়।"

হাইনরিখ অবাক। কিন্তু হার মানতে রাজী না। প্রায় রাগ করেই চলে গেলো ঘর ছেড়ে। তখন জর্জ হিসেব কষতে বসলো, আমার কতো

পাওনা হবে। আমি ওকে জানালাম কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমার যা আছে তাতে মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত বার্লিনে আমার একমাস স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

অনেক তর্কাতর্কির পর জর্জ বাধ্য করলো আজকের বিক্রির ওপর কিছু কমিশন নিতে। "আজ রাত বারোটা পর্যন্ত তো তুমি আমাদেরই একজন।"

তারপর গল্প শুরু হলো, বার্লিনে গিয়ে কি করতে হবে আমাকে। এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে নোপফ ঢুকলেন, "আট কোটি হলেই চলবে?"

"হের নোপফ আপনি এখনো স্বপ্নের জগতে আছেন। আপনি জানেন না মার্কের কি অবস্থা হয়েছে বাজারে। আজকের দামে ঐ পাথরটার দাম হবে বড় জোর আট মার্ক।"

"ছুঁচো···ইঁদুর কোথাকার···তোমাদের কারসাজি এটা।···হ্যাঁ তোমরাই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করে দিয়েছো, আমাকে শেষ করে দেবার জন্যে। ঠিক আছে এর পরে আবার দাম বাড়বে, ততোদিন অপেক্ষা করবো আমি।"

"ঠিক আছে, তাই করুন," জর্জ হেসে বললো।

···আর দু ঘণ্টা মেয়াদ এখানে। তারপর স্টেশনে যাবো। হঠাৎ দেখি বাড়ীর সামনে রাস্তায় একটা বাজনার পার্টি পরিচিত গান বাজাতে শুরু করেছে। আরে এ যে দেখছি বোদোর গানের পুরো ক্লাবটাই এসে হাজির।

"তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছে," জর্জ বললো।

বিধবা কোনরস্মানের জানলা খুলে গেলো দমাশ করে, "মাঝ রাতে মাতালগুলো একি হাঙ্গামা শুরু করলো। এই বাজনা থামাও। থামাও বলছি।"

লিসাও জানলা খুলেছে। বেশ হৈ চৈ চলছে, এমন সময় পুলিশ হাজির।

"শান্তি নষ্ট কেন করা হচ্ছে," গম্ভীর মুখে পুলিশ জানতে চাইলো।

"ওদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাও," বিধবা কোনরস্‌মান ঘ্যানঘেনে গলায় চেঁচালো।

"যাও, যাও, চোর ধরো গিয়ে, আমরা গান শুনতে ভালবাসি," পুলিশকে লক্ষ্য করে লিসা বললো। ফলে পুলিশের দলটা ফাঁপড়ে পড়লো।

"কিন্তু না, আইন মানতেই হবে," পুলিশের ঘোষণা।

এক এক করে বোদোর দলের সবাই গ্রেপ্তার হলো। শেষ বারে যখন বোদো গ্রেপ্তার হচ্ছে আমি তখন বলে উঠলাম, "এই নাও বোদো," একটা বীয়ারের বোতল বের করে দিয়েছি জানলা দিয়ে।

"চিন্তা কোরো না হে। সব ঠিক আছে।"

বিশ মিনিট পরে দেখি বোদোর দল আবার ফিরে এসেছে। থানায় গিয়ে এমন জোরে গান বাজনা শুরু করে যে শেষ পর্যন্ত ওরা বাধ্য হয় ছেড়ে দিতে।

—স্টেশনে পৌঁছে গেছি। কনকনে বাতাস। আমি আর জর্জ ছাড়া আর কেউ নেই প্ল্যাটফর্মে।

"তুমি আমার ওখানে আসবে তো জর্জ? বড় বড় শিল্পী অভিনেত্রীদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।"

"আসবো।"

আমি জানি ও আসবে না। তবুও বললাম, "ওই যে সুন্দর কোটটা কিনেছিলে ওটা ওখানে ছাড়া আর কোথায় পরবে?"

"তা ঠিক।"

অন্ধকার ভেদ করে ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

"খোশ মেজাজে থেকো জর্জ। হাজার হোক আমরা তো অমর হয়ে আছিই।"

"তাতো বটেই। তুমিও ভাল থেকো। বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছো তুমি, অতএব বেঁচে তোমাকে থাকতেই হবে।"

"নিশ্চয়ই। অন্ততঃ তাদের জন্যে তো বটেই, যারা বাঁচতে পারেনি।"

"বাজে কথা ছাড়। বাঁচলে নিজের জন্যেই বাঁচবে।"

ট্রেনটা এমন তর্জন গর্জন করছিল যেন ওর জন্যে শ'পাঁচেক যাত্রী অপেক্ষা করছে, অথচ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একটা কামরা দেখে নিয়ে উঠে পড়লাম। জানলা তুলে মুখ বাড়ালাম। জর্জ বললো, "কোনো কিছুকে ছেড়ে যাওয়া মানে তাকে চিরকালের মতো হারানো নয়। বোকারা তাই মনে করে।"

"হারাবার কথা কে বলছে," আমি উত্তম দিলাম, ট্রেন তখন আসতে আসতে চলতে শুরু করেছে, "তবে শেষ পর্যন্ত সবই হারাতে হয় বলে মানুষ জয়ের আনন্দ থেকে কেন অযথা আগেভাগে নিজেকে বঞ্চিত করে তা বুঝি না।"

"জয়? কিসের জয়?"

ট্রেন বেশ জোরে চলছে। জর্জের হাতটা চেপে ধরলাম। সেদিন রাতে মারামারির সময় ওর হাতটা কেটেছিল, ক্ষতটা এখনও আছে। এক সময়ে ওর হাত বেরিয়ে গেলো আমার মুঠি থেকে। হঠাৎ ওকে ভীষণ বুড়োটে মনে হলো, মুখের ভাবে বিষাদ আর বিবর্ণতা। আর আকাশে ধাবমান অন্ধকারের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

খুঁজে পেতে একটা জায়গা পেলাম। ব্যাগটা ঝোলালাম হুকে। দুঃখের অনুভূতিটা গাঢ় হয়ে আমাকে ক্ষুধার্ত করে তুললো। জর্জের মা ফ্রাউক্রল কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছেন ব্যাগে। হাত ঢুকিয়ে খুঁজে পেলাম না। ব্যাগটা নামালাম। ওপরে সযত্নে পাট করে রাখা আছে জর্জের সেই নতুন কেনা দামী কোটটা। কখন যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে জানি না। দীর্ঘশ্বাসটা গিলে ফেলে স্যাণ্ডউইচ মুখে দিলাম। ভারী সুন্দর খেতে।

খাওয়া শেষ, সীটে গা এলিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। ল্যাম্প-পোষ্টগুলো দ্রুত পেছন দিকে ছুটে চলেছে—অন্ধকারর বুকে ভেসে উঠতে লাগলো জর্জের মুখ···কোটটা···মনে পড়লো ইসাবেলের কথা···হেরমান লোৎজের কৃত্রিম হাতটা···সেই অবিলিস্ক, যার গায়ে রোজ রাতে পেচ্ছাপ করতেন নোপফ···এক সময়ে লক্ষ্য করলাম কোণে। কিছুই ভাবতে পারছি না আর।

## ॥ ২৫ ॥

ওদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যাবো। কিন্তু কোনো-না-কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি। ভাবতাম হাতে তো অফুরন্ত সময়, একবার গেলেই হবে। কিন্তু সেই সময় আর কখনো আসে নি। জার্মানীর আকাশে অন্ধকার নেমে এসেছিল। ফেলে আসা শহরে অবশ্য একদিন আমি ফিরেছিলাম, কিন্তু সেটা শহর না, শহরের ভগ্নস্তূপ। জর্জ ক্রল মারা গেছে। বিধবা কোনরস্‌মান নজর রাখতে রাখতে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলেছিলেন জর্জ আর লিসার ব্যাপারটা। কিন্তু দশ বছর পরে ১৯৩৪ সালে ওয়াটজেক যখন ফুয়েরারের বিশেষ পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতো তখন বুড়ী ওকে সে কথা জানিয়ে দেয়। পাঁচ বছর আগে লিসাকে ডিভোর্স করা সত্ত্বে ওয়াটজেক জর্জকে কন্‌সেনট্রেসন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। কয়েক মাস পরে জর্জ বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছিল।

হানস হাঙ্কারমান নতুন পার্টিতে যোগ দিয়ে সাংস্কৃতিক বিভাগে একটা বড় পদ পেয়েছিল, এবং দারুণ কবিতাও লিখেছিল উৎসব উপলক্ষে। পরে ১৯৪৫ সালে ঐ কারণেই শিক্ষা অধিকর্তার পদ থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে পেনসন পায়। অলস জীবন কাটাচ্ছে তারপর থেকে ও।

ভাস্কর কুর্ট বাককে সাত বছর কাটাতে হয়েছিল বন্দী শিবিরে, ফিরে এসেছে বিকলাঙ্গ হয়ে। নাৎসী রাজত্বের অবসানের পর ও এখন চেষ্টা চালাচ্ছে পেনসন পাবার জন্যে। অথচ যারা ওকে বন্দী শিবিরে অত্যাচার করেছিল তাদের তুলনায় মাত্র একের দশ ভাগ পেনসন পাবে ও। হাইনরিখ ক্রল এই সময়টা বেশ গা বাঁচিয়ে কাটিয়েছিল, এখন ও ভালই আছে।

মেজর ভোকেনস্টেইন ইহুদী নিধন যজ্ঞের বড় হোতা হয়ে উঠেছিলেন, আজ তাই তিনি পররাষ্ট্রে দপ্তরের একজন হোমরা-চোমরা অফিসার। বিশপের প্রতিনিধি বোদেনদিয়েক আর ডাক্তার ওয়েরনিক কিছু ইহুদীকে পাগল-আশ্রমে পাগল সাজিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফলে তাঁকে একটা ছোট্ট গ্রামের গির্জায় বদলী করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ করে লাভ

হয় নি, কারণ তাঁর ওপরওলা বিশপই সরকারী খেতাব পেয়ে যান হত্যা করাকে পবিত্র কর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়ে। বিষাক্ত ইনজেকশান দিয়ে ইহুদীদের মেরে ফেলতে রাজী না হওয়াও ডাক্তারের চাকরী যায়। পরে তাঁকে জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে ১৯৪৪ সালে তিনি নিহত হন। উইলি মারা ১৯৪২-এ। অটো বামবাস ১৯৪৫ এবং কার্ল ব্রিল ১৯৪৪-এ। লিসা আর জর্জের মা মারা যান বোমার আঘাতে।

এডুয়ার্ড নবলক ভীষণভাবে রাজভক্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে বোমায় বিধ্বস্ত হোটেলটা সরকারী সাহায্যে নতুন করে তৈরী করে ফেলেছে। কিন্তু গার্দাকে ও বিয়ে করে নি, গার্দার খবরও কেউ জানে না। ইসাবেলের কোনো খবর পাইনি।

কাঁহুনে-অস্কার যুদ্ধে গিয়েছিল, সেখানে ও মৃত সৈনিকদের কবর দেবার দায়িত্ব পেয়েছিল। ফিরে এসে হাইনরিখ ক্রলের সঙ্গে ব্যবসা করছে। দারুণ রমরমা ওদের।

আমি চলে যাবার তিনমাস পরে সার্জেণ্ট মেজর নোপফ গাড়ি চাপা পরে মারা যান, এবং সবাইকে চমকে দিয়ে তাঁর স্ত্রী কফিন মিস্ত্রী উইলকিকে বিয়ে করে এখন সুখেই আছেন।

যুদ্ধের সময় ওয়ারদেনব্রুক শহর একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। একটা বাড়িও আস্ত ছিল বলে মনে হয় না।

প্রায় বছরখানেক পরে ট্রেন ধরবার ফাঁকে একটু সময় পেয়ে ওখানে গিয়েছিলাম আমি। পুরনো রাস্তা ধরে হাঁটতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের সময়কার কেউ আর ওখানে নেই। স্টেশনের কাছে একটা ছোট্ট দোকান, সেখান থেকে কিছু ছবি কিনলাম পুরনো শহরের। স্মৃতি বলতে ঐটুকুই যা আছে। আজ যদি জার্মানীতে কেউ তার যৌবনকালের ফেলে আসা শহরের সন্ধানে যায়, তাকে তৃপ্ত থাকতে হবে ঐ ছবির পোস্টকার্ড কিনে। সব বদলে গেছে, অচেনা হয়ে গেছে।

একটি মাত্র বাড়ি এখনও অতীতের সাক্ষী হয়ে আছে—সেটা হলো সেই পাগলদের আশ্রম, আর তার সংলগ্ন হাসপাতালটা। শহর থেকে একটু দূরে ছিল বলে বোধহয় বেঁচে গেছে।

ওখানে আজও তেমন ভীড়। বিশেষ করে যুদ্ধের পর মানসিক রোগীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, বাড়ীকে আরও বাড়ালে বোধহয় ভাল হয়।

—